"চন্দন লেখা দ্বারে দ্বারে
আজি চন্দন মালা দুলিছে বায়ে"

কলিকাতা সোপের

—চন্দন—

আদর্শ সাবান

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

ভারতের বৃহত্তম সাবানের কারখানা

বালিগঞ্জ ঃ ঃ কলিকাতা

Eureka.

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

কার্ত্তিক—১৩৩৮

প্রথম খণ্ড } ঊনবিংশ বর্ষ { পঞ্চম সংখ্যা

বিজ্ঞান না প্রজ্ঞান ?

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

বিজ্ঞানের যুগ চলিয়াছে—এ কথাটা আমরা অনেকেই মুখে আওড়াইয়া যাইতেছি। সজ্ঞানে আওড়াইতেছি, না, বাতিকে আওড়াইতেছি, সেটা ভাবিয়া দেখা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সকল জাতিই যেমনধারা নিজের নিজের আভিজাত্যের গরব যখন-তখন মুখে জাহির না করিলেও অন্ততঃ অন্তরে পোষণ করে, সকল যুগকেই তেম্‌নিধারা নিজের নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভে সব সময় ফুলিয়া থাকিতে দেখা যায় নাই বটে ; কিন্তু কোন দুর্বিনীত যুগের অভিমান যে অতিকায় হইয়া অতীতের বিগত গৌরবকে অবজ্ঞা করিয়াছে, আর ভবিষ্যতের অনাগত অভ্যুদয়কে উপেক্ষা করিয়াছে, এটা অস্বীকার করিবে কে ? একটা অতীত স্বর্ণযুগ বা সত্যযুগের স্বপ্ন, একটা আদিম ঋদ্ধি ও সৌষ্ঠব হইতে পতনের সংস্কার, সকল দেশেরই প্রাচীন ঐতিহ্য তার বুকে ধরিয়া আসিয়াছে। মানুষের স্মৃতির যাদুঘরে ভাঙ্গা পাথর, কঙ্কাল, আর বাতিল আসবাবপত্রের কুঠুরীই হয় ত' বেশী ; কিন্তু দু'চারিটা মণিকোঠাও যে নেই এমন নয়। আর সে সব মণিকোঠায় মানুষের ঐতিহ্য এমন কোন কোন সামগ্রী হয় ত' সাজাইয়া রাখিয়াছে, যার শ্রী, যার সৌষ্ঠব, যার মূল্যবত্তার প্রতি বর্ত্তমানের গর্ব্বিত দৃষ্টি স্পর্দ্ধা দেখাইলে, সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। বর্ত্তমান যুগ সমা-

লোচক ও পরীক্ষক সাজিয়া সে-সব মণিকোঠার দুয়ারে আসিয়া হাজির হইলে, তাকে ভিতরে ঢোকার ছাড়পত্র পাইতে বেগ পাইতে হয়। দেবমন্দিরের মতন শুচির পট্টবাস পরিয়া, নিষ্ঠার শুচিতা লইয়া সে-সব কোঠায় প্রবেশ করাই হইল প্রাচীন দস্তুর। হয় ত' সে মণিকোঠায় সেই ঈজিপ্টের পিরামিড-কক্ষ-নিহিত কোন এক বিস্মৃত অতীতের রাজরাজেশ্বরের মণিই রহিয়াছে। কিন্তু মরণ সেখানে এতটা সম্মান, এতটা ঐশ্বর্য্যের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, যতটা সম্মান, যতটা ঐশ্বর্য্য জীবনের কামনার সকল সীমা হয় ত' ছাড়াইয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘায়ত অতীত যুগ তার শ্রদ্ধার মৌনতপস্যার বক্ষঃপঞ্জরের মাঝখানে যেন সেটাকে অজর, অক্ষয় করিয়া রাখার যত্ন করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুগ যে আজ শাবল দিয়া তার বক্ষঃপঞ্জর ফুঁড়িয়া তার যুগ-যুগান্তরের জমাট বাঁধা মৌনরহস্য ভাঙ্গিয়া দিতেছে, তায় রত্নপালঙ্কে শত শত পুরাকল্পের পূজারিণীর স্তব্ধ চামর-ব্যজনের তলে সুখশায়িত মণিকে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, শ্রদ্ধাহীন স্পর্শে টানিয়া তুলিতেছে, তাতে, যারা—যে সব অতীত-যুগাত্মা—এতদিন পাহারা দিয়া আসিতেছে, তারা নিশ্চয়ই নির্ব্বিকার, নিরুদ্বেগ থাকিতে পারে নাই। আপন পিতৃপুরুষদের সমাধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া শব বাহির করিয়া তাতে ছুরি চালাইতে দিতে, কঙ্কাল তুলিয়া তাতে করাত চালাইতে দিতে, প্রসন্ন মুখে রাজি কেহই কোন দিন হইতে পারে নাই।

জবরদস্ত বর্ত্তমানের অনেক জুলুম অবশ্য যাদুঘরের রক্ষীদিগকে সহিতে হইয়াছে। হালের কৌতূহলই শুধু যে গবাক্ষের ফুটা-ফাটা দিয়া যাদুঘরের সে সব কোঠার ভেতরে তাকাইয়া বিদ্রূপ-মাখা উপহাসের হাসি হাসিয়াছে, এমন নয়; হালের পণ্ডিতীর অভিমানও চড়াও হইয়া তাদের ঘুণে-ধরা জীর্ণ দুয়ারগুলো ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে—রক্ষীদের যক্ষের ধন আগলানর বাধা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; অনম্র, অদরদী হস্তে সে ভাণ্ডারের সব কিছু নাড়াচাড়া টানাহেঁচড়া করিয়াছে। যে সব অতীতের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব শুধু কোনমতে তাদের রূপটি, রূপের বর্ণ আর রেখাবিন্যাসগুলি, বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু তাদের "বস্তু"টিকে শিথিল হইতে দিয়াছিল, সে সমস্ত তার অদরদী স্পর্শে হয় ত' অনেক ভাঙ্গিয়া-চুরিয়াও গিয়াছে—একখানা খুব পুরানো কাগজ বা কাপড়ের ওপর খুব সুন্দর একটা ছবি বা নক্সার মতন। বর্ত্তমানের অশ্রদ্ধার স্পর্শ এটা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, ঐ রূপটাই যে আসল বস্তু—কাগজ বা কাপড়খানা, যার ওপর সে রূপটা ফলাইয়া তোলা হইয়াছিল, সেটা ত' আসল নয়;—অমন একখানা কাগজ বা কাপড় নষ্ট হইলে আবার মিলিবে; কিন্তু তার ওপর ফলান' যে রূপের আদর্শ, যে সুষমার স্বপ্ন আজ ভাঙ্গিয়া গেল, বর্ত্তমানের শত সাধনা আর ভবিষ্যতের সকল সিদ্ধিও হয় ত' সেটাকে আর ফিরাইয়া দিতে পারিবে না। মানবীয় অনুভূতি ও উপভোগের সমগ্রতা ও পূর্ণ আয়োজনে এমন অঙ্গহানি হয় ত' হইল, যার পূরণ কোন মতেই আর হইয়া উঠিবে না। আজকাল অনেক অতীত শিল্পসৌষ্ঠবের ফোটো রাখিয়া হয় ত' তাদের আমরা ভাঙ্গিতেছি। তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে আসল বজায় রহিয়াই গেল ভাবিতেছি। হয় ত' কতক বজায় রহিতেছেও। নড়া দাঁত তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নকল দাঁতের পাটিতেও কাজ চলে বটে, কিন্তু হাতখানা কাটিয়া ফেলিয়া কাঠের হাত লাগাইয়া কাজ চলে না। অঙ্গুলি উরগক্ষত হইলে কাটিয়া ফেলাই সুব্যবস্থা। কিন্তু সত্যকার প্রয়োজনের তাগিদে নয়, কেবল দ্বার কুণ্ঠা ও দরদের কার্পণ্যের দরুণ যদি পুরাতন মণিকোঠার বেদীতলে কোন সত্য আদর্শের স্থির সমাধি, অথবা কোন রূপদক্ষ কল্প পুরুষের সৃষ্টির মঞ্জুষণ্ণ ভাঙ্গিয়া দিই, তবে মানুষের চিরবরণীয়, চির-আদরণীয় সম্পদের ভাণ্ডারটাকেই মূল্যমাত্রায় অকারণ রিক্ত করিয়া দেওয়া হইল না কি? অতীতের সাধনার পরখ, তার সত্যতা ও মূল্যবত্তার যাচাই, কি রাসায়নিকের বিশ্লেষণে হইবে? দ্রাবকে না গালাইলে, ভাঙ্গিয়া কুটিয়া না ফেলিলে কি তার পরখ হয় না? জীবনকে মারিয়া তার নিদান মেলে না; রূপকে, আদর্শকে, প্রাণকে কুটিয়া গুঁড়ো করিয়াও তাদের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায় না, তাদের অবগুণ্ঠিত সত্য মূর্ত্তিটিকে ফোটাইয়া তোলা যায় না।

বর্ত্তমান যুগ যে একটা কালাপাহাড়ী হস্ত উদ্যত করিয়া অতীতের দেবমন্দিরগুলোর পানে চলিয়াছে, তার কারণ—সে সব দেবতায় তার আর বিশ্বাস নাই। তার বিচার-বিশ্বাস যেটাকে মিথ্যা বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছে, সেটার প্রতি কোনরূপ মমতা বা দরদ তার না

হওয়াই স্বাভাবিক। যে অতীতের শব আজ তার দৃষ্টিতে শিব নহে, শবমাত্র, এমন কি, গলিত, পূতিগন্ধময় শবমাত্র, সেটাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকায় আজ তার কৃতার্থন্মন্যতা নাই। জীবন মৃত্যু নয় বলিয়াই, সে মৃতের স্পর্শ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া লইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। জীবিতের কাছে মৃত অশুচিই রহিবে। যাদুঘরের পুরাতন রক্ষীরা যেটাকে তাদের মণিকোঠা বলিয়া সযত্নে পাহারা দেয়, সেটা সাচ্চা জহরতের কোঠা না হইয়া যদি ঝুঁটা রাবিশের ঘর হয়, এবং সে গুদাম পচা ও রদি মালে ভরতি করিয়া রাখার ফলে, কেবল খানিকটা ঠাঁই-এর অপব্যবহার নয়, লোকচিন্তা এবং লোকব্যবহারের সমগ্র আয়তনের আবহাওয়াটাই দূষিত হইয়া পড়ার উপক্রম হয়, তবে, তার দরজা জানালাগুলো খুলিয়া দিয়া, এমন কি, আবশ্যকমত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াও, সেটাকে সাফ করার চেষ্টা কি সাধু চেষ্টা নয়? কোঠার ভিতরে আদর করিয়া তুলিয়া রাখার মতন জিনিষ হয় ত' কিছু রহিয়াছে, কিন্তু নির্ম্মম ভাবে ঝাঁটাইয়া ফেলার মতন জঞ্জাল তার চাইতে ঢের বেশী জড় হইয়া নাই কি? পূজারীর প্রবেশের আগে ঝাড়ুদার একবার সব আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া ফেলিলে ভাল হয় না কি? ঝাড়ুদার কাচ ভাবিয়া পরশপাথরও ঝাঁটাইয়া ফেলিলে ফেলিতে পারে—সে আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে। এই জন্য বিজ্ঞ বিচক্ষণ জহুরির তদারকে সাফাই কাজটা হইলে ভাল হয়। কিন্তু মণিকোঠার দুয়ারে যারা প্রহরী, তারা যে পূজারী ও পূজার্থী ছাড়া আর সকলেই "পঞ্চম", অস্পৃশ্য করিয়া দূরে রাখিতে চাহিয়াছে। কাজেই, নিদেনপক্ষে সত্যগ্রহের জুলুম করিয়াও ঢুকিয়া পড়ার দরকার পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে।

ঈজিপ্টের মমির কথা উঠিয়াছিল। আমাদের এ দেশের মণিকোঠাটিও ঐ রকম শবভাণ্ডারের মতন একটা কিছু? এ দেশের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও প্রতিরূপ যা-কিছু, সে-সব না কি ঐ মণিকোঠায় যত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে। পাঁচ সাত হাজার বছরের আয়ু ভোগ করিয়াও সে সবের অনেক কিছু এখনও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু মরার গাদায় চাপা পড়িয়া তারাও বুঝি মরার মতন। সত্যকার জীবন্ত ও চলন্তের সঙ্গে তাদের যোগ ততটা নাই, যতটা রহিয়াছে মৃত ও আড়ষ্টের সঙ্গে। যারা সত্যই জীবন্ত, তাদের মূলে সক্রিয়তার ও বিকাশের আনন্দ আছে বলিয়াই তারা জীবন্ত। আনন্দই সৃষ্টিমহাপাদপের মূলে এবং শিরায় শিরায় সঞ্চরণশীল রস। বাঁচিয়া থাকিতে গেলে এই রসসঞ্চারের স্পষ্ট অথবা নিগূঢ় ধারাগুলোর সঙ্গে নিজের সংযোগের প্রণালী খোলা রাখিতে হইবে। আমাদের পুরাতন সভ্যতার যা কিছু এখনও ব্যক্তির ও সমষ্টির ভাবে, বেদনায়, কর্ম্মে, ব্যবহারে বাঁচিয়া আছে, তাদের মূলে ও অবয়বে রসের যোগান বন্ধ হয় নাই নিশ্চয়। কিন্তু রসসঞ্চারের শিরা বা নাড়ীগুলি কিসের যেন বাধা পাইয়া আড়ষ্ট, সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ভয় হয়, বুঝি-বা রসের চলাচল, স্বচ্ছন্দগতি বন্ধ হইয়া গেল। প্রাণনব্যাপারে যে ক্লেদ জন্মিতেছে, সে ক্লেদ বাহির না হইয়া ভিতরেই সঞ্চিত হইতেছে কি? যে অঙ্গে জীবনের সাবলীল সাড়া এখনও পাওয়া যাইতেছে, দুদিন বাদে হয় ত' তাতে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিবে। এটা ভয়েরই কথা। মূলে রসের প্রাচুর্য্য রহিলে, ভয়ের ভিতরেও ভরসা থাকিতে পারে। কিন্তু মূল ছাড়িয়া আমরা যে শাখা লইয়া, ফল ফুল পাতা লইয়া বেজায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি! মূলের পরিচয় বোধ আজ আমাদের ভেতরে তেমন সজাগ নয়, তেমন স্পষ্ট নয়। কোন্‌টা সত্যকার মূল, তাই বা কে জানে? এ সভ্যতাটির মূল কি বেদ? হয় ত' তাই। কিন্তু সে মূল সম্বন্ধে হালের পরিচয় ও ধারণা যে আমূল বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

প্রাচীনদের মণিকোঠায় ইহাই কিন্তু ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। এই মাটিতে আর আর সব কিছুর মতন এর উদ্ভব হয় নাই। নীহারিকার পরপারে কোন্ অজানা কল্পলোকে নয়, আমাদের এই ব্যবহারিক জগতের সকল রকম অপূর্ণতা ও আপেক্ষিকতার ঊর্দ্ধে কোন্ সনাতন সত্যলোকে এর শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা। অজ্ঞানতিমিরান্ধ নরলোকের চক্ষে, দেখা-শোনার পরপার হইতে হিরণ্যকেশ হিরণ্যবপুঃ কোন্ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের ভাস্বর-অঙ্গুলি-ধৃত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা যে এই বেদ! মণিকোঠার প্রহরী যারা, তারা যে তাকে পার্থিব মণি-মাণিক্য মনে করে নাই, ক্ষীরোদসাগরে অনন্ত শেষশয্যায় শয়ান ভগবানের বক্ষোভূষণ কৌস্তুভমণি বলিয়া জানিয়াছে। আজ রাসায়নিক তার পরীক্ষার আগুনে

পোড়াইয়া, তার বিচারের দ্রাবকে গালাইয়া, সেটাকে কি সাব্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে? এ নরলোকের সাচ্চা হীরাও ত' বিশ্লেষণে কয়লার বর্ণচোরা, ছদ্মবেশী সহোদর ভাই। কিন্তু মণিকোঠার ঐ কৌস্তুভমণি?—সেটাও নিতান্ত বাজে পাথরেরই একটা ঢেলা, স্ফটিকের নুড়ি? মিথ্যা সংস্কারের প্রসাধনে তাতে মিথ্যা জলুসের সৃষ্টি করার প্রভূত প্রয়াস হইয়াছে, কিন্তু সে সত্যকার হীরা কোন দিনই ছিল না বা হয় নাই। তাই কি? পাথরের নুড়িটি বিলেতী পণ্ডিতেরা আর তাঁদের দেশী সাক্‌রেদেরা বেশ করিয়া পিষিয়া গুঁড়ো করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁদের বেদিক কন্‌কর্ডান্স, বেদিক ইন্‌ডেক্স প্রভৃতিতে ঐ পুরাতন শক্ত, নিরেট নুড়িটি ধূলো হইয়া এক একটা পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছে দেখিতেছি। ধূলোবালির পাহাড়। কোন কোন কারিগর ধূলো ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দু'একটা চক্‌চকে দানাও পাইয়াছেন বলিতেছেন। সত্যিকার হীরে বলিতে অনেকেই নারাজ। তবে, সেই দুটো-চারটে চক্‌চকে দানাকণার বাজারদস্তর দাম করিয়া দিয়াছেন হালের পণ্ডিতজহুরীবর্গ। খুব বেশী দাম ওঠে নাই। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কিছু কদর হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডটা প্রায় ষোল-আনাই বাজে। পুরাতন ইতিহাসের ও অভিব্যক্তির কিছু কিছু মালমসলা তাতে পাওয়া যায়, এইজন্য একদম বাজে নয়। সত্যকার প্রয়োজন ও উপাদেয়তার কষ্টিপাথরে কষিয়া তাদের দাম দেখিতে পাইতেছেন না বর্ত্তমান বিপশ্চিতেরা। জ্ঞানকাণ্ডও বিশ্বের হাটে খুব উচ্চ মূল্যে যে বিকাইতেছে, এমন নয়। ম্যাক্‌ডোনাল সাহেবের মতন কেউ কেউ ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলের "সং অফ্‌ ক্রিয়েশন্‌"এর তারিফ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে—আমরা শিশুর কেরামতিকে যেমনধারা তারিফ করি। ডয়সন্‌ সাহেবের দল উপনিষদের পিঠ চাপড়াইয়াছেন, কিন্তু তাকে কাণ্ট-সোপেনহাওয়ার-প্রমুখ ও-দেশের তত্ত্ব-রসিকদের বৈঠকে বসিবার জন্য কোণে একখানা ইঁট দেখাইয়া দিয়াছেন মাত্র। খোদ সোপেনহাওয়ার উপনিষদের জয় ঢালা-প্রাণে গাহিয়াছিলেন; গ্যেটের অন্তর-অধরেও শকুন্তলার কাব্য-মদিরা একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পীযূষস্পর্শ আনিয়া দিয়াছিল দেখিতে পাই। কিন্তু দেশ, কাল, বর্ণের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া এতটা নিবিড়, এতখানি সত্য সামঞ্জস্যের অনুভূতি সোপেনহাওয়ারেই অথবা গ্যেটেতেই সম্ভব। পশ্চিমের পণ্ডিতী বাজারে এ দেশের পুরানো মণিকোঠার কোন সামগ্রীই তেমন উচ্চমূল্যে বিকায় নাই। এ দেশের ধর্ম-কর্ম, দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, সমাজ-রাষ্ট্র—এ সকলের বেশীর ভাগ বাতিল মালের গুদামজাত হইয়াছে। কিছু কিছু এখনও বিশ্বমানবের কারবারে খাটিতেছে। কিন্তু "ক্রেডিট্‌" তাদৃশ জবর নয়। যাঁরা বেশীরভাগ এ দেশের ঐ সব বকেয়া ও মামুলি মালের কারবার করেন, আর কারবারটা সাবেকি ধরণে চালান, তাঁদের চেক্‌ সার্ব্বজনীন নব্যশিষ্টজনজুষ্ট ব্যাঙ্কে সব সময় সমাদরে গৃহীত হয় না। পূর্ব্বাচার্য্যেরা বেদ সম্বন্ধে যে সব উক্তি করিয়া গিয়াছেন, বিচার তুলিয়া তার যে-ভাবে সমাধান করিয়াছেন, তা আজকা'লকার দিনে সরাসরি চালাইতে গেলে চলে না। মেকি মুদ্রা চলিবে কেন? সত্যই মেকি কি? এ দেশের সমাজ-রাষ্ট্রের অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাই ত' কোন্‌ এক অনগ্রসর মধ্যযুগের জেররূপে নিজেদের জড়ত্বধর্ম্মের গুণেই এখনও কিছু "চলিতেছে"। সে চলাটাও বুঝি বা অচলের, পঙ্গুর চারিধারের চঞ্চলগতির মাঝখানে নিজেও চলার একটা ভ্রম। সত্যই ভ্রম? সত্যই কি সে-সব—সেই প্রাচীন সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি—অনগ্রসর মধ্যযুগেরই জের? বর্ত্তমান ডিমোক্রাসী, সোসিয়ালিজম্‌, কম্যুনিজ্‌ম ইত্যাদির দিনে ও-সব বর্ণাশ্রম, সমাজ প্রভৃতি কি একেবারে পরীক্ষা, এমন কি, মনোযোগের অযোগ্য কোন একটা গোরস্থান? কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক গিয়া সেখানে সনাক্ত করার জন্য কতকগুলো নিশানা আর ফলক লাগাইয়া দিয়া আসিবেন? আর জাতির পুরাস্মৃতি অবসর মত সেখানে যাইয়া দুচারিটা মাল্য-অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া আসিবে? অতীতে যাই হ'ক, বর্ত্তমানে সে আর স-প্রয়োজন ও সার্থক নয়?

এ দেশের সাহিত্য শিল্প আর দর্শন মোটামুটি আদর এখনও পাইতেছে। বিশ্বমানবের বৈঠকেও। গণিতের কথা ছাড়িয়া দিলে, সত্যকার বিজ্ঞান না কি এ দেশের মাটিতে গজায় নাই। আয়ুর্বিজ্ঞান, ফলিতজ্যোতিষ—এ সকল না কি হালের টেষ্ট উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। ধর্ম-কর্মের ভূষির আড়তে সত্যকার সারাল' শস্যের সওদা করিতে যাওয়া না কি বৃথা! অন্ধকারে নয়, তেলের প্রদীপ

আলিয়াই আড়তদারেরা তাদের ভূষির কারবার হাজার হাজার বছর ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছে। তাদের মামুলি দার্শনিক প্রতিভাটি হইল সেই তেলের প্রদীপ। অন্ধকারে বসিয়া পোকাধরা ভূষির কারবার চালাইলে, দোকানদার খরিদ্দার দুজনারই ভুল হবার কথা। কিন্তু দিব্য ফুট্‌ফুটে প্রদীপের আলোয় এ ব্যবসা যে এতদিন নির্ঝঞ্ঝাটে চলিয়া আসিতেছে, এইটেই আশ্চর্য্য! ব্রহ্ম নিয়ে, আত্মা নিয়ে, মুক্তি নিয়ে, কর্ম নিয়ে এত সূক্ষ্মদর্শিতা, অথচ, হাজার হাজার বছর ধরিয়া ঐ পোকাধরা ভূষির জাবর কাটিয়া মরিলাম! মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র—সেই অন্ধতমিস্রাযুগের ম্যাজিক—নিয়ে আমাদের ধর্ম-কর্ম! ম্যাজিক না কি হালের বিচারকদের রায়ে "আদিম বিজ্ঞান"। কিন্তু ভারতে আদিম কি চিরদিনই আদিম রহিয়া যাইবে? এখানে যা-কিছু দেখা দেয়, তাই কি স্থাণু, কূটস্থ, অনড়, অচল বনিয়া যায়? ভারতীয় মগজের ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞান আর মন্তর-তন্তর এ দুই-ই স্বতন্ত্র দুই কুঠুরীতে খাসা আপোশ করিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে কিরূপে? এই রকম সব জেরা কেবল বিদেশী আলোচকদের নয়, অনুবাদক ও অনুকারক আমাদেরও অনেকের মনে আজকা'ল গজ্‌গজ করিতেছে।

সেই পুরাবিদ্যা—যার অভিজ্ঞান ও পরিচয় এ দেশে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রে কতকটা পল্লবিত রহিয়াছে—আর নব্যবিদ্যা—যেটা মুখ্যতঃ বিজ্ঞানের নামে নিজেকে চালাই-তেছে—এ দুয়ের মাঝখানে একটা সুমেরু-কুমেরুর ব্যবধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এটা যদি সত্য সত্যই বিজ্ঞান হয়, তবে সেটা বোধ হয় আর বিজ্ঞান নয়। "বোধ হয়" বলিতেছি এইজন্য যে, হয় ত' হালের বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সবটা না হইতে পারে; তার সীমার বাইরেও বিজ্ঞান থাকা সম্ভব, এবং সে বিজ্ঞান চল্‌তি বিজ্ঞানের পছন্দমাফিক অথবা ফয়্‌মাসি একটা কিছু নাও হইতে পারে। মানুষের মামুলি বিশ্বাসের অনেক কিছু এর মধ্যেই বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারের দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্মোহন-বিদ্যা, দূরশ্রুতি, দূরদৃষ্টি প্রভৃতি কোন কোন উপেক্ষিত অতিথি আজ স্বাধিকারের দলিলপত্র দেখাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—নিমন্ত্রণ-পত্রের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে নাই। প্রেততত্ত্ব, জন্মান্তরতত্ত্ব, যোগশক্তি প্রভৃতি এখনও হয় ত' বাইরে দাঁড়াইয়া! কিন্তু কৃপাপ্রার্থী হইয়া নয়। কত দিন আর তাদের ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে? যা-কিছু পরীক্ষিত সত্য, যা-কিছু প্রমাণের ধোপে টিঁকিয়াছে, তাই যদি বিজ্ঞান হয়, তবে, চীনের প্রাচীর তুলিয়া তার এলেকার চৌহদ্দি ঠিক করিয়া রাখা যায় না। বিজ্ঞানের পৃথ্বী ক্রমেই বিপুলতরা হইতেছে। বিজ্ঞানের গতিও নিরবধি। এত দিন প্রাচীন ভাব-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান নবীনের ঔদ্ধত্যের কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। জানায়োরবিশেষের শিঙে ঠেকিলে হীরার ধারও ভাঙ্গিয়া যায়। আজ নানা কারণে তার ঔদ্ধত্য খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন অসত্য বলিয়া, রিক্ত-প্রয়োজন বলিয়াই যে এত দিন দূরে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন না হইতে পারে। প্রমত্ত নবীনের স্পর্দ্ধার আতিশয্য একটুখানি খাটো না হওয়া পর্য্যন্ত দূরে সরিয়া থাকিয়া সে হয় ত' ভালই করিয়াছে। আপন স্বাধিকারে যেখানে মত্ততা, সেখানে অন্যের স্বাধিকারে অন্ধতা ও আক্রোশ হওয়াই স্বাভাবিক। মত্তের পরীক্ষায় তিষ্ঠা হয় না, বিচারে নিগমন হয় না। এখন বিজ্ঞানের যেটা অঙ্গীকৃত ভদ্রাসন, তাতে আসিয়া বসবাস করিতে অনেক সত্যসিদ্ধান্তকেও লাঠালাঠি করিতে হইয়াছে দেখিতে পাই। অথচ, পরীক্ষিত সত্য, বিচারসিদ্ধ সমাধান মাত্রেই সে ভদ্রাসনে স্বাধিকারে বাস করিবার যোগ্য।

মত্ততার ঘোর কাটিয়া যাবার উপক্রমে আজ পুরাবিদ্যাও সেই ভদ্রাসনে আপন বেদখল স্বত্ব দখল করিতে আসিতেছে। তাকে অভদ্র বলিয়া আজ সে ভদ্রাসন হইতে বেদখল করিতে গেলে চলিবে না। "ও সমস্ত বর্ব্বরযুগ, মধ্যযুগ; ও সমস্ত মিথ্যা কুসংস্কার"—এই রকম ধারা অসহিষ্ণুতার প্রগল্‌ভ কটুবাণী মত্তোচিত হইয়াছিল, ভদ্রোচিত হয় নাই। ওটা পরীক্ষকের নিশ্চিত ফল, বিচারকের নিরূপিত সিদ্ধান্ত হয় নাই; উদ্ধতের, স্পর্দ্ধিতের, দুর্বিনীতের অশিষ্ট, অশোভন, অযুক্ত অপভাষণই হইয়াছিল।

বিজ্ঞানের মুখে আত্মশ্লাঘার সুর নরম হইয়া আসিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞানের প্রতি স্পর্দ্ধার আস্ফালনও কমিয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দী প্রজ্ঞান বা বোধিকে ভূয়া মরীচিকা ভাবিয়াই সুস্থির হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়-গোচরতাই ছিল বাস্তবতার একমাত্র প্রতিষ্ঠা। উপনিষদে

দেখিতে পাই—ঋষিরা কে কার গতি, কে কার প্রতিষ্ঠা খুঁজিতে খুঁজিতে শেষকালে আকাশকেই নিখিলের গতি ও প্রতিষ্ঠা—জ্যায়ান্ এবং পরায়ণ—বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। সে আকাশ শুধু যে এই ভৌতিক আকাশ এমন মনে না হইতেই পারে। চোখে দেখিয়া নয়, কেবলমাত্র বিচার করিয়া নয়, প্রজ্ঞানে, কি না, সমগ্র যেটি, পরম যেটি, সেটিকে অনুভবে পাবার যে উপায়, সেই উপায়ে, সেই আকাশের অনপিহিত মহিমা তাঁরা জানিয়াছিলেন। বিজ্ঞানও নিখিলের যেটি গতি ও প্রতিষ্ঠা, সেটিকে খুঁজিয়া চলিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় বা ম্যাটার, আর তার পরিমাপযোগ্য শক্তি বা ফোর্স—এতেই যাইয়া তাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে দেখি। যেখানটায় তাকে থাকিতে হইয়াছিল, সেইখানেই বিজ্ঞানের এবং বাস্তবতার (ফ্যাক্টের) প্রান্তসীমা মনে করার একটা সর্ব্বনেশে মোহ তাকে পাইয়া বসিয়াছিল, এও দেখি। ভৌতিক ইন্দ্রিয় ক'টা, আর তাদের সাহায্যের জন্য ভৌতিক যন্ত্রপাতি কতকগুলো, আর তার আঁকের খাতাখানা—এই মাত্র পুঁজি করিয়া বিজ্ঞানের ছিল পথযাত্রা। পায়ে শিক্‌লি পরিয়াই তার যাত্রা সুরু হইয়াছিল। সোজা, সমান রাস্তায় শিকল পায়ে দিয়াও হয় ত' কায়ক্লেশে হাঁটা যায়। কিন্তু পথ বন্ধুর হইলে, পথে খানাডোবা ডিঙ্গাইবার থাকিলে, আর চলে না। ইন্দ্রিয়গোচরতাই হইল বিজ্ঞানের একমাত্র প্রামাণ্য, যুক্তি তার দাসীপনা করিতে নিযুক্ত; দেখা-শোনার হাত-ধরা ছাড়া বিজ্ঞান নাচার, নিরুপায়;—এই প্রতিজ্ঞাই, আর এই ধারণাই বিজ্ঞানবিদ্যাকে এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে একটা গোড়ায় গণ্ডী দিয়া পরিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা, সে ধারণা না নড়িলে, সে গণ্ডী হইতে বিজ্ঞানবিদ্যার মুক্তি হইবে না। বিজ্ঞানের লোকায়ত জড়বাদ, দেহাত্মবাদ, নিরীশ্বরবাদ, ভোগবাদ প্রভৃতি গোড়ায় একটা বড় গোছের "বাদ" দেওয়ার ফলেই অমনধারা জম্‌কাল' বৈজ্ঞানিক "সিদ্ধান্ত"-রূপে নিজেদিগকে খাড়া করিতে পারিয়াছিল। গোড়াকার সেই বাদ দেওয়ার ফলেই, বিজ্ঞান শুধু চর্মচক্ষু মেলিয়াই চাহিতে পারিয়াছে, প্রজ্ঞাচক্ষু তার ফোটে নাই। প্রজ্ঞাচক্ষু দেখা-শোনার পরপারে, মাপাজোকা ও হিসাবের অতিগ লোকে যা কিছু দেখিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে, বিজ্ঞান এত দিন সেগুলোকে মায়া বলিয়া, মতিভ্রম বলিয়া এক রকম তুড়ি দিয়াই উড়াইয়া আসিতেছে। জীবনের পরপার আত্মা, ভগবান্—এ সব হয় মিথ্যা, নয় অসিদ্ধ—প্রমাণাভাবাৎ। প্রমাণটা যে কি—সত্যের অবধারণ বা নিরূপণের উপায়টা যে কি—এই গোড়ার হিসাবটাই বিজ্ঞান ভাল করিয়া লইতে খেয়াল করে নাই। ভিতরে মন বা আত্মার নিজের কোন রোশনাই নাই; সে চাঁদের মতন পরের আলোতে বাহার দিয়া বেড়ায়; ইন্দ্রিয়ের গবাক্ষগুলোই আসল আলোর রাস্তা;—এই বিশ্বাসটাকে অন্ধভাবেই আলিঙ্গন করিয়া সে পড়িয়াছিল। সবার পরীক্ষক ও সমালোচক সে—কিন্তু নিজের পরীক্ষা ও আলোচনাটা করাই সে অনাবশ্যক বুঝিয়া বসিয়াছিল। তার নিজের গোড়ার বন্দোবস্তটাকে সে অকাট্য অনড় মনে করিয়াছিল। এটা কিন্তু গোঁড়ামি—বিজ্ঞানের গোঁড়ামি। তাই বলিয়া সর্ব্বনেশে নয়।

ম্যাটার আর ফোর্সে যখন আর কুলাইল না, তখন ঈথার আসিল, দেশ-কাল—কন্‌টিনুয়াম আসিল। এদের আসার ফলে তার পায়ের শিক্‌লি একেবারে খসিয়া না পড়িলেও শিথিল হইতেছে; তার গলার দড়ি না খুলিলেও লম্বা হইতেছে। তার চরিয়া খাবার ময়দান আজ আর তেমন ছোট নয়। ইন্দ্রিয়-গোচরতার খুঁটিতে সে এখনও বাঁধা বটে, কিন্তু খুঁটিতে বেজায় টান পড়িতেছে; গোঁজ উবড়াইবার আর বড় বেশী দেরি আছে মনে হয় না। তখন বন্ধনমুক্ত সে কোন্ অজানা ময়দানের পানে ছুটিয়া যাইবে? কিসের, কেমনধারা ময়দানই বা সেটা?

বিজ্ঞানের মুক্তির অপেক্ষায় বিশ্বমানবের অন্তর-দেবতা আজ যে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে! বিজ্ঞানের মুক্তিতেই প্রজ্ঞান। গণ্ডী দিয়া ঘিরিলে যেটি বিজ্ঞান, গণ্ডী ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে সেইটাই প্রজ্ঞান। এ প্রজ্ঞানকে ঋষিরা ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ব্রহ্ম—যেটি সমগ্র, যেটি পূর্ণ, যেটি ভূমা। প্রজ্ঞান তাই সমগ্রের, পূর্ণের জ্ঞান। তাই বেদ। পুঁথি কয়খানা বলিতেছি না। একটা পরিভাষা করিতেছি। সে পরিভাষা কোথায় লাগিবে না লাগিবে, সে আলাদা কথা। সকল দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য দেখি প্রজ্ঞানে বিশ্বাস করিয়াছে, "বেদ" মানিয়াছে। সে বেদ হয় ত' ঈজিপ্টে ছিল "বুক অফ্ দি ডেড"; সুমের-আকাডে আর একটা কিছু ("ক্যাল্‌ডীয় বেদ"), চীনে অপর একটা কিছু। রূপ, চেহারা আলাদা আলাদা। তাতে তেমন কিছু আসিয়া যায় না। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে "রবেরিব রূপবিষয়ে" এই প্রজ্ঞানের প্রামাণ্য প্রাচীন বিপশ্চিতেরা মানিতেন। হালের বিদ্যাও মানার দিকে না ঝুঁকিলেও—ও বিষয়ে উদ্‌গ্রীব, অবহিত হইতেছে। সংশয়াত্মা সে বিনাশের পথে চলিতে চলিতে আজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাকে ফিরিতেই হইবে। তার যে সত্যে, যে বাস্তবে, যে পদ্ধতিতে ছিল প্রতিষ্ঠা, সেইটাই যে আজ সংশয়ে দুলিতেছে। তার পায়ের নীচে আজ যে আর শক্ত জমিন নেই। তার উড়িবার পাখা হইয়াছে—কিন্তু পাখার তলে, পাখাকে ফিরিয়া জমাট বাতাস্ আজ যে আর নেই। বিজ্ঞানের মূল প্রস্তাবগুলি সবই যে হাল্‌কা হইয়া পড়িতেছে। মরণের তরে তার এ পাখা উঠিল না কি? নিজেকে নাকচ নস্যাৎ করিয়া দিয়া নয়, নিজের পূর্ণতর, অধিকতর সমঞ্জস বিকাশের পথে এতদিনকার মিথ্যা, কল্পিত অন্তরায়গুলি সরাইয়াই, বিজ্ঞানকে আজ আবার নূতন করিয়া, নূতন প্রাণ ও কলেবরে ভূমিষ্ঠ হইতে হইবে। সে নূতন, শৃঙ্খলমুক্ত, স্বচ্ছন্দগতি, পূর্ণতর বিজ্ঞান আর বোধ হয় প্রাচীনের প্রজ্ঞানকে অশ্রদ্ধা করিবে না। বিজ্ঞানের যুগ চলিয়াছে; কিন্তু প্রজ্ঞানের যুগ বুঝি-বা আসিতেছে। সন্ধিক্ষণে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠিতেছে—বিজ্ঞান না প্রজ্ঞান?

মর্ত্ত্যের অমৃত

শ্রীঅনিলবরণ রায়

হে ধরণী! তোমা সনে মম নহে শুধু
দু'দিনের পরিচয়; জনমে জনমে
আসি তব বক্ষপরে করিয়াছি আমি
কণ্ঠভরি মর্ত্ত্যমধু পান, স্মৃতি তার
আধারের স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত।
যেদিকে ফিরাই আঁখি মনে হয় সব
যেন মম কত চেনা, কত পরিচয়,
আত্মীয়তা লাগি আসে বাহু পসারিয়া,
কানে কানে কহে কত মরমের কথা,
বুঝি বা না বুঝি চিত হয় পুলকিত।
উষার অরুণরাগে দিয়া পূর্ব্বাভাস
তব সূর্য্য উঠে যবে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
সহসা জাগিয়া উঠে হৃদয়-কন্দরে
যুগ-যুগান্তের স্মৃতি, নূতনের মাঝে
চির-পুরাতন সেই রবির উদয়!
জোছনায় যবে ভেসে যায় ধরাতল
মলয় বহিয়া আনে কুসুম-সুরভি,
কত মধু বসন্তের মধুর মিলন
স্পন্দিত হইয়া উঠে শিরায় শিরায়!

জন্মে জন্মে কত জনে বাসিয়াছি ভাল,
কত হর্ষ ব্যথা কত হাসি অশ্রুজল
সৃজিয়াছে আনন্দের চির-মন্দাকিনী
সে অন্তঃসলিলা ধারা শুকাবার নহে।

বিরহ মৃত্যুর মাঝে তাই সদা শুনি
আশার ঝঙ্কার; যায় না যাবার নহে
যাহা কিছু আছে এ ধরায়, সব রবে,
জন্মে জন্মে পূর্ণ হয়ে উঠিছে সকলি।

হয় যবে অনুভূতি—নহি দুদিনের,
অমর অক্ষয় আমি, দেহের মৃত্যুতে
হয় নাক আমার মরণ; পরলোকে
লভিয়া বিশ্রাম আসি ফিরে এধরায়
লভি নব প্রাণ মন নব কলেবরে
নবভাবে ধরণীরে করিতে সম্ভোগ,
সংসারের ক্ষণস্থায়ী যত সুখদুঃখ
বিরহ মিলন দেয় ধরা নব ছন্দে
নূতন আনন্দে; এ ধরিত্রী হয় মম
চির-যৌবনের চির-নন্দন-কানন।

দূরের আশায়

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৪)

সেদিন ঘাট হইতে কাপড় কাচিয়া আসিবার সময় উৎপলা কিশলয়কে দেখিতে পাইয়া সশঙ্কিত ভাবে যেরূপ করিয়া চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া কিশলয় বড় কম বিস্মিত হয় নাই।

গত সপ্তাহে বিশ্বনাথ বাড়ী আসিয়াই অসুখে পড়িয়াছেন। অসুখ এ কয় দিনে না কমিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে ডাক্তার ডবল নিউমোনিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। রোগীর অবস্থা শুনিয়া বাড়ীর মেয়েরা ভয় পাইয়া কিশলয়কে টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছেন। কিশলয় সেইজন্য আসিয়াছে। কিন্তু সে একা,—উর্ম্মিলা আসে নাই।

ললাটে করাঘাত করিয়া গৌরীদেবী বলিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল রে, এ সময়েও বউমাকে নিয়ে এলিনে কিশলয়? তোর বাপের এই ব্যায়রাম, বাঁচবে কি না ভগবান জানেন, তবু তুই বউ নিয়ে এলি নে?"

কিশলয় বলিল, "বউ এসেই কি বাবাকে ভাল করে দিত পিসিমা? সেবার যখন এসে এখানে কয় দিন ছিল, তখন তুমিই তো বলেছিলে বউকে আর এনে দরকায় নেই, ওর চাল তোমরা সইতে পারবে না। বাবাকে পর্য্যন্ত তার জন্যে তোমরা যা ইচ্ছে তাই বলেছিলে, রাজার মেয়েকে বউ করার অপরাধে। সেই জন্যে বাবাও আমাকে বলে দিয়েছেন, ওকে যেন আর না আনা হয়। আমি সেই সব জন্যেই আনিনি পিসিমা, নচেৎ সে আসতে চেয়েছিল, তার বাপ মাও পাঠাতে চেয়েছিলেন। তোমরা আমাকেই একা আসবার কথা লিখেছ, তাকে আনবার কথা কিছু লেখনি।"

গৌরী দেবী সরোষে চোখের জল মুছিয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা দেবী নীরবে যেমন হাতের কাজ করিতেছিলেন তেমনই করিতে লাগিলেন।

মায়ের দিকে তাকাইয়া কিশলয় জিজ্ঞাসা করিল, "বউকে নিয়ে আসতে সরকারকে পাঠিয়ে দেব মা, আজই নিয়ে আসবে এখন?"

অন্নপূর্ণা দেবী উত্তর দিলেন, "না—"

ক্ষুণ্ণ হইয়া কিশলয় বলিল, "তুমিও আমার ওপরে রাগ করে বলছো মা?"

শান্ত দুটি চোখের দৃষ্টি পুত্রের মুখের উপর স্থাপন করিয়া শান্তকণ্ঠে মা বলিলেন, "পাগল ছেলে, আমি তোর ওপরে রাগ করতে পারি? তুই বউমাকে আনিস নি, ভালই করেছিস। উনি যা হুকুম দিয়েছেন তা মেনে চলতেই হবে। সেবারে বউমা এসে বড় কম লাঞ্ছনা তো সয়নি; অথচ সে কোন অপরাধই করেনি। দোষের মধ্যে সে রাজার মেয়ে। কাজেই সে যা করত সবই না কি বাড়াবাড়ি। এই নিয়ে ওঁকেও বড় কম লাঞ্ছনা সইতে হয় নি, যার জন্যে উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, বউমাকে আর কখনও এখানে আনবেন না। তুই যে ওঁর সে প্রতিজ্ঞা অটুট রেখেছিস কিশলয়, এতে সত্যি আমি বড় খুসী হয়েছি।"

আনন্দে কিশলয়ের বুকটা ভরিয়া উঠিল, সে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "প্রার্থনা করি মা, যেন জন্মে জন্মে তোমার মত মা পাই।"

পিতার সেবায় সে দেহমন ঢালিয়া দিল; একদণ্ড তাহার বিশ্রাম রহিল না।

অন্নপূর্ণা দেবী তাহার স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "দিন রাত কেবল রোগীর কাছে থাকলে তোর শরীর একেবারে যাবে যে কিশলয়, খানিকটা করে আমায় থাকতে দে।"

কিশলয় মাথা নাড়িল, "হবে না মা, তুমি কিছু পারবে না, আমাকেই সব করতে হবে।"

সে দিন পিতার অবস্থা একটু ভাল ছিল, আশ্বস্ত হইয়া কিশলয় মাকে বলিল, "আজ আমি একটু বেড়াতে চললুম মা, বাবার কাছে তুমি থেকো।"

একদিন উৎপলাকে সে পথে দেখিয়াছিল, সে নিমেষের দেখা মাত্র। উৎপলার কথা সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে নাই, কেহ তাহাকে কোন কথাও বলে নাই।

পথে চলিতে চলিতে কিশলয় ভাবিতেছিল,—সে কোথায় যাইতেছে সে খেয়ালও তাহার ছিল না। হঠাৎ খেয়াল আসিল সেই সময়, যখন সে দেখিল একেবারে জগদীশের বাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছে।

পাড়ার একটী ছেলেকে উৎপলা সজিনা গাছে উঠাইয়া দিয়াছিল। সে অনেক ফুল পাড়িয়া দিয়াছে। উৎপলা একটা চুপড়ি করিয়া সেই ফুল কুড়াইতেছিল, জগদীশ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে তৃপ্তির চোখে দেখিতেছিলেন।

কিশলয়কে দেখিয়া সাগ্রহে তিনি ডাকিলেন, "এসো বাবা, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

উৎপলা একবার মুখ তুলিয়া দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল, হাতের চুপড়িটা মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

তাহার সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করিয়া কিশলয়ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, বলিল, "বেড়াতে বেরিয়েছি। কয়দিন মোটে বার হই নি,—বাবার অসুখের জন্যে ভারি বিব্রত হয়ে ছিলুম। আজ বাবা একটু ভাল দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বার হতে পেরেছি।"

জগদীশ বলিলেন, "আসবে না একটু?"

কুণ্ঠিত ভাবে কিশলয় দুই পা অগ্রসর হইয়া থামিয়া গেল, বলিল, "না থাক, এখন যাই।"

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উৎপলা একটু দূর হইতে প্রণাম করিল, অসঙ্কোচে বলিল, "এসো না কিশলয়দা, দরজায় এসে চলে যাবে?"

কিশলয় বিস্মিত ভাবে খানিক তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর অগ্রসর হইল। ঘণ্টাখানেক উৎপলা ও জগদীশের সহিত গল্প করিয়া কিশলয় যখন বাহির হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আকাশে সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদখানা ভাসিয়া উঠিয়া শুভ্র কিরণ ছড়াইয়া দিয়াছিল। সে কিরণ যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

বাড়ীর বাহির হইয়া কিশলয় একবার ফিরিয়া চাহিল। বড় নারিকেল গাছের পাতার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া চিক চিক করিতেছিল। মৃদু বাতাসে সরু সরু পাতাগুলি ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছিল, পাতার উপরকার জ্যোৎস্না সরিয়া ছায়া পড়িতেছিল।

বাতাবী লেবুর ডালে একটা নাম-না-জানা পাখী ডাকিতেছিল, অদূরে কোথায় কোন্ গাছের ডালে গা লুকাইয়া একটা বড় পেঁচা গম্ভীর সুরে বিধাতার কাছে কি আবেদন জানাইতেছিল কে জানে।

পথ দিয়া একজন লোক গান গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল, সম্মুখে কিশলয়কে দেখিয়া গান থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটবাবু না? কোথায় যাচ্ছেন?"

জ্যোৎস্নালোকে লোকটীকে চিনিয়া কিশলয় বলিল, "বাড়ী যাচ্ছি, তোমার বুঝি এখন ছুটি হল রামতনু? সেই ভোরে কাজে গিয়েছিলে না?"

রামতনু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আর বাবু, ভোর আর বেলা, আমাদের আবার সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য। ভূতের মত কেবল খেটেই যাচ্ছি বই তো নয়,—আর কি বলুন। ছেলেটার বড় অসুখ করেছিল, যায়-যায় অবস্থা। বাবুর কাছে দুদিনের ছুটি চাইলুম, বাবু চোখ লাল করে বললেন ছুটি দিলে আমার চলবে না, যদি ছুটি নিতে হয় একেবারে চলে যাও, আর কাজে এসো না। কি করি বাবু, পেট তো চলবে না। কাজেই কাজ ছাড়তে পারলুম না। ছেলেটা মারা গেল, কিন্তু শেষ সময়টা কাছে থাকতে পারলুম না।"

সে আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা আসি বাবু, রাত হয়ে গেল।"

সে চলিয়া গেল, অনতিদূর হইতে আবার তাহার

গানের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। এই সব দরিদ্র লোক, ইহাদের বুকগুলাকে ধনীরা নিয়ে দলন পেষণ করিতেছে। তবু ইহারা আনন্দ করে, বুকের কান্না চাপিয়া মুখে হাসে—গান গায়।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কিশলয় ফিরিল।

আজ তাহার মনটা বড় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনের জড়তা দূর হইয়া গিয়াছিল। উৎপলার অসঙ্কোচ ব্যবহার তাহার মনের সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়াছিল।

গুণগুণ করিয়া একটা গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে বাড়ীতে ফিরিয়াই শুনিতে পাইল বিশ্বনাথের অবস্থা বড় খারাপ,—ঝোঁকের বশে উঠিতে গিয়া পড়িয়া বুকে দারুণ আঘাত লাগিয়া তিনি মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়া আছেন। ডাক্তার এখনও বসিয়া আছেন, কিশলয়কে ডাকিবার জন্য চারি দিকে লোক পাঠান হইয়াছে।

মুহূর্ত্তে কিশলয়ের সকল আনন্দ দূর হইয়া গেল, তাহার চোখের সামনে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া আসিল।

(২৫)

যোগেন্দ্রনাথ ও করুণা একত্র পত্র দিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথের পত্রে ছিল কেবল উপদেশ, দুই চার কথাতেই সে পত্র শেষ হইয়া গিয়াছিল। করুণার পত্র ছিল দীর্ঘগোছের। সে লিখিয়াছিল তাহার দাদা বাড়ী আসিয়াছে। পিতা পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া সে প্রথমে অত্যন্ত রাগ ও অভিমান করিয়াছিল,—এখন তাহার রাগ অভিমান গিয়াছে। সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পাইয়াছে, আগামী মাসে চলিয়া যাইবে। উৎপলা যদি ইহার আগে আসে তাহা হইলে তাহার সহিত দেখা হয়।

যাওয়া না যাওয়া উৎপলার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, এমন স্বাধীনতা কোন মেয়ে কি তাহার বিবাহিত জীবনে পাইয়াছে? জোর নাই, উৎপীড়ন নাই, তাহার যেমন দেবতার মত স্বামী, তেমনই দেবীর মত কন্যা।

উৎপলা তখনই স্বামী ও কন্যাকে পত্র লিখিয়া দিল সে শীঘ্রই যাইবে, লোক পাঠাইবার আবশ্যক নাই, পিতা তাহাকে রাখিয়া আসিবেন।

আজ কয়েকদিন হইল বিশ্বনাথ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন,—ও-বাড়ীর সকলে শোকে মুহ্যমান। গৌরীদেবী সেই সে ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর উঠেন নাই। অন্নপূর্ণা দেবী উঠিয়াছেন, গৃহকর্ম্মও করিতেছেন। ভিতরে তাঁহার বুকখানা গুঁড়া হইয়া গেলেও উপরে তাহা দেখিয়া বিশেষ কেহ বুঝিতে পারিবে না।

তাঁহার সে ভাব দেখিয়া গৌরীদেবী বড় কম আহতা হন নাই। তিনি যাহাকেই দেখিতেছিলেন তাহারই নিকটে সরোদনে বলিতেছিলেন, "বউয়ের বিন্দুমাত্র শোক লাগেনি। আরও যেন মনে হয় বিশু গিয়ে ওর মুক্তি হয়েছে। ওর আর কি? সংসার রইল, ছেলে রইল। আমার তো তা নয়। আমার যে কেউ রইল না। একমাত্র বিশুকেই যে হাতে করে মানুষ করেছিলুম। সে গিয়ে আমার যে সব গেল।"

অন্নপূর্ণা দেবী নীরবে তাঁহার বিরুদ্ধে সব কথা শুনিয়া যাইতেছিলেন,—প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। আর তিনি প্রতিবাদ করিবেনই বা কিসের? এ রকম গ্লানিকর কথার প্রতিবাদ করা তাঁহার সাধ্যাতীত।

উৎপলা এ কয় দিন প্রত্যহই এ বাড়ীতে যাইত,—বেশীর ভাগ সময় সে অন্নপূর্ণার নিকটে কাটাইয়া দিত। অন্নপূর্ণা দেবী সামান্য দুই একটা কথা বলিতেন, বাকি সময় মুখ বুজিয়া কাটাইয়া দিতেন। উৎপলা চুপ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত, অন্য প্রতিবাসিনীদের মত অজস্র প্রবোধের কথা সে বলিতে পারিত না।

কিশলয়ের নিকটে গিয়াও সে মাঝে মাঝে বসিয়া থাকিত। কয়েক দিনের অনিয়মে যে দিন কিশলয়ের প্রবল জ্বর আসিল, সেদিন অন্নপূর্ণাদেবী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, অশ্রুপূর্ণনেত্রে উৎপলার পানে তাকাইয়া বলিলেন "উৎপল, এবার বুঝি আমার সব যায় মা; স্বামী হারিয়েছি, হয় তো ছেলেও হারাব।"

তাঁহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

উৎপলা সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আপনি আগে হতেই যত অমঙ্গলের কথা ভাবছেন কেন মাসীমা?"

অন্নপূর্ণাদেবী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "মায়ের মন সে সব জানতে পারে মা। সেদিন আমার শাঁখা সিঁদুর গেছে, আজ যদি কোল খালি হয়—" অশ্রুজলে তিনি আর কথা

শেষ করিতে পারিলেন না। উৎপলা জোর করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া দিল, "আপনি এখান হতে যান দেখি মাসীমা, এ ঘরে আপনাকে থাকতে হবে না।"

কিশলয়ের সেবার ভার সে নিজের হাতে লইল। উর্ম্মিলাকে আনিবার জন্য পত্র দিয়া জানা গেল, তাহার কঠিন ব্যারাম। সুতরাং তাহার আসার আশায় নিশ্চিন্ত হইয়া সে রমাকে পত্র দিল।

পত্র পাইয়াই রমা চলিয়া আসিল, কিশলয়ও ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিল।

তাহার আরোগ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে উৎপলা এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করিয়া দিল।

কিশলয়ের কথার ভাব, তাহার দৃষ্টি তাহাকে সন্দেহাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। যদি উর্ম্মিলা আসিত সে নিশ্চিন্ত হইত। স্ত্রীর সম্মুখে স্বামী যে কোনও অসঙ্গত আচরণ প্রকাশ করিতে সাহসী হইত না, তাহা সে নিশ্চয়ই জানিত। শঙ্কিত হইয়া সে দূরে সরিয়া যাওয়াই সমীচীন বলিয়া মনে করিল।

বিশ্বনাথের শ্রাদ্ধ মহাধূমধামে নিষ্পন্ন হইয়া গেল। রমা চোখের জল মুছিতে মুছিতে আবার শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। বাড়ীতে কেবল গৌরীদেবী, অন্নপূর্ণাদেবী ও অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়াগণ রহিলেন। কিশলয় বাড়ীর বন্দোবস্ত সব ঠিক করিয়া কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সেদিন আকাশ নিবিড় মেঘে ছাইয়া আসিয়াছিল। সারাদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়া বৈকাল হইতে ধরিয়া গিয়াছে।

জগদীশ বৈকালে কাছারীতে গিয়াছেন, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, এখনও ফিরেন নাই। উৎপলার শরীরটা তত ভাল ছিল না। সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছিল। কাছারী হইতে দ্বারোয়ানেরা এখনও আসে নাই, তাহারা আহারাদি সমাপনান্তে দশটা এগারটার সময়ে আসে।

দরজায় ধাক্কা শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া উৎপলা জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

"আমি কিশলয়, উৎপলা।"

উৎপলার সমস্ত গা শিহরিয়া উঠিল। একবার মনে হইল বলে পিতা বাড়ী নাই। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া সে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল, বলিল, "এই ঠাণ্ডায় এই সন্ধ্যার পর অন্ধকারে আসবার কি দরকার কিশলয়দা?"

কিশলয় দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া উৎপলার বিছানার এক পাশে বসিয়া বলিল, "কাল সকালেই কলকাতায় চলে যাব, তাই একবার দেখা করে যেতে এলুম।"

সে দরজা ভেজাইয়া, না বলিতে উৎপলারই বিছানায় বসায়, উৎপলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নিজেকে সামলাইয়া কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "এ সময়ে এলে, কিন্তু বাবা তো বাড়ী নেই কিশলয়দা। তিনি বিকেল পর্য্যন্ত ছিলেন, আজ ফিরবেন রাত নটার পরে। সারা দিনের মধ্যে একবার যদি আসতে, তা হলে দেখা হতো।"

কিশলয় একটু হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই উৎপলা, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসি নি, কেন না তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তাতে ভয় কি? আমি কি অনেক দিন আগে সন্ধ্যার অনেক পরেও এ বাড়ীতে আসি নি, তুমি কি নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে বসে পড়া কর নি? সে দিন যদি বিশ্বাস করতে পেরে থাকো, আজ অবিশ্বাস করতে পারবে কি?"

উৎপলা মুখ নত করিয়া রহিল, জোর করিয়া বলিতে পারিল না, সে দিন সে ছিল কুমারী, অনেকটা নিজের মতে চলিলেও চলিয়াছে। কিন্তু আজ সে বিবাহিতা, তাহার স্বামীর মানসম্ভ্রম বাঁচাইয়া তাহাকে চলিতে হইবে।

উৎপলা উত্তর দিল না দেখিয়া কিশলয় বলিল, "আমি নির্ব্বোধ নই, বুঝেছি তোমার কোথায় বাধছে। তুমি আমি বিবাহিত, সেই সঙ্কোচ তোমার আমার মাঝে একটা বিরাট ব্যবধান এনে ফেলেছে। এ ব্যবধান কেবল জগতের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকবে না, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রমতে জন্ম-জন্মান্তর ধরে হয় তো এ ব্যবধান চলবে। নয় কি উৎপলা?"

ক্ষীণকণ্ঠে উৎপলা উত্তর দিল, "যদি শাস্ত্র মানতে হয় তবে স্বীকার করতেই হবে—চলবে।"

কিশলয় বলিল, "তুমি মানো?"

উৎপলা উত্তর দিল, "মানি বই কি। হিন্দুর মেয়ে, শাস্ত্র মানতেই হবে।"

কিশলয় জোর করিয়া বলিল, "কিন্তু হিন্দুর ছেলে

অনেকেই শাস্ত্র মানে না উৎপলা, তারা গাঁজাখুরি কথা বলেই শাস্ত্রের বচন উড়িয়ে দেয়। তাদের মধ্যে আমিও একজন।"

শান্তভাবে উৎপলা জিজ্ঞাসা করিল, "উড়িয়ে দিয়ে কতটুকু লাভ হয়?"

কিশলয় বলিল "মেনেই বা কি লাভ হয়? মেনে নিলে অশেষ জ্বালা, কিন্তু উড়িয়ে দিয়ে তবু কতকটা শান্তি পাওয়া যায়।"

উৎপলা বলিল, "তোমার কথা বুঝতে পারলুম না কিশলয়দা।"

গম্ভীরভাবে কিশলয় বলিল, "বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তাতে লজ্জা পেয়ো না উৎপলা। আমি আজ খোলাখুলি ভাবেই তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি জান আমি তোমায় খুবই ভালবাসতুম—"

হাঁফাইয়া উঠিয়া উৎপলা বলিল, "ও কি কথা বলছ কিশলয়দা, ও সব কথা—"

কিশলয় বাধা দিয়া বলিল, "বলেছি যখন, শেষ করতে দাও, আমায় থামিয়ো না। আমি তোমায় ভালবাসতুম; কিন্তু সে ভালবাসা আমার ব্যর্থ হয়ে গেছে। আমি তোমায় পাইনি, তুমি অপরের পত্নী হয়েছ। জানি নে, তুমি এ বিয়েতে সুখী হয়েছ কি না; তবু আন্দাজে বেশই বুঝতে পারি, তুমি সুখী হও নি, স্বামীর আদর তুমি পাও নি, স্বামী তোমায় বহুদূরে রেখে চলেন। দেখ, তোমার আমার মধ্যে কতখানি ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, কেউ কাউকে পাওয়ার আশা করি নে, কাছে আসাও মহাপাপ বলে গণ্য হয়। কিন্তু তবু উৎপলা, তবু মনে করি, যদি তোমায় প্রকৃত কোন দিন ভালবেসে থাকি, তবে আমি তোমায় একদিন পাবই, সে একদিন এই জন্মের পরে রয়েছে। আজ যদি তোমারই মত হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করে বলি—জন্মে-জন্মে কেবলমাত্র দুইটা মন্ত্রপাঠের জোরে যোগেনবাবু তোমার স্বামী হবেন, তাতে আমার বর্ত্তমান জীবনেও আমি কতটুকু তৃপ্তি, কতটুকু সুখ পাব উৎপলা? আমি এ জীবনটা কোন ক্রমে কাটিয়ে দিতে চাই। আশা রাখি, এর পরের জন্মে তোমায় আমি আমার বলে দাবী করব। কিন্তু তোমার শাস্ত্র মানতে গেলে তা চলে কই উৎপলা?"

উৎপলা দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

তাহার পানে তাকাইয়া কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া কিশলয় বলিল, "তুমি অত কাঁপছ কেন উৎপলা, ভয় নেই, আমার দ্বারা তোমার বিন্দুমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই।"

আর্ত্তকণ্ঠে উৎপলা বলিয়া উঠিল, "তুমি আমায় অপমান করতে এসেছ কিশলয়দা?"

"অপমান—তোমায় অপমান,—" কিশলয় বিবর্ণ হইয়া গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উৎপলা বলিল, "একে অপমান বলবে না, তবে অপমান আর কাকে বলবে? তুমি জানো, আমি বিবাহিতা, আমার স্বামী বর্ত্তমান, তিনি আমায় ভালবাসেন কি না, তিনি আমায় স্ত্রীর অধিকার দিয়াছেন কি না, সে সব কথা আমার সামনে বলা, তুমি আমায় ভালবাসতে—এখনও বাস, পরজন্মে আমাকে তুমি স্ত্রীরূপে কাছে পেতে চাও, এ সব কথা অপমান নয়—তবে কি তুমি আমার স্তব করছ? স্বপ্নেও কোন দিন আমি ভাবিনি, তোমার অন্তর এত নীচ, তুমি এ রকম ভাবে আমার সামনে তোমার অন্তরের চাপা গ্লানি উন্মুক্ত করে দেবে। আমি তোমার অসুখের সময় তোমার মুখে চোখে মনের ভাব প্রকাশ হয়ে উঠতে দেখেই সাবধান হয়েছিলুম। নিজেকে অপমানিতা করতে ইচ্ছে করি নি, তাই তোমার দিকেও যাই নি। কিন্তু তুমি এত নীচ যে, এই অন্ধকারে গা ঢেকে, আমি এ সময় একলা আছি জেনে, আমায় অপমান করতে আমার বাড়ী বয়ে এসেছ।"

সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিশলয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়া নির্ব্বাকে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কিশলয় বলিল, "ঈশ্বরের দিব্য উৎপলা, আমি তোমায় অপমান করতে আসি নি, তেমন নীচ মন আমার নয়। তুমি আজ আমায় ভুলে যেতে পার, কিন্তু তোমার যে কিশলয়দাকে তুমি আগেও দেখেছ—"

বাধা দিয়া উৎপলা বলিল, "আমার সে দাদার মধ্যে পঙ্কিলতা ছিল না বলেই তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলুম। তা বলে তোমায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারি নে।

তুমি এখনই আমাদের বাড়ী হতে চলে যাও,—প্রতিজ্ঞা করে যাও, আমার সামনে আর কখনও আসবে না। সত্যি আমি তোমার মুখ আর দেখতে চাই নে। আমি তোমায় যত ভয় করি, এত ভয় আর কাউকে করি নে, সাপকে পর্য্যন্ত নয়।"

কিশলয় বিকৃত হাসিয়া বলিল, "ভয় কর?"

"হ্যাঁ, তোমায় আমি ভয় করি, তোমায় আমি দূরে রাখতে চাই।" উৎপলা মুখ লুকাইল।

কিশলয় নির্ব্বাক হইয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বেশ, তাই হবে, তাই করব। আমি এই চলে যাচ্ছি উৎপলা, জীবনে আর কোন দিন তোমার সামনে আসব না বলে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি। কিন্তু যাওয়ার সময় তবু বলে যাই, —যতটা হেয় যতটা ঘৃণ্য বলে আমায় মনে ভেবে নিলে, আমি ঠিক তত ঘৃণ্য নই। আমার একমাত্র অপরাধ আমি তোমায় ভালবাসি। এ যদি অপরাধ হয়—এ যদি পাপ হয়, তবে তা হোক। এর জন্যে যদি আমায় তোমাদের পুরাণ-বর্ণিত নরকে যুগযুগান্তর পচে মরতে হয়, আমি তাও মরব। তুমি হয় তো জেদের বশে বলবে—মন ফিরাও, কিন্তু জেনো উৎপলা—মন ফিরান যায় না। নিজের জীবন নিজে নষ্ট করা যায়, মনের মধ্যে যে ভালবাসার উদ্ভব হয় তা ধ্বংস করা যায় না। তুমি যাই বল—আমি সগৌরবে স্বীকার করব—এ যদি পাপ হয়, তবে এ পাপের বোঝা আমি সগৌরবে মাথায় করে বইব, পরজন্মে তোমাকেই পাশে পাওয়ার প্রত্যাশা করব। শুনেছি ভালবাসা বহুদূরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। জেনো—আমার এই ঐকান্তিক কামনা এর পরের জন্মে সফলতা লাভ করবেই,—যেদিন তোমার আমার মধ্যে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, তোমার যোগেন্দ্রনাথও নয়, আমার উর্ম্মিলাও নয়।"

কথা কয়টী শেষ করিয়া ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল।

বজ্রাহতার মতই উৎপলা বসিয়া রহিল। ঝর ঝর করিয়া আবার অজস্রধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। খোলা দরজা-পথে হু হু করিয়া জলে ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। দুই হাতে জীর্ণ বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া উৎপলা মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল।

তাহার চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল, চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল—এ কি করিয়া গেলে, এমন করিয়া তাহার বুকের সামান্য শান্তি, তৃপ্তি হরণ করিয়া লইলে কেন?

বাহিরের অবিশ্রান্ত ঝর ঝর জল পড়ার শব্দের মধ্যে তাহার অস্ফুট রোদনের শব্দ মিলাইয়া গেল।

(২৬)

উৎপলাকে যোগেন্দ্রনাথের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া জগদীশ বিদায় চাহিলেন।

করুণা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "তা কি হয়? এখনি এসে চলে যাবেন তা হতে পারে না,—দুইচার দিন থেকে তারপর যাবেন।"

একান্ত নিরুপায় ভাবে জগদীশ উৎপলার পানে তাকাইলেন। উৎপলা বলিল, "তবে থেকে যাও বাবা, মেয়ে যখন অত করে বলছে তখন—"

করুণা কৃত্রিম রোষের ভান করিয়া বলিল, "বুঝেছি নতুন মা, তুমি দাদাকে এ বাড়ী থাকতে দিতে চাও না, তাই আগেই ঠিক করে এসেছ—কেমন?"

জগদীশ হাসিমুখে বলিলেন, "জামাইয়ের বাড়ী খেতে নেই তো মা। আমাদের শাস্ত্রে আছে নাতি হলে তার বাড়ীতে—"

রাগ করিয়া করুণা বলিল, "বুঝেছি, আমরা তা হলে আপনার কেউ নই। কেন, আমরা কি আপনার নাতি নাতনী নই? জামাইয়ের বাড়ী না খেতে পারেন, আমাদের বাড়ী খেলেও কি দোষ?"

পরাস্ত হইয়া জগদীশ বলিলেন, "আর একটী কথাও বলব না দিদি, হার মানছি।"

অগত্যা জগদীশকে কয়েকদিন করুণার অতিথিরূপে সে বাড়ীতে অবস্থান করিতে হইল।

বাড়ীতে ছড়াইয়া পড়িল নূতন-মা আসিয়াছে। একে একে সকলেই আসিয়া দেখা করিল, কুশল প্রশ্ন করিল।

দ্বিজেন্দ্রের কাণেও এ কথা পৌঁছিল; কিন্তু সে নিজের গৃহ হইতে বাহির হইল না।

মধ্যাহ্নে যখন সে আহারে বসিয়াছিল, করুণা নিকটে বসিয়া দেখিতেছিল, সেই সময়ে উৎপলা গিয়া দাঁড়াইল।

এ বুদ্ধি করুণার মস্তিষ্ক-প্রসূত। তাহার দাদা নূতন মাকে ঘৃণা করে, এমন কি, পুনরায় বিবাহ করার অপরাধে দেবচরিত্র পিতাও তাহার চোখে অনেকটা হেয় হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা করুণা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার নূতন মা যে অন্য মেয়েদের মত নয়, সংসারে পাঁচজনের মধ্যে একজন হইয়াও সে যে কতখানি নির্লিপ্ত হইয়া আছে, তাহা দ্বিজেন্দ্রকে বুঝাইতে গিয়া সে একটা প্রচণ্ড ধমক খাইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্র বলিয়াছিল, "তুই থাম করুণা, সৎমায়ের পক্ষে দাঁড়াতে আসিস্ নে বলছি। মনে কর দেখি, বাবা কাকে এনে কার আসনে বসিয়েছেন? আমার মায়ের আসন যে এসে দখল করেছে, তাকে আমি চিরকাল ঘৃণা করব,—কোন দিন তাকে আমি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারব না।"

করুণা অনুনয়ের সুরে বলিয়াছিল, "ভক্তি-শ্রদ্ধা না পার, দয়াও করতে পারবে না? কে বললে সে আমার মায়ের আসনে এসে বসেছে? সে এসেছে বটে, কিন্তু সে আসন দখল করতে পারে নি। বাবা তাকে এনেছেন, এই তাঁর দোষ। তিনি একটী মেয়ের জীবন একেবারে নষ্ট করে দিয়েছেন, এই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অপরাধ। এ ছাড়া পিতারূপে আমাদের কাছে তিনি দোষ করেন নি। দোষী তিনি ওই মেয়েটীর কাছে,—আমাদের কাছে নন।"

উৎপলা গিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই দ্বিজেন্দ্র মাথা তুলিয়া চাহিল।

এত রূপ—তাহার চক্ষু হঠাৎ দৃষ্টিপাতে যেন দিশাহারা হইয়া গেল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মাথা নীচু করিল।

উৎপলা করুণার পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আমি বাতাস করছি মেয়ে, তুমি খানিক বসো চুপ করে।"

শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দ্বিজেন্দ্র বলিল, "না না, করুণা করুক না, আপনি—"

হাসি চাপিয়া উৎপলা বলিল, "না বাবা, আমিই আজ না হয় একটু বাতাসই করলুম। আমার এ সব কাজ করা ঢের অভ্যাস আছে। ভাইয়ের কাজ চিরকাল বোনেই করবে, আমার কি করবার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই?"

করুণা বলিল, "বাঃ, আমি কি তাই বলছি যে চিরকাল ভাইয়ের সেবা আমিই করব? তুমি ছিলে না, কাজেই দাদার কাজ আমায় করতে হয়েছে। এখন তুমি এসেছ—তোমার কাজ তুমি কর। ছেলের কাজ মায়ে করবে না তো কে করবে বল? আমাদের দু ভাই বোনকে দেখাশোনাই তো তোমার একমাত্র কাজ, কি বল দাদা?"

দাদা কি বলিতে গিয়া দারুণ বিষম খাইল।

তিরস্কার-পূর্ণ কণ্ঠে উৎপলা বলিল, "খাওয়ার সময় কি জ্বালাতন করতে আছে মেয়ে, দেখ দেখি বেচারা বিষম খেলে। না বাবা, একটু সামলে নিয়ে একটু জল খাও, তার পর খেয়ো এখন।"

সুবোধ বালকের মতই দ্বিজেন্দ্র খানিকটা জল খাইল। উৎপলার উপদেশে মাটি হইতে তুলিয়া তিনটী ভাত খাইল। করুণার মুখখানা লাল হইয়া গিয়াছিল, সে অপর দিকে মুখখানা ফিরাইয়া উদ্যত হাসি হঠাৎ কাসির আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল।

"একটু বসো নতুন মা, দেখি বামন ঠাকরুণ এখনও পায়েস আনলে না কেন। তাকে বারবার বলে দিলুম পায়েস আগে দিয়ে যাও, তা সে—"

বলিতে বলিতে করুণা উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বিজেন্দ্রের মুখের পানে তাকাইয়া সে আর কিছুতেই হাসিকে কাসির আড়ালে রাখিতে পারিতেছিল না।

শান্ত ভাবে উৎপলা বলিল, যাও, আমি তো এখানে আছি, ততক্ষণ ছেলের সঙ্গে গল্প করি।"

করুণা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে সে যখন পায়েসের বাটী লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন দ্বিজেন্দ্র ও উৎপলা বিলাতের গল্পে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র মহা উৎসাহে সেখানকার রীতি-নীতি, চাল-চলন প্রভৃতির গল্প করিতেছে। উৎপলা দারুণ বিস্ময়ে শুনিতেছে, কখনও প্রশ্ন করিতেছে।

করুণা ভারি আরাম পাইল—তাহার দাদার বিমাতাকে তবে ঘুচিয়াছে।

সন্ধ্যার পরে যোগেন্দ্রনাথ কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিলেন। আজ একটা মোকর্দ্দমা থাকায় তিনি এগারটার অনেক আগেই হাইকোর্টে চলিয়া গিয়াছিলেন। খানিকটা বিশ্রামের পর যখন জল খাইতে বসিলেন, তখন করুণার মুখে শুনিতে পাইলেন উৎপলা আসিয়াছে।

তাঁহার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল।

বেশ ছিলেন,—তাঁহাদের পিতা, পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনও প্রাচীর ছিল না;—উৎপলা আসিয়া আবার সব ওলটপালট করিয়া দিল।

করুণা পিতার ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দাদার সঙ্গে নতুন মার বেশ আলাপ হয়ে গেছে বাবা, দাদা নতুন মায়ের সঙ্গে নিজেই ডেকে আলাপ করছেন।"

যোগেন্দ্রনাথের মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। করুণা চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "দ্বিজেন তা হলে কোন গোলমাল করে নি নতুন বউকে দেখে?"

করুণা বলিল, "করবার উদ্যোগে ছিল, আজ নাকি মাদ্রাজে পালাবার বন্দোবস্তও ঠিক করেছিল; কিন্তু সব বদলে গেছে। বিকেলে জিজ্ঞেসা করলুম, আজ যাবে না কি দাদা? দাদা বললে—দুদিন থাকি, আবার কবে আসব তার ঠিক নেই।"

যোগেন্দ্রনাথ খুসি হইয়া বলিলেন, "না, নতুন বউ মানুষটা ভাল,—লোককে সহজেই নিজের করে নিতে পারে। ওকে একবার ডেকে দে তো করুণা, জিজ্ঞাসা করি দ্বিজেনকে কেমন দেখলে?"

মনের মধ্যে যেটুকু সঙ্কোচ এত দিন ছিল, তাহা দূর হইয়া গিয়াছিল,—যোগেন্দ্রনাথের আজ আনন্দের শেষ ছিল না।

উৎপলা গৃহে প্রবেশ করিতে আনন্দে তিনি প্রায় তাহার হাত ধরিয়াই ফেলেন,—উৎপলা পিছাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

যোগেন্দ্রনাথ হাসিমুখে বলিলেন, "আমার দ্বিজেনের সঙ্গে আলাপ হল? কি রকম দেখলে তাকে বল তো?"

হাসি গোপন করিয়া উৎপলা উত্তর দিল, "বেশ ভাল ছেলে, বেশ কথাবার্ত্তা বলে, মিশুক প্রকৃতির।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সত্যি তাই। আমার ও-ছেলে বড় কম বিদ্বান নয় বুঝলে নতুন বউ, ছোটবেলা হতে ওকে যে দেখত সেই বলত ও একজন বৈজ্ঞানিক হবে বটে। ঠিক হলও তাই। এখানে ও সকলের চেয়ে ভাল ছেলে ছিল, কতবার যে বৃত্তি পেয়েছে তার ঠিক নেই। বিলেতে এই যে কয়টা বছর ছিল তাতে ও সকল বিষয়ে প্রথম হয়েছে। কি লেখায়, কি পড়ায়, ঘোড়দৌড়ে, লাফানতে, এমন কি গান বাজনায় পর্য্যন্ত সকলের প্রশংসা পেয়েছে। সেই জন্যেই তো মাদ্রাজে আগেই ওরা কাজের ঠিক করে ফেললে, ও তাতে রাজি হয়ে গেল।"

উৎপলার এত দিন বিবাহ হইয়াছে, একটা দিনের জন্য সে স্বামীর মুখে পুত্রের সম্বন্ধে একটা কথাও শুনে নাই,—বরং মনে হইত, তিনি পুত্রের নাম অতি সন্তর্পণে তাহার নিকট গোপন করিতেছেন। আজ সেই পুত্রের নামে, সেই পুত্রের প্রশংসায় পিতাকে উন্মুখ হইয়া উঠিতে দেখিয়া উৎপলা সহজেই বুঝিতে পারিল, গলদ কোথায় বাধিয়াছিল। তাহার সমস্ত অন্তরটাকে দলিয়া মথিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সবেগে বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। ধীরে ধীরে সে তাহা বাহির হইতে দিল।

সে ধীরকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এতদূর মাদ্রাজে কেন ওকে কাজে পাঠাচ্ছেন, কলকাতায় কি কাজ জুটত না?"

পুত্রের প্রতি উৎপলার এই সস্নেহ দৃষ্টিপাতে যোগেন্দ্রনাথ বড় খুসি হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওই যে বললুম—ওরা আগেই ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করে ফেলেছে। ওদের কাছে দূর আর কাছে! আমার মত ওরা তো বুড়ো হয় নি যে, এখান হতে দমদমা যেতে গেলে মাথায় বিশ মণ ওজনের ভাবনা চাপবে?"

কথাটা শেষ করিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। উৎপলা হাসিল না, মুখ গম্ভীর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হাসি থামাইয়া পার্শ্বে পতিত গড়গড়ার নলটা তুলিয়া মুখে দিয়া ধূমপান করিতে করিতে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, মাদ্রাজ আর এতদূরে কোথায়—এই তো কাছে। কাজ করুক তো, তার পর না হয় চলে আসবে। ওর কাজ করা একটা খেয়াল বই তো নয়, নইলে এই আমার বিশাল জমিদারী, এসব ও ছাড়া আর ভোগ করবে কে বল? সে সব আমি ঠিক করে রেখেছি নতুন বউ, তোমার আর করুণার যাতে কোন কষ্ট না হয়, কারও গলগ্রহ হয়ে না থাকতে হয়, সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।"

কোন্ কথা হইতে কোন্ কথা আসিয়া পড়িল দেখিয়া উৎপলা কুণ্ঠিতা হইয়া উঠিল, বলিল,—"ও-সব কথা থাক, এখন—"

যোগেন্দ্রনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "বোঝ না,

মানুষের শরীরের অবস্থা তো, কখন কি হয় তা কে বলতে পারে? ধর, হঠাৎ যদি মারা যাই, দ্বিজেন যদি তোমাদের না দেখে, কাজেই ব্যবস্থা করে রাখতে হয়।"

চঞ্চল হইয়া উঠিয়া উৎপলা বলিল, "আমার কাজ আছে, আমি যাই।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাজ থাকে তো যাও।" উৎপলা বাহির হইল।

বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বল বারাণ্ডা, উৎপলা আলো সহিতে পারিতেছিল না, আলো কয়টী নিভাইয়া দিয়া সে অন্ধকার বারাণ্ডায় চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

নিতান্ত অকারণেই তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কে কার, কেহই তো কাহারও নহে। তবে কিসের জন্য সে ইহাদেরই আপন ভাবে? যে যার সে তার চিন্তা লইয়াই আছে, তাহার অন্তরের পানে চায় কে? বুকের মধ্যে বিরাট ক্ষুধা জাগিয়া রহিয়াছে, মুখে সে ত্যাগের চরমোৎকর্ষতা দেখাইয়া যাইতেছে। নিয়ত এই অভিনয় করা—এ কি আর ভাল লাগে? এক একবার মনে হয় সে তাহার উপরের আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতরের নারীকে প্রকাশ করিয়া ফেলে,—একবার সকলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলে, "ওগো, আমি দেবী নই, আমি নারী। আমায় তোমরা তফাতে রাখিয়ো না, পূজা করিয়ো না, আমায় তোমরা তোমাদের মাঝে টানিয়া লও, তোমাদেরই একজন হইয়া থাকিতে দাও।"

(২৭)

জগদীশ চলিয়া গিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রও মাদ্রাজ রওনা হইয়া গিয়াছে। তাহার পৌঁছান সংবাদ আজও পাওয়া যায় নাই।

তাহার বিদায়ের পরদিন যোগেন্দ্রনাথ বিবর্ণ মুখে অন্তঃপুরে আসিয়া বলিলেন, "খবর কি জানিস করুণা, গুজব রটেছে—কাল যে মেলখানা মাদ্রাজ রওনা হয়েছে, সেখানা না কি মারা গেছে।"

"মারা গেছে!" করুণা বজ্রাহতার ন্যায় পিতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

যোগেন্দ্রনাথ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "আমি এখনই হাওড়ায় যাচ্ছি, খবরটা নিয়ে আসি। আমার মন বড় অস্থির হয়ে উঠছে করুণা, কি জানি কি সর্ব্বনাশ হল তা তো বুঝতে পারছি নে।"

তিনি পাগলের মতই বাহির হইয়া গেলেন। একজন আত্মীয়া বলিলেন, "যোগেনকে না যেতে দিলেই ভাল করতিস করুণা,—আর কাউকে পাঠালে ভাল হতো,—বাড়ীতে লোকের তো অতুল নেই।"

করুণা একটা উত্তর দিল না, উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য তাহার ছিল না। থাকিয়া থাকিয়া তাহার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল—এই গুজব যদি সত্য হয়—তাহা হইলে—

উঃ, সে কথা ভাবিতেও যে প্রাণ ফাটিয়া যায়। না—না, তাহা হইতে পারে না, তাহা একেবারেই অসম্ভব।

উৎপলা তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিল, "এ রকম ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে মেয়ে, তার চেয়ে এসো, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে।"

কিন্তু ঠাকুর-ঘরে গিয়া প্রণাম করিতে মাথা নোয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে করুণা কাঁদিয়া আকুল হইল,—"নতুন মা, আমার মনে হচ্ছে দাদা আর নেই, আমি যে কোন প্রার্থনা করতে পারছি নে নতুন মা।"

শিহরিয়া উঠিয়া উৎপলা বলিল, "ও অলক্ষণের কথা মুখেও এনো না করুণা। তিনি তো হাওড়ায় গেছেন, খবর পাবেন এখন কোন্ মেল নষ্ট হয়েছে। অনেক সময় মিথ্যে গুজবও রটে ত জান তো।"

করুণা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তা রটে, কিন্তু আমার মন যে বড় ভেঙ্গে পড়েছে নতুন মা, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি নে আমার দাদা বেঁচে আছে,—সে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। কাল দাদা গেছে পর্য্যন্ত আমার যে শান্তি নেই নতুন মা। কই, এই তো দাদা কত বছরের জন্যে বিলেত গিয়েছিল, সেদিন তো আমার এ রকম মন খারাপ হয় নি।"

উৎপলা তাহাকে বুঝাইবার অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু করুণা কিছুতেই বুঝিল না। অবুঝ বালিকার মত সে শুধু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উৎপলা তাহাকে ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইবার কথা

বলিল, "তুমি যখন কিছুই করবে না, শুধু কাঁদবে, তখন এখান হতে চল,—পাঁচজন মানুষের মাঝে থাকলে তবু অনেকটা অন্যমনস্ক থাকবে।"

করুণা উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিল, "না নতুন মা, বাবা ফিরে এলে তবে আমি উঠব, তার আগে উঠব না।"

অগত্যা উৎপলাও সেখানে বসিয়া রহিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল, সমস্ত বাড়ীটা যেন মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া রহিল। কাহারও মুখে একটা কথা নাই, অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশু আগমনের আশঙ্কায় সকলেই যেন সভয়ে চাহিয়া আছে।

পথ দিয়া ট্রাম মোটর চলিতেছিল, কোন খানা দাঁড়াতেই বাড়ীর সকলে ব্যগ্র হইয়া পথের পানে তাকাইতেছিল, বুঝি যোগেন্দ্রনাথ ফিরিলেন।

বেলা প্রায় এগারটার সময় যোগেন্দ্রনাথের মোটর গেটে দাঁড়াইল, করুণা ব্যগ্র হইয়া বলিল, "দেখ তো নতুন মা, বাবা বোধ হয় বাড়ী এলেন।"

বারাণ্ডা হইতে উৎপলা দেখিতে পাইল, দুই তিনজন ভদ্রলোক ধরাধরি করিয়া যোগেন্দ্রনাথকে মোটর হইতে নামাইয়া লইলেন। হাহাকার করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিতেছিলেন, "তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর সইতে পারছিনে,—আমায় খানিকটা আছাড় খেয়ে কাঁদতে দাও।"

তাঁহারা জোর করিয়া যোগেন্দ্রনাথকে লইয়া বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইলেন।

ব্যগ্রকণ্ঠে করুণা ডাকিল, "নতুন মা—?"

উৎপলা রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল, "তুমি একবার নীচে যাও করুণা, উনি বৈঠকখানায় গেলেন।"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া করুণা বাহিরে আসিল, উৎপলাকে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া সে দ্রুতপদে নীচে ছুটিল।

বৈঠকখানায় যোগেন্দ্রনাথকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তিনি ছটফট করিতেছিলেন, ভগ্নকণ্ঠে বার বার চীৎকার করিতেছিলেন, "তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, আমায় পাঁচ মিনিট ছেড়ে দাও। আমায় তোমরা ফিরিয়ে আনলে কেন? আমি দেখতে যাচ্ছিলুম কোথায় সে মহানিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে। কেন তোমরা আমায় ফিরিয়ে আনলে?"

দ্রুতপদে করুণা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—"বাবা—দাদা—"

হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে আর নেই রে করুণা, সে আর নেই। তোকে আমাকে কাঁদবার জন্যে পেছনে ফেলে রেখে সে অনন্ত স্বর্গে তার মায়ের কোলে গেছে। অভিমানী দ্বিজেন আমার—" বালকের মত মুক্তকণ্ঠে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

করুণা আড়ষ্টভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আত্মহারার মতই ছুটিয়া পিতার কোলের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, দুই হাতে তাঁহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া সে উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার মুখখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সদ্য পুত্রহারা পিতার বুকখানা যেন জুড়াইয়া গেল,—মনে হইল, তাঁহার দ্বিজেন কেবল তাঁহার একারই ছিল না, বালবিধবা করুণার যথাসর্ব্বস্ব ছিল।

"মা—করুণা—"

পিতা নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, করুণার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আজ তোর দাদা গেছে, আমার ছেলে গেছে। তোর আশা ভরসা, আমার আশা ভরসা আজ সব গেছে মা, আজ আমারও কেউ রইল না, তোরও কেউ রইল না। আমার বংশ আজ নির্ব্বংশ হয়ে গেল মা, এ বংশে আলো আর কেউ দেবে না করুণা।"

করুণা উত্তর দিল না, সে কেবল কাঁদিতে লাগিল।

পিতা বিকৃত কণ্ঠে আবার বলিলেন, "ওঠ মা করুণা, আমার দিকে তাকিয়ে তুই ওঠ। আজ তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আমি ছাড়া তোর আর কেউ নেই। ওঠ মা, আমি তোর দিকে চেয়ে চোখের জল সামলে নিলুম, তুই আমার দিকে তাকিয়ে চোখের জল সামলে নে মা।"

গৃহমধ্যে যোগেন্দ্রনাথের বন্ধুরা ব্যতীত আরও অনেকেই ছিলেন,—পিতা-কন্যার শোকে সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সকলেই চোখ মুছিতেছিলেন।

বন্ধু নরেন্দ্রনাথ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ওঠ করুণা, বুড়ো

বাপের পানে তাকিয়ে নিজেকে শোকে অবিচল কর। তোমার বাবা কিছুতেই বাড়ী আসছিলেন না, তোমার নাম করে তবে আমরা ওঁকে ফিরাতে পেরেছি। ওঠো মা, তোমার বাপের পানে চাও।"

করুণা মুখ তুলিল, পিতার কণ্ঠ ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "নিজের ঘরে চল বাবা।"

যোগেন্দ্রনাথ বদ্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন, করুণার কণ্ঠস্বর যে তিনি শুনিতে পাইয়াছেন তাহা বোধ হইল না।

করুণা তাঁহার হাতখানা ধরিয়া ডাকিল, "বাবা—"

যেন চমকিয়া উঠিয়া যোগেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "কি বলছিস মা—"

"তুমি এ রকম করলে আমি কি করে পারব বাবা—" বলিতে বলিতে করুণা আবার কাঁদিয়া উঠিল।

যোগেন্দ্রনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কই মা, আমি তো কিছুই করছি নে।"

করুণা বলিল, "হ্যাঁ করছ। ওই যে হাত দুখানা দিয়ে নিজের গলাটাকে প্রাণপণে টিপছিলে বাবা।"

যোগেন্দ্রনাথ শূন্য দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "না, আর ও-রকম করব না। তোর যে আমি ছাড়া কেউ নেই করুণা, আমি গেলে তোকে দেখবে কে? জানিস করুণা, আমি বুড়ো হয়েছি বলে বিষয়-সম্পত্তির সব ব্যবস্থা করেছিলুম। তোর আর নতুন বউয়ের আলাদা ব্যবস্থা করেছিলুম। আমার সমস্ত সম্পত্তি দিজেনের নামে রেখেছিলুম। কাল যখন সে চলে যায়, তাকে বার বার করে বলে দিয়েছিলুম, সামনের এই আষাঢ় মাসে তাকে আসতেই হবে, তার বিয়ে করতে হবে। বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নিয়ে সে সংসারী হয়ে বসবে, আমি ছুটি নিয়ে জীবনের শেষকালটা কাশীতে কাটিয়ে দেব—এই ছিল আমার মতলব। কিন্তু এ কি হল করুণা, মৃত্যু আমার সব ব্যবস্থা উল্টে দিয়ে আমার বংশগৌরব কুলপ্রদীপ ছেলে নিয়ে চলে গেল। উঃ, এ দুঃখ কি কিছুতে যাবার, এ ব্যথা আমি জুড়াব কি দিয়ে করুণা?"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথ তাঁহার একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, "চলুন, আপনাকে আপনার ঘরে দিয়ে আসি।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "চল, আমি নিজেই যাচ্ছি। ভয় নেই, আমি সামলে নিয়েছি, আর পড়ে যাব না। কিন্তু বল নরেন, এ দুঃখ আমি সইব কি করে, আমি বাঁচব কি করে? পুরাণে পড়েছি রাবণের অত ছেলে নাতি থাকতেও তাঁর শেষ সময়ে কেউ ছিল না। আমার একটী মাত্র উপযুক্ত ছেলে যে তাঁর লক্ষ ছেলের মত ছিল নরেন। রাবণ মহাপাপ করেছিল, সে সীতার চুল ধরেছিল, আমি কি মহাপাপ করেছি? আমি উৎপলাকে বিয়ে করেছি, এই পাপেই কি আমার দ্বিজেনকে হারালুম নরেন?"

হাহাকার করিয়া তিনি আছড়াইয়া পড়িলেন।

নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তাকে কি পাপ বলে? সে তো তুমি পুণ্য কাজই করেছ, এক ভদ্রলোককে কন্যাদায় হতে মুক্ত করেছ, একটী কুমারীকে আত্মহত্যার মহাপাতক হতে রক্ষা করেছ, সে তো পাপ কাজ নয় যোগেন।"

"তবে আমি কি করেছি আমায় বলে দাও। আমায় বলে দাও—আমার কি পাপে এই শাস্তি হয়েছে,—আমার উপযুক্ত পণ্ডিত ছেলে হারিয়েছি। আমার দ্বিজেন—তার মত ছেলে আর কার আছে বল দেখি? যে-দিন সে ফিরে এল সে দিন দুই হাতে আমার গলা ধরে আমার বুকের ওপর মুখখানা রেখে সে বলেছিল—বাবা, আর কোথাও যাব না, এবার হতে তোমার কাছেই থাকব। সে কি এমনি করেই তার প্রতিশ্রুতি পালন করলে নরেন?" বৃদ্ধ পিতার সে কি হাহাকার!

কোনক্রমে তাঁহাকে ধরিয়া উপরে শয়নগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। বন্ধুরা জোর করিয়াও তাঁহাকে কিছু আহার করাইতে পারিলেন না, বৈকালে আসিবেন বলিয়া তাঁহারা বিদায় লইলেন।

সে গৃহে সকলেই গেল, যাইবার অধিকার পাইল না উৎপলা। দরজার কাছে তাহাকে দেখিয়াই যোগেন্দ্রনাথ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ওকে যেতে বল করুণা, যেতে বল। ওই পাপে আমার সর্ব্বস্ব ধনকে হারালুম, ওর সর্ব্বনাশ করেছি বলেই আমার সর্ব্বনাশ হল। বুড়ো বয়সে আমি যদি এ মহাপাপ না করতুম, আমার দ্বিজেন এমন করে চলে যেত না।"

চোখের জল ফেলিয়া উৎপলা চলিয়া গেল। দূরে বসিয়া সে অজস্র চোখের জল ফেলিতে লাগিল। কেহ এই নিরপরাধিনীর পানে ফিরিয়াও চাহিল না।

(২৮)

মামার বাড়ী হইতে উর্ম্মিলা যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

কিশলয় নিজের গৃহে বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিল। উর্ম্মিলা আসিয়াই পার্শ্বস্থিত একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ বড় মলিন, মনে হয় সে খুব কাঁদিয়াছে।

হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া কিশলয় তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

উর্ম্মিলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "উঃ, মামা একেবারে পাগল হয়ে যাওয়ার মত হয়েছেন,—কেউ তাঁকে বুঝিয়ে সামলে রাখতে পারছে না। পুত্রশোক কি ভীষণ,—মানুষকে একেবারে মৃতপ্রায় করে দেয়!"

তাহার নিজের পিতামাতার কথা মনে করিয়া চোখ দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল।

মলিন হাসিয়া কিশলয় বলিল, "সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসার পাত্র সন্তানই হয় কি না। সেই জন্যে সন্তান-শোকই বাপ মায়ের বুকে বড় বেশী রকম বাজে।"

উর্ম্মিলা বলিল, "যদি মামীমা থাকতেন, তা হলেও হয় তো এমন করে মামা ভেঙ্গে পড়তেন না,—যে শোকটা তিনি একা বুক পেতে নিয়েছেন, সেটা দুজনে বইতেন। মামীমা যে ওদের ভাইবোনকে ছোট রেখে মারা গেছেন। সেই হতে মামা যে কি করে ওদের মানুষ করেছেন, তা ভগবানই জানেন। সেই ছেলে এত বড় হয়ে, দশের মধ্যে একজন হয়ে এমন অপঘাতে প্রাণ হারাল, এ দুঃখ কি যাওয়ার? যদি অসুখে ভুগে মরত, তাও যে দুদিন নাড়াচাড়া করতে পারতেন। ভাল ছেলে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, হঠাৎ শুনলেন গাড়ী লাইন হতে পড়ে যাত্রীরা মারা গেছে, তাঁর ছেলেও তাদের মধ্যে একজন।"

উর্ম্মিলা খানিক চুপ করিয়া রহিল। কিশলয় বলিল, "শুনছিলুম তিনি না কি এখান হতে চলে যাচ্ছেন?"

উর্ম্মিলা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এখানে থেকে তাঁর মন বড় খারাপ হয়ে পড়ছে দেখে তাঁর বন্ধুরা বলছেন দেশে দেশে কয়েক মাস ঘুরে আসতে। উনিও আর এখানে থাকতে রাজি হচ্ছেন না, সেই জন্যে করুণা দি ওঁকে নিয়ে যাচ্ছেন।"

কিশলয় জিজ্ঞাসা করিল, "একা করুণাদি যাচ্ছেন?"

উর্ম্মিলা বলিল, "বাড়ীর আরও কে কে যাবেন তা বলতে পারিনে। মামীমা সঙ্গে যাবেন না। মামা তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ী যাওয়ার কথা না কি বলেছিলেন। মামীমা তাতে নারাজ। তিনি বলেছেন ওই বাড়ীতেই থাকবেন।"

বিস্মিত হইয়া কিশলয় বলিল, "বাড়ীর আর সবাই যদি যেতে পায়, তবে তিনি যেতে পাবেন না কেন?"

বিষণ্ণ হইয়া উর্ম্মিলা বলিল, "মামার মনে কি এক ধারণা হয়ে গেছে—মামীমাকে বিয়ে করার জন্যেই তাঁর এই সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমি যখন মামীমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা বললুম, তখন মামা একটু হেসে বললেন, 'তুই জানিস নে উর্ম্মিলা, ওর আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি। ওর সাধ আহ্লাদ, সুখ তৃপ্তি সব ঘুচিয়েছি বলেই ভগবান আমায় এই শাস্তি দিলেন'।"

কিশলয় সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "সুখ-সাধ-আহ্লাদ তিনি ঘুচালেন কি করে? বরং গরীবের মেয়েকে রাজরাণী করেছেন এ তো মহাপুণ্য।"

উর্ম্মিলা বলিল, "সে কথা বললে শোনে কে? মামা বললেন, ওকে রাজরাণীই করেছি বটে, কেবল এই নামটা ছাড়া আর ওকে কিছুই দিই নি। ও যদিও মুখে একদিনও কৃতজ্ঞতা ছাড়া অভিযোগ জানায় নি, কিন্তু অন্তরের দীর্ঘ-শ্বাস কি করুণ আবেদনের মূর্ত্তি ধরে ভগবানের পায়ে গিয়ে পৌঁছায় নি?"

কিশলয় একখানা বই লইয়া নীরবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। উর্ম্মিলা নীরবে বসিয়া স্বামীর পানে তাকাইয়া রহিল।

"আচ্ছা আমার মামীমাকে তুমি বরাবর চিনতে?"

কিশলয় হঠাৎ চমকিয়া তাহার পানে চাহিল। কি মনে করিয়া উর্ম্মিলা এ প্রশ্ন করিল, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক পাইল না।

একটু থামিয়া সে বলিল, "হঠাৎ আজ এ কথা বলছ যে উর্ম্মিলা?"

উর্ম্মিলা বলিল, "এতদিন জানতুম না, আজ জেনেছি, তাই জিজ্ঞাসা করছি—তুমি ওঁকে বরাবর চিনতে ?"

বইয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিশলয় বলিল, "জেনেছই যদি তবে আর জিজ্ঞাসা করছ কেন উর্ম্মিলা ?"

উর্ম্মিলা অতি গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "শুনেছি তবু বিশ্বাস করতে পারছিনে। তোমার মুখ দিয়ে একবার শুনতে চাই। উনি না কি ছোটবেলা হতে তোমার কাছে পড়তেন ?"

স্থির কণ্ঠে কিশলয় উত্তর দিল, "হ্যাঁ, পড়ত।"

উর্ম্মিলা বলিল, "তবে আমি প্রথম যে দিন তোমায় ওঁর কথা বলেছিলুম, তুমি যেন আকাশ হতে পড়েছিলে,—এমন ভাব দেখিয়েছিলে, যেন ওঁর সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না,—সবে মাত্র আমার মুখে শুনছ।"

কিশলয় বলিল, "না—এটা একেবারেই মিছে কথা হল উর্ম্মিলা,—আমি কোন ভাবই দেখাই নি, যাতে প্রকাশ পায়, আমি ওঁকে চিনি বা চিনি নে।"

উর্ম্মিলার ঠোঁট দুখানা কাঁপিতে লাগিল। সে শুধু নিষ্পলকে কিশলয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। একটা কথাও আর তাহার মুখে ফুটিল না। কিশলয় হাতের বইখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া উর্ম্মিলার মুখের পানে চাহিল। বলিল, "আমি তোমার কথাবার্ত্তা বুঝতে পারছিনে উর্ম্মিলা। তবে এইটুকু বুঝেছি, তুমি এমন কিছু আজ ও-বাড়ীতে গিয়ে শুনে এসেছ, যাতে তোমার মনে দাগ কেটে দিয়েছে। আমি আশা করছি, তুমি অসঙ্কোচে সে সব কথা আমায় বলবে। জেনো, তোমার মনের অন্ধ ধারণা দূর করতে এক মাত্র আমিই সক্ষম হব, আর কেউ পারবে না।"

উর্ম্মিলার চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ও-বাড়ীর মামীমা বলছিলেন, তোমার সঙ্গে না কি মামীমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তোমরা দুইজনে না কি দুইজনকে খুব ভালবাসতে। তাই শুনে—"

সে থামিয়া গেল, ঝুঁকিয়া পড়িয়া কিশলয়ের কোলের মধ্যে মুখ লুকাইল।

কিশলয় তাহার মাথার উপর হাতখানা রাখিয়া বলিল, "তাই শুনে তোমার মনে আঘাত লেগেছে, কেমন ?"

উর্ম্মিলা মুখ তুলিল, "হ্যাঁ, লেগেছে। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আজও মামীমাকে তেমনই ভালবাস। সে ভালবাসা তোমার মন হতে মুছে যায় নি। জানিনে মামীমা আজও তোমায় তেমনই ভালবাসে কি না। সে কথা জানবার দরকারও আমার নেই।"

কিশলয় খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমি যে আজও তাকে ভালবাসি, তা তুমি কি করে বুঝলে উর্ম্মিলা ?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে উর্ম্মিলা বলিল, "তোমার মনের ভাব কি তুমি লুকিয়ে রাখতে পেরেছ ? তোমার মনের ভাব কি তোমার মুখে চোখে ফুটে ওঠে নি ? আমি প্রথম দেখলুম, অনেক দিন আগে এ বাড়ীতে সেই বিয়ের সময় তুমি কি রকম আত্মহারা ভাবে মামীমার পানে চেয়েছিলে। হঠাৎ মামীমার দৃষ্টি যখন তোমারও পরে পড়ল, তখন মামীমার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টেনে দিলেন। তুমিও সে জায়গা ছেড়ে দূরে চলে গেলে। আর কেউ দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছিলুম। তুমি জানো না, সেই দিন হতে এই ব্যাপারটা জানবার ইচ্ছা আমার বিশেষ ভাবেই হয়েছিল, কিন্তু পারিনি। কতবার তোমার সামনে মামীমার কথা তুলেছি, তুমি এমন ভাব দেখিয়েছ যেন কিছুই জানো না। তোমায় জিজ্ঞাসা করতে কতবার এগিয়ে গেছি, আবার পেছিয়ে এসেছি,—মনে ভেবেছি,যদিই কোনও রহস্য এর মধ্যে থাকে, সে চাপাই থাক,—তাকে বার করে আমার মন খারাপ করব না।"

কিশলয় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু আজ সেই রহস্য তোমার সামনে স্বয়ং প্রকাশ হয়ে পড়েছে উর্ম্মিলা। আমি বেশ বুঝছি, তবু তুমি বিশ্বাস করতে পারনি, সেই জন্যেই আমার কাছে ছুটে এসেছ। হ্যাঁ, আমিও মিছে কথা বলব না উর্ম্মিলা, তোমার কাছে আমি সত্য কথাই বলব।"

উর্ম্মিলা রুদ্ধশ্বাসে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

কিশলয় বলিল, "আজ তোমাকে আমি ঠিক বলতে পারব না উর্ম্মিলা, উৎপলাকে আমি কতখানি ভালবাসতুম। আমি জানতুম সেও আমাকে তেমনই ভালবাসে। আমার মায়ের খুব ঝোঁক ছিল যাতে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু আমার বাবা, পিসিমা ও অন্য আত্মীয়েরা কেউ রাজি হলেন না। উৎপলার অতুল্য রূপকে তাঁরা ভালবাসতেন; কিন্তু সে যে গরীবের মেয়ে ছিল, কেবল সেই জন্যেই উৎপলার সঙ্গে আমার মিলন হল না।"

সে খানিক চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "বিয়ের পরে আমার মনের গতি বিন্দুমাত্র বদলায় নি, কিন্তু তার যে সত্য পরিবর্ত্তন ঘটেছে এ কথা আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব। কেউ জানে না, শুধু উৎপলা জানে আর আমি জানি—এই কিছু দিন আগে সে যখন বাপের বাড়ী গিয়েছিল, তখন তার কাছে আমার সেই পুরান ভালবাসার কথা তুলতে গিয়ে আমি কি রকম অপমানিত হয়েছি। বিশ্বাস করবে কি উর্ম্মিলা, সে আমায় কুকুরের মত তার ঘর হতে তাড়িয়ে দিয়েছিল ?"

"তাড়িয়ে দিয়েছিল তোমায়-"

পুচ্ছবিমর্দ্দিত সর্পিনীর ন্যায় উর্ম্মিলা গর্জ্জিয়া উঠিল,—তাহার স্বামীকে অপমান ?

শান্ত হাসিয়া কিশলয় বলিল, "না, এতে তুমি রাগ করতে পার না উর্ম্মিলা, মনে কর—সেই অন্ধকার রাত, বৃষ্টি পড়ছে, বাড়ীতে সে ছাড়া আর কেউ নেই, চীৎকার করলেও কেউ আসবে না, সেই সময়ে আমি তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম।"

"তুমি—তুমি একাকিনী স্ত্রীলোকের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে—?" বিস্ময়ে আত্মহারা উর্ম্মিলা স্বামীর পানে চাহিল।

কিশলয় বলিল, "হ্যাঁ আমিই, আর কেউ নয় উর্ম্মিলা। তোমার এই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব স্বামীর তখন এই দুর্ম্মতিই ঘটেছিল। আমি যখন আমার ভালবাসার কথা বলতে লাগলুম, সে তখন রাগে ফুলছিল ; তার পর সোজা আমায় চলে যেতে পথ দেখিয়ে দিলে। আমার ভিতরের পশু প্রবৃত্তি তখন তাকেই পেতে চাচ্ছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল, একবার তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে দুই হাতের নখে তার বুকখানা চিরে ফেলে দেখি সেখানে কি আছে। হয় তো দুই পা অগ্রসরও হয়েছিলুম, কিন্তু নরপশুর ক্ষমতা কি সতী নারীর কাছে যাওয়ার ? তার তেজ আমার বুকের মাঝখান পর্য্যন্ত ঝলসে দিলে, আমি ছুটে পালিয়ে গেলুম।"

কিশলয় চুপ করিয়া রহিল।

উর্ম্মিলা একটি কথাও বলিতে পারিতেছিল না। স্বামীর সুন্দর মুখের পানে তাকাইয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিল—সত্যই তাহার স্বামীর অন্তর এত নীচ, এত ঘৃণিত ?

কিশলয় বলিল, "সেই দিন হতে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি উর্ম্মিলা। তবু বলতে পারব না, আমি তাকে ভালবাসিনে। আজও—এখনও আমি তাকে ভালবাসি, তেমনই ভালবাসি। তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাকে পেতে চাই না। বরং তার কাছ হতে অনেক দূরে সরে থাকতে চাই। আমি তাকে আমার কামনা বাসনার বাইরের মানুষ বলে জেনেছি। আমি তাকে দেবীর মত পূজাই করে যাব, তার কাছে যাব না, এই আমার একমাত্র প্রতিজ্ঞা। তোমার কাছে সবই তো বললুম উর্ম্মিলা, এখন তোমার যদি ইচ্ছা হয়, যদি প্রবৃত্তি হয়, তোমার এই নরপিশাচ স্বামীকে তুমি ক্ষমা করতে পার। আর তা যদি না হয়—"

হাঁপাইয়া উঠিয়া উর্ম্মিলা বলিল, "না—না, তুমি যাই হও, তুমি আমার দেবতা, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তোমায় আমি অবিশ্বাস করব না, করতে পারব না।"

সে কিশলয়ের কোলের উপর নত হইয়া পড়িল। কিশলয় নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

(২৯)

বিরাট প্রাসাদ, কয়েকজন চলিয়া গেলেও আর সবাই আছে, তবু মনে হয় উৎপলা বড় একা, সে হাঁফাইয়া উঠিয়াছে।

সকাল আসে, আস্তে আস্তে গত হয় ; দুপুর আসে যায়, সন্ধ্যা আস্তে গত হয়। আগেকার মতই দিন যায় রাত আসে, আবার রাত যায় দিন আসে ; তবু উৎপলার মনে হয় দিন কাটিতেছে না।

সামনে কোনও আশা নাই যে কোনক্রমে এ দিনগুলা কাটাইয়া দিয়া সে সেই দিনের প্রত্যাশায় থাকিবে। সব অন্ধকার,—ভবিষ্যতে আলোর লেশমাত্র নাই, বর্ত্তমান দারুণ জ্বালাপ্রদ।

সান্ত্বনার আশায় সে অতীতের পানে চায়। এই অতীতই এ পর্য্যন্ত তাহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল, কিন্তু হায় রে, আজ অতীতের পানে চাহিয়া সে যে শিহরিয়া উঠে ! একটা অন্ধকারময়ী সন্ধ্যা তাহার সমস্ত জীবনটার

উপরে কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিয়া গিয়াছে। আলোর আশা বাতুলতা মাত্র। এ অন্ধকার দূর করিতে তাহার ক্ষীণ বাহু অসমর্থ। সে জীবনে আর আলো পাইবে না।

"বাবা—"

হাহাকার করিয়া উৎপলা কাঁদিয়া উঠে। সে আর ভগবানকে ডাকে না, ইচ্ছা করিয়াই ডাকিতে ভুলিয়া যায়। কি হইবে ভগবানকে ডাকিয়া? ভগবান তাহাকে কি দিয়াছেন? তাহার সৌন্দর্য্যের জন্য সে ভগবানের কাছে এতটুকু ঋণী নয়, বরং এই সৌন্দর্য্যের জন্য তাহাকে অপরাধী করে ভগবান তাহার বর্ত্তমান জ্বালাপ্রদ করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ তমোময় করিয়াছেন, অতীতের যে দিনগুলার স্মৃতি লইয়া সে তবু ভুলিয়া থাকিত, সে তবু বাঁচিয়া থাকিত, সে স্মৃতি কলঙ্কমসীলিপ্ত করিয়াছেন। তবে সে আর ডাকিবে কেন?

নিজের ঘরেই সে বন্দিনী হইয়াছে। আজ আত্মীয়-আত্মীয়া, এমন কি দাসদাসীদের কাছে পর্য্যন্ত তাহার মুখ দেখাইতে দারুণ লজ্জা বোধ হয়। সে মনে করে সকলেই তাহাকে অলক্ষণা বলিয়া জানিয়াছে, সকলেই সতর্ক হইয়াছে যেন সে কাহারও সংস্পর্শে না যায়। অথচ সকলেই কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া আছে।

যাত্রার সকল আয়োজন হইয়া গেলে করুণা মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল, "বাবা, নতুন মাকে এখানে একা রেখে যাওয়া তোমার উচিত হবে না। যখন তুমি ধর্ম্মসাক্ষী করে ওর ভার নিয়েছ, তখন শেষ পর্য্যন্ত তোমায় কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হবেই। ও কি দোষ করেছে, যার জন্যে একা ওকে ফেলে যাচ্ছ?"

মর্ম্মপীড়িত কণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "দোষ ওর নয় রে, দোষ আমার। সেই জন্যেই ওকে আমার কাছে আমি চাইনে। ওকে আমি সইতে পারব না করুণা, আমি ওকে দেখতে পারব না। তুই আমায় আর যা বলবি বল করুণা, কেবল ওর কথা আমায় বলিস নে।"

করুণা আর একটী কথাও বলিতে পারে নাই। যাত্রার পূর্ব্বে উৎপলার গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কান্নাভরা স্বরে বলিয়াছিল, "অভাগিনী, কেবল অতুল্য রূপই এনেছিলে, সুন্দর অদৃষ্ট আনতে পার নি? যা পেয়েছিলে তা হয় তো আশার উপযুক্ত নয়, তা হলেও— তাও রাখতে পারলে না, একে একে সবই হারাতে বসলে? তোমায় আর কি বলব, সত্যি তোমার দুঃখে আমার বুকটা আরও ভেঙ্গে যাচ্ছে। জানি—প্রার্থনা করার শক্তি তোমার আর নেই, তবু তোমায় বলছি, যদি কোন দিন প্রার্থনা করো, তবে এই প্রার্থনাই করো, যেন বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে তুমি সরে যেতে পার,—আমার মত করে মাসে দুটো করে একাদশী না করতে হয়।"

আজ নির্জ্জনে সেই কথাগুলাই মনে পড়ে। করুণার পত্র আজ কয়দিন হইল আসিয়াছে। তাঁহারা আগে পুরী গিয়াছেন। করুণা লিখিয়াছে পিতার শরীর মোটেই ভাল নয়। তিনি যেন আরও জড় হইয়া পড়িতেছেন। জগন্নাথ দেখিয়া তাঁহার মন আরও খারাপ হইয়াছে। ইহার চেয়ে কলিকাতায় পাঁচজনের মাঝখানে থাকিয়া তিনি বরং ভাল ছিলেন।

উৎপলা ভাবে, কি জানি কি হইবে। সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, সত্যই কি তাহাকে করুণার মত মাসে দুইটা করিয়া একাদশী করিতে হইবে? সে দিন আসিবার পূর্ব্বে চলিয়া যাওয়া যায় না?

কিন্তু কই, এত লোক মরিতেছে, তাহার মৃত্যু তো আসে না। বাড়ীর থাকমণি দাসীটা পর্য্যন্ত মাত্র তিন দিনের জ্বরে এই তো সেদিন মারা গেল। দাসীর কি শুভাদৃষ্ট,—উৎপলা হিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছিল। সামনের বাড়ীর বউটি কয়েক দিন আগে হঠাৎ মারা গেল। এত বড় বড় ডাক্তার আসিল, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। এত লোক মরিতেছে, মৃত্যু উৎপলাকে স্পর্শ করিতেই কি ভয় পাইল?

কথামালার সেই গল্পটী মনে পড়িল। হয় তো সে আন্তরিক ব্যগ্রতার সহিত মৃত্যুকে ডাকিতেছে না। মৃত্যু আসিলে আবার বাঁচার জন্য তীব্র কামনা মনে জাগিবে।

উৎপলা মনকে অনেক করিয়া পরীক্ষা করিল, না, সত্যই সে মরিতে চায়, সে বাঁচিতে চায় না।

আশ্চর্য্য, যে মৃত্যুকে চায়, মৃত্যু তাহাকে চায় না। দাসী থাকমণি মৃত্যুকে চায় নাই, কিন্তু মৃত্যু তাহাকে চাহিয়াছিল,—তাহার তিনটী সন্তানকে যে নিরাশ্রয় করিতে হইবে! ও-বাড়ীর বউটি মরিতে চায় নাই, কিন্তু মৃত্যুর তাহাকে চাই-ই,—তাহার সাজানো সংসার যে শ্মশান করিতে হইবে। উৎপলা গেলে কাহারও এতটুকু ক্ষতি হইবে না। বৃদ্ধ পিতা

মরণাপন্ন, আছেন কি না ঠিক নাই। যদিও থাকেন, তিনি কেবল দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিবেন। সংসারে কাহারও এতটুকু ক্ষতি হইবে না, আর কেহ পিছনে কাঁদিতে থাকিবে না। উৎপলা আত্মহত্যা করিবে কি?

কিন্তু আত্মহত্যা যে মহাপাপ। কোন্ জন্মের পাপে তাহাকে এ জন্মে এই বুকভরা ব্যর্থতা বহিতে হইতেছে, কাঁদিয়া দিন যাইতেছে। আবার এ জন্মে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া তাহার জন্য কত জন্ম কাঁদিবে, কত জন্ম তাহার ফলভোগ করিবে?

উৎপলা সাহসে বুক বাঁধিল—না, সে আত্মহত্যা করিবে না, সে কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবে না, সে চরম পর্য্যন্ত দেখিবে, সে দেখাইবে সে মানুষ।

উৎপলা মন বাঁধিয়া আবার সংসারের মধ্যে নামিল।

করুণা সংসারের কর্ত্রীরূপে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিল। সকলকে আদেশ দিয়া গিয়াছিল যেন তাহারা উৎপলার আদেশ মানিয়া চলে, উৎপলার ব্যবস্থামত সংসার চলিবে।

গৃহিণী মাসীমা উৎপলার দরজার কাছে আসিয়া অনেকবার ঘুরিয়া গিয়াছেন, উৎপলার গৃহের দ্বার রুদ্ধ। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছেন, "আমি কিছু জানিনে মাসীমা, আপনাদের যা ইচ্ছে তাই করুন গিয়ে।"

আজ পনের কুড়ি দিন পরে উৎপলা যখন সকলের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া তাহার পানে তাকাইল।

উৎপলা দেখিল এই পনের কুড়ি দিনে সংসারের কতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। কোনও রকমে আগের অনুকরণে সংসার চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে যেন প্রাণ নাই, কাজেই উৎসাহ নাই। সে দেখিল রমা দাসী সম্পর্কীয়া পিসীমাকে এমন দুই কথা শুনাইয়া দিল যে পিসীমা মুখ নত করিলেন, কিন্তু রমার অপরাধের কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না; কেন না, রমা মাসীমার দাসী, মাসীমার সংসারের সম্রাজ্ঞী।

উৎপলার মাথার মধ্যে দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে তখনই রমাকে ডাকাইয়া তাহাকে জবাব দিল। আদেশ দিল—"তোমার যে কয় মাসের মাইনে বাকি আছে, আমি ম্যানেজার বাবুকে জানিয়ে দিচ্ছি, ওখান হতে গিয়ে চলে যাও।"

উৎপলার আদেশের বিরুদ্ধে কাহারও কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। রমা চোখ মুছিতে মুছিতে বেতন মিটাইয়া লইয়া বিদায় লইল।

করুণা ও যোগেন্দ্রনাথ বাড়ী থাকিতে বাড়ীর ছেলেরা চোরের মত থাকিত। সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ীর মধ্যে গোলমাল শুনিয়া উৎপলা খোঁজ লইয়া জানিল, বিন্দু দিদির ছেলে সুরেশ্বর মাতাল হইয়া বাড়ী আসিয়া নিজের স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে, তাহার মা ও অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

উৎপলার মহাল হইতে এ মহালটী দূরে হইলেও বারাণ্ডায় রেলিংয়ে ঝুঁকিয়া পড়িলে দেখা যায়। উৎপলা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল নিরপরাধী বালিকা বউটি মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, মা পুত্রকে জোর করিয়া গৃহে টানিয়া লইয়া গেলেন, পুত্র সেখান হইতেও যে সব অকথ্য ভাষা উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা শ্রবণের অযোগ্য।

উৎপলা আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তবু এখনও যোগেন্দ্রনাথ জীবিত আছেন, এখনও করুণা জীবিতা আছে। এখনই বাড়ীতে এ কি কাণ্ড ঘটিতে লাগিল!

পরদিন প্রভাতে সে সরাসর নামিয়া আত্মীয়দের মহলে গিয়া উপস্থিত হইল। সুরেশ্বর তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তাহাকে সম্মুখে ডাকিয়া উৎপলা জানাইয়া দিল—আজই তাহাকে এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে,—মাতাল দুশ্চরিত্র লোককে সে এক মুহূর্ত্ত এ বাড়ীতে স্থান দিবে না।

সুরেশ্বরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। উৎপলা কোনও দিনই এ মহলে আসে নাই, আত্মীয় পুরুষ কাহারও সামনে বার হয় নাই। আজও সে নিজের মুখে আদেশ জানাইয়া গেল না, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার আদেশ একজন অন্তঃপুরিকার মুখ দিয়া শুনা গেল।

নিজের মহালে ফিরিয়া সে যখন মুখ ধুইতে স্নানাগারের দিকে যাইতেছিল, সেই সময় বিন্দুদিদি আসিয়া ধরিলেন, "দুধের ছেলে বউ, না বুঝে একটা অপরাধ করে ফেলেছে, তার কি ক্ষমা নেই? ও কোন দিন ও সব ছাই-ভস্ম খায় নি। কাল না কি বন্ধুরা জোর করে ওই ছাই খাইয়েছে, তাতেই না এই বিতিকিচ্ছি কাণ্ডটা ঘটে

গেল। তাই বলে—একটা দোষের কাজ করেছে বলেই ওকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বললে, এ কি ভাল হল? দুধের ছেলে,—ও কি কোন দিন কোথাও গেছে, যে আজ চলে যেতে বললেই চলে যাবে?"

অত্যন্ত কঠিন মুখেই উৎপলা বলিল, "আমি কোনও কথা শুনতে চাই নে ঠাকুরঝি, অনেক কথাই এ পর্য্যন্ত শুনেছি। তোমার ছেলে কালই শুধু মদ খায়নি, আমি প্রমাণ পেয়েছি সে রোজই মদ খেয়ে অনেক রাতে বাড়ী আসে। তোমার ভাই, ভাইঝি বাড়ী থাকতে মাত্রা কম হোত বলেই কেলেঙ্কারীটা হয় নি। ওঁরা চলে যেতে রোজই এ রকম কেলেঙ্কারী চলছে। বউটি তো রোজই মার খায়, তুমি কয়দিন সুপুত্রের হাতের সেবা নিয়েছ বল দেখি? ধিক তোমায়, ওই ছেলের হয়ে তবু আমার কাছে বলতে এসেছ। যদি মায়ের মত মা হতে তবে ছেলে যাতে সৎপথে ফেরে তারই চেষ্টা করতে—ওকে আরও অধঃপাতে দিতে না।"

সে দ্রুত চলিয়া গেল।

বিন্দু দিদি মামীমার কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, "উঃ, তেজ দেখেছ মামী, ছোটলোকের বেটির তেজ দেখেছ একবার? হাভাতের ঘরের মেয়ে, দুবেলা ভাত জুটত না, তার একবার রাণী হয়ে হুকুম চালানটা শোন।"

মামীমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর বল কেন মা, হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেল। করুণা থাকতে থাকত যেন চোরের মতন। সে পেছন ফিরতে না ফিরতে নিজের মূর্ত্তি ধরেছে। যা বলেছ মা, ছোট লোক হাভাতের ঘরের মেয়ে, লোক-লৌকিকতা ও আর জানবে কি?"

বিন্দু দিদি ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, "বলি, আমার তো কিছু অজানা নেই। উনি যে এত সতী ধার্ম্মিকত্ব ফলাচ্ছেন, ওঁর কোন কথা না আমি জানি? বললে যে একখানা মহাভারত হয়ে যায়। ওরে আমার সাবিত্রী রে, অমন সতী ঢের দেখেছি। দাদাকে আজই একখানা পত্র দেব, তাতে সব লিখে দেব, যা থাকে আমার কপালে।"

কিন্তু সে পত্র লেখা হইল না; সুরেশ্বরকে বাড়ী হইতে বাহির হইতেই হইল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সেফালি

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

বিদায় পথের যাত্রী হ'লাম নিভ্‌লে রাতের দীপালি,
পিছন হ'তে অমন ক'রে ডাক্‌লি কেন সেফালি?
উৎসবাদি—ফুরিয়ে গেছে ম্লান হয়েছে জোছনা,
দিগ্বলয়ে কুণ্ডলিত দিন ফুরানোর শোচনা।
হিমেল হাওয়া বইতে সুরু, ঘাড় গুঁজে রয় মরালী,
বিসর্জ্জনের বাজনা বাজে নৃত্য করে করালী।
ছাতিম ফুটার দিন গিয়েছে থল-কমল আর ফুটে না,
মনে বনে কোথাও অলি মৌমাছিরা জুটে না।
এই ত বিদায় নেওয়ার লগন পিছন হ'তে সেফালি,
ডাক্‌লি কেন? আবার আমায় হেথায় কেন ফেরালি?
ডাক না শুনে চল্‌ব সোজা কোথায় বা সে ক্ষমতা?
বিদায় নিলাম, বিদায় আমায় কই দিল হায় মমতা?
সেফালি, তোর আয়ু-শেষের পাণ্ডুতা যে বয়ানে,
দীন চাহনি ঝল্‌ছে যে তোর অশ্রু ভরা নয়ানে।
অমর ক'রে রাখব যে তোর বিদায়-বাণীর সুরভি,
ছন্দে আমার কই শকতি? গাইব কিসে পূরবী?
মিছামিছি ডাক্‌লি আমায় হায়রে কেবল কাঁদাতে,
যাত্রাভঙ্গ করলি আমার পিছন-ডাকা বাধাতে।
কুন্দকলি মুখ তোলে অই, ঘাড় নাড়ে বন্‌বেতসী,
আমার যাওয়া হয় না বুঝি দিচ্ছে উঁকি অতসী।

প্রবাসের পত্র—চম্পারাজ্য

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস, পি এইচ-ডি

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও উপকূলে প্রাচীন হিন্দুরা (১) যে সমুদয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, চম্পা,—বর্ত্তমান আনাম দেশের মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ—তাহাদের অন্যতম। এই অঞ্চলে প্রাচীন হিন্দু আমলের শিলালেখ প্রভৃতি যে সমুদয় নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীনতম—বোচান শিলালিপি—এই হিন্দু চম্পারাজ্যের প্রতিষ্ঠাজ্ঞাপক। অক্ষর দৃষ্টে অনুমান হয় যে, ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই যে এই দেশে হিন্দুগণের প্রভাব বদ্ধমূল হইতেছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দুস্তর জলধি অতিক্রম করিয়া আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ যে দেশে হিন্দু রাজশক্তি, ধর্ম্ম ও সভ্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে দেশের কথা শুনিতে এবং সে দেশ প্রত্যক্ষ করিতে স্বভাবতঃই মনে কৌতূহল জন্মে। গত দুই তিন বৎসর যাবৎ এই দেশের সম্বন্ধে অনেক অধ্যয়ন করিয়াছি এবং একখানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থও এ সম্বন্ধে লিখিয়াছি; কিন্তু আমাদের অসমসাহসী পিতামহগণের চরণরজঃপূত এই পুণ্যভূমি প্রত্যক্ষ দেখিবার সুযোগ এই প্রথম ঘটিল। তাঁহারা যে প্রদেশের নাম রাখিয়াছিলেন

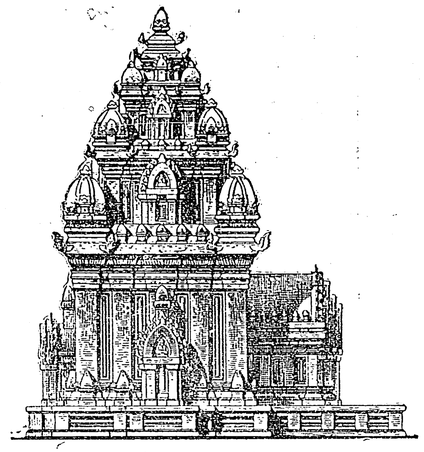

পাণ্ডুরঙ্গের মন্দির

'পাণ্ডুরঙ্গভূমি'—এখনও বর্ত্তমান 'ফানরঙ্গ' নাম যাহার স্মৃতি বহন করিতেছে—সেইখানে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত

সাইগণের দৃশ্য (১)

(১) এই প্রবন্ধে হিন্দু শব্দ ধর্ম্মবাচক নহে, কেবল জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ উভয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীন শিবমন্দিরের পাদমূলে বসিয়া আমার স্বদেশবাসিগণের উদ্দেশে এই প্রবাসের পত্র লিখিতেছি।

৫ই নভেম্বর প্রাতঃকালে জাহাজে সাইগণ পৌঁছিলাম।

সাইগণ ফরাসী কোচিন-চায়নার রাজধানী, হাল ফ্যাসানের সহর—'প্রাচ্যদেশের প্যারিস' নামে অভিহিত। এখানে প্যারিসের অনুকরণে বড় বড় বুলভাড় অথবা বৃক্ষশ্রেণী-

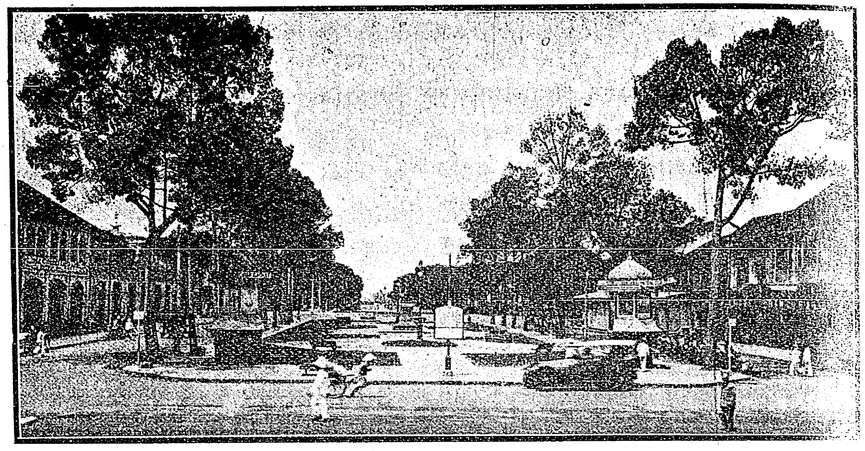

সাইগণের দৃশ্য (২)

পরিশোভিত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম আছে—হোটেল ডি ভিল (Hotel De Ville), ক্যাসিনো (Casino), কাফে (Cafe) প্রভৃতি সবই আছে। এক কথায় প্যারিসের বিলাসিতা অনুকরণের চেষ্টা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সাইগণ প্রাচীন চম্পা ও কাম্বোজ রাজ্যের মধ্যস্থলে। ইহার পূর্ব্বে চম্পা রাজ্য এবং পশ্চিমে কাম্বোজ রাজ্য। বর্ত্তমান কালে এই সাইগণ সহরই এই দুই রাজ্যের প্রবেশদ্বার।

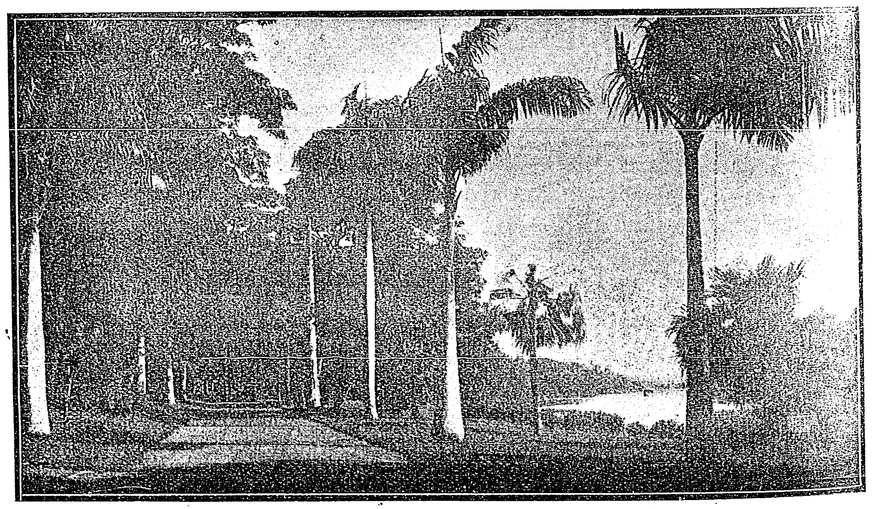

সাইগণের দৃশ্য (৩)

আমার প্রথম গন্তব্য স্থান ছিল চম্পারাজ্যে—হিন্দুগণের প্রথম উপনিবেশে। ইহার প্রাচীন নাম কৌঠার দেশ,

বর্ত্তমান নাম না-ট্রাং। এইখানেই বোচান শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে এবং এইখানেই সেই বিখ্যাত পো-নগরের মন্দির—যাহার দুর্গা অথবা ভবানীমূর্ত্তি চম্পারাজ্যের ইষ্টদেবী-রূপে পূজিতা হইতেন।

সাইগণ হইতে না-ট্রাং পর্য্যন্ত রেলে যাওয়া যায়। সকাল ৭টায় ট্রেন ছাড়ে। আমি সকাল ছয়টায় হোটেল হইতে জিনিষপত্র সহ এক রিক্‌সতে চড়িয়া ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। কিন্তু প্রথমেই এক বিভ্রাট ঘটিল। রিক্‌সতে উঠিয়াই আমি বলিলাম 'গার',—ফরাসী-ভাষায় ষ্টেশনের নাম—রিকসওয়ালাও ছুটিল। আমার ধারণা ছিল ষ্টেশন কাছেই, কিন্তু ১০।১৫ মিনিট চলিয়াও ষ্টেশনের দেখা নাই। আমার প্রশ্নের উত্তরে রিক্‌সওয়ালা কেবল মাথা নাড়ে। রাস্তায় যাহার দেখা পাই জিজ্ঞাসা করি,—অনেকেই আমার কথা বুঝেনা—দুই একজন সম্মতিসূচক মাথা নাড়ার ইঙ্গিতে জানায় যে ঠিক পথেই যাইতেছি। ক্রমে আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার যায়। রিক্‌স ছুটিয়াছে, —সহর পার হইয়া একটা গণ্ডগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। আমি মাঝে মাঝে দুই একজনকে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইনা। অবশেষে সাতটা বাজিতে যখন মাত্র ৪।৫ মিনিট বাকী তখন একটি লোক আমার প্রশ্নের উত্তরে রিক্‌সওয়ালাকে কি বলিল। ঠিক সাতটার সময় একখানা ছোট চালাঘরে পৌঁছিলাম। এটা ষ্টেশন বটে, কিন্তু সাইগণ ষ্টেশন নহে। সেখানকায় দুই একজন লোকের সহিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে আলাপ করিয়া জানিলাম যে, এটি সাইগণ হইতে না-

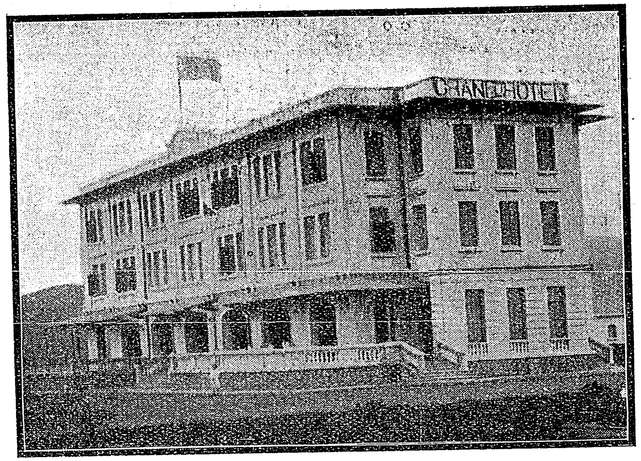

না-ট্রাং—সমুদ্র-তীরবর্ত্তী গ্রাণ্ড হোটেল

ট্রাঙ্গের পথে সাইগণের পরে দ্বিতীয় ষ্টেশন, কিন্তু না-ট্রাং যাইবার গাড়ী এখানে থামেনা। মূর্খ রিক্‌সওয়ালা সাইগণ ষ্টেশনে না যাইয়া একঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ৪।৫ মাইল দূরের এই ক্ষুদ্র ষ্টেশনে আনিয়া পৌঁছাইয়াছে। অথচ হোটেল হইতে সাইগণ ষ্টেশন মাত্র ৭।৮ মিনিটের পথ। আমি তাহাকে ষ্টেশনে যাইতে বলিয়াছি, সে ষ্টেশনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। ৭টা বাজিয়াছে, এই সময়েই সাইগণ হইতে আমার গাড়ী ছাড়ার কথা; সুতরাং সেই দিন না-ট্রাং যাওয়ার আশা পরিত্যাগ করিলাম। প্রথমেই এই বিভ্রাট ঘটায় মনটা বড়ই দমিয়া গেল। কিন্তু ঐ মূর্খের রিক্‌সতে ফিরিয়া যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। শুনিলাম তখনই একটা গাড়ী আসিবে তাহাতে সাইগণ যাওয়া যায়। আমি তৎক্ষণাৎ টিকিট কিনিতে গেলাম। ইতিমধ্যে গাড়ী

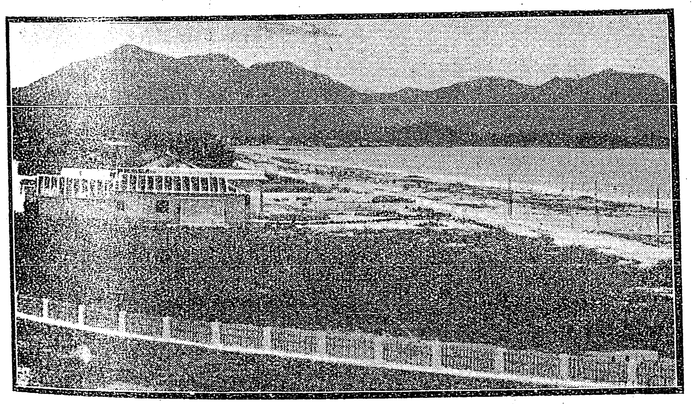

না-ট্রাং—সাধারণ দৃশ্য

আসিয়া উপস্থিত হইল ; আমি কোনমতে জিনিষপত্র নিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। উপস্থিত দুই একজন লোক যাহারা আমার কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাঁহারাও সাহায্য করিলেন। ৭।৮মিনিটের মধ্যেই সাইগণ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখন উঁহাদেরই একজন আমাকে দেখাইয়া দিলেন যে,

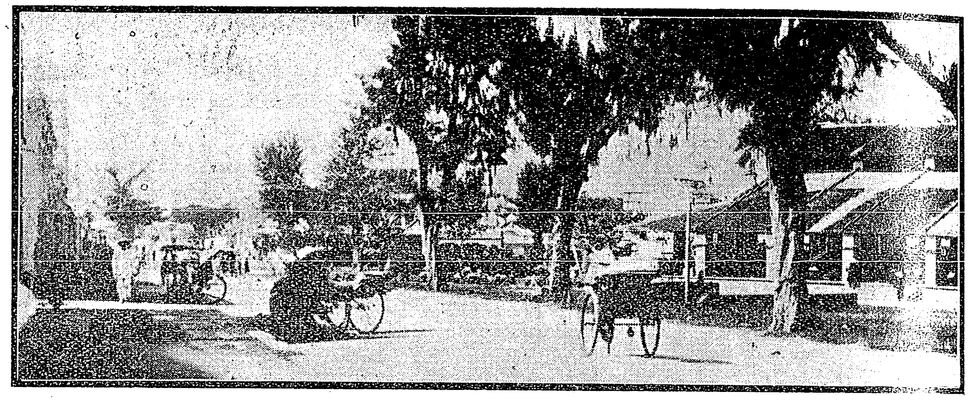

না-ট্রাং—সহর মধ্যস্থ রাজপথ ও রিক্স

না-ট্রাং যাওয়ার গাড়ী তখনও ছাড়ে নাই—ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে। শেষে বুঝিলাম যে মাত্র একটি লাইন, সুতরাং উল্টাদিকের গাড়ী আসিয়া না পৌঁছায় ঐ গাড়ী ছাড়ে নাই। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে কুলির মাথায় মোট চাপাইয়া দৌড়াইয়া ঐ গাড়ীতে উঠিলাম,অমনি গাড়ী ছাড়িয়া দিল ; টিকিট কিনিবার আর সময় হইল না। ভগবানের অপূর্ব্ব বিধান! অসম্ভব বলিয়া যাহার আশা একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাও সম্ভব হইল।

সন্ধ্যার পর না-ট্রাং পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে। এখানকার হোটেলটি বেশ বড়। ঘরে পৌঁছিয়াই বুঝিতে পারিলাম ইহা সমুদ্রের একেবারে ধারে। কারণ যদিও অন্ধকারে বাহিরের কিছুই দেখা যাইতেছিল না, তথাপি চির-পরিচিত তরঙ্গ-গর্জ্জন ও শীতল সমীরণ সমুদ্রের নিকট-অস্তিত্ব বিশিষ্ট ভাবেই জ্ঞাপন করিতেছিল। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে হঠাৎ চাহিয়া দেখি অপরূপ দৃশ্য। সম্মুখে অসীম অনন্ত সমুদ্র, মাঝে মাঝে ছোট বড় পাহাড়ের টুকরা —যেন পাতালবাসী বিশালকায় নাগ ও ক্ষীণ-মধ্যমা নাগকন্যাগণ মাথা তুলিয়া সূর্য্যকিরণ উপভোগ করিতেছে। ডাইনে বাঁয়ে পশ্চাতে পাহাড়ের শ্রেণী। ডাইনে ও বাঁয়ের পাহাড়-শ্রেণী অনেকটা দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। এই অর্দ্ধ-বৃত্তাকার গিরিমালা ও শৈলকূট-পরিশোভিত সাগরে বেষ্টিত সমতল প্রান্তর। ইহার উত্তর অংশে পাহাড়ের পাদ-দেশে সংকাউ নামে একটি নদী আসিয়া সাগরে মিশিয়াছে। এই নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থলে না-ট্রাং সহর।

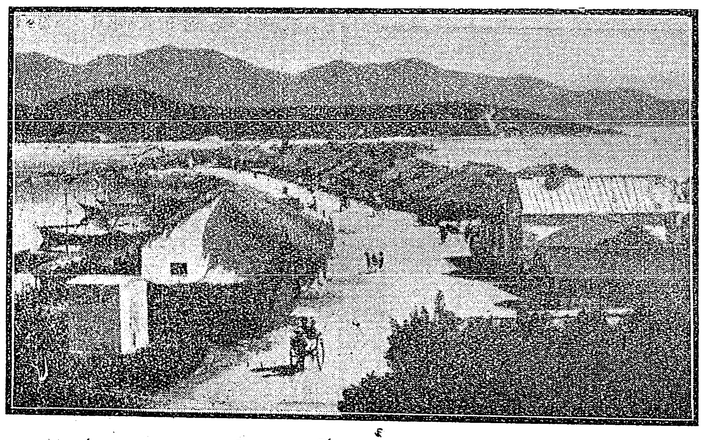

না-ট্রাং—সমুদ্র ও নদীর মধ্যবর্ত্তী মন্দিরে যাইবার পথ ও রিকস গাড়ী

যাঁহারা জলপথে এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে এই স্থানটি উপনিবেশের উপযুক্ত মনে করিবেন তাহার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। সমুদ্রের দুই অংশ উচ্চ গিরিমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় ইহা জলপোতের উত্তম আশ্রয়। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র ও গিরিমালা সুতরাং আত্মরক্ষার পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট স্থান। সংকাউ নদী পানীয় জলের অভাব মোচন করিতে সমর্থ। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রকৃতি যেন স্বহস্তে সমাগত অতিথিগণের জন্য এই আশ্রয়স্থল রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পো-নগর মন্দির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। রিক্সই একমাত্র অবলম্বন, কিন্তু গত কল্যকার সাইগণের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া আজ হোটেল-ম্যানেজারকে ডাকিয়া তাঁহার দ্বারা কোথায় যাইতে হইবে তাহা রিক্স-ওয়ালাকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া তার পর যাত্রা করিলাম। ১০।১২ মিনিট চলিবার পর যেখানে সংকাউ নদী সাগরে পড়িয়াছে, সেইখানে উপস্থিত হইলাম। এখানে খেয়া নৌকায় নদী পার হইতে হইবে। নদীর ও-পারে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরে মন্দিরগুলি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। আমি সেইদিকে চাহিয়া আছি—ইতিমধ্যে হঠাৎ নীচুদিকে নদীর ঘাটে নামিবার পথে এক বাড়ীর গায়ে ধাক্কা লাগিয়া আমার রিক্স প্রথমে কাৎ তারপরে একেবারে উপুড় হইল। কেমন করিয়া নিমেষমধ্যে কি কাণ্ড ঘটিল তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না—কারণ আমি মন্দিরের দিকে চাহিয়া ছিলাম, পথের দিকে লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম আমি রাস্তার উপর রিক্সর নীচে পড়িয়া গিয়াছি। উঠিতে চেষ্টা করি কিন্তু পারিনা। আমার হাতে বাইনকুলার ও একটা থার্ম্মোফ্লাস্ক ছিল। ইহাদের চামড়ার ষ্ট্রাপ, আমার পাণ্টুলান ও গাড়ীর চাকা এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে আমি ২।৩ বার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিলাম না। মূর্খ রিক্সওয়ালা তখন পার্শ্ববর্ত্তী একটি লোকের সহিত বিষম কলহে প্রবৃত্ত। পরে বুঝিলাম যে, সে-ই এই দুর্ঘটনার

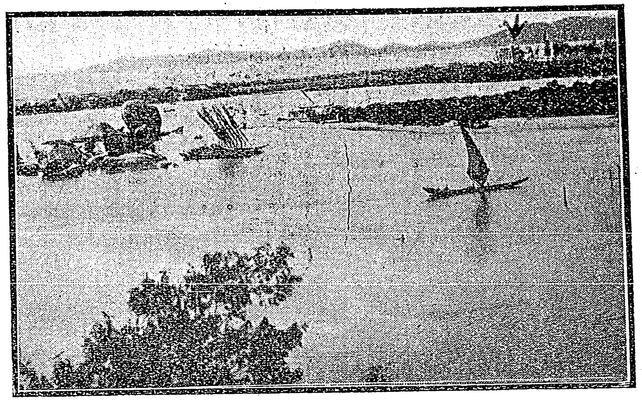

না-ট্রাং—সমুদ্র ও নদীর সঙ্গমস্থল হইতে দূরে তীর-চিহ্নিত স্থানে সুন ইয়াৎ সেনের বাটী দেখা যাইতেছে

জন্য দায়ী, রিক্সওয়ালার এই ধারণা। কিন্তু কলহের পূর্ব্বে যে ধরাশায়ী আরোহীকে ধরিয়া উঠান কর্ত্তব্য, এ

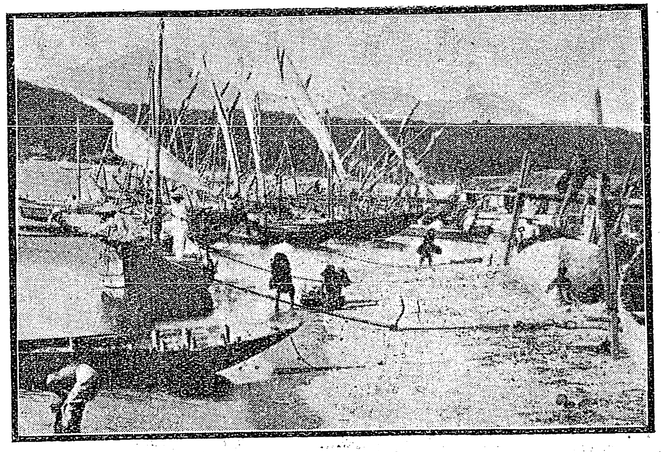

না-ট্রাং—জেলেদের কুটীর ও নৌকা

জ্ঞান তাহার ছিলনা। ভাগ্যক্রমে অদূরে একটি শিক্ষিত ভদ্রবেশধারী আনামী যুবক দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া আর দুই একটি লোক ডাকিয়া গাড়ীর নীচে

হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া আমার প্রথমেই ভয় হইল বাঁ-হাতখানার জন্য। কারণ লণ্ডনে রাস্তায় আছাড় খাইয়া বাঁ কাঁধে চোট পাইয়াছিলাম; তাহার ফলে দেড়মাস ভুগি, কিন্তু তথাপি বাঁ হাত একেবারে

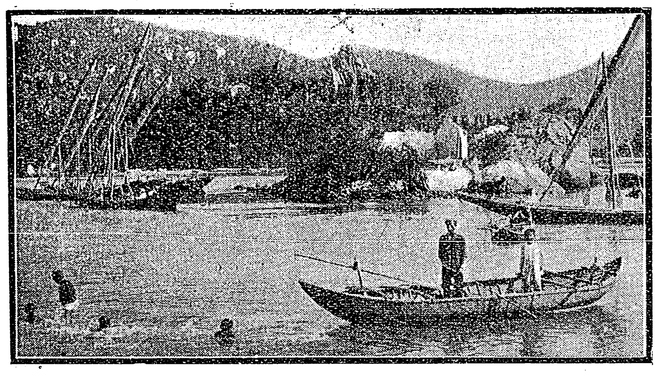

না-ট্রাং—নদীর পরপার হইতে দূরবর্ত্তী মন্দিরের দৃশ্য

সারে নাই, এখনও মাঝে মাঝে ব্যথা হয় এবং ইচ্ছামত সকল দিক নাড়িতে-চাড়িতে পারি না। এবারেও বাঁ কাত হইয়া পড়িয়াছি;—সুতরাং চোটটা বেশী লাগিয়াছে বাঁ হাতের উপরেই। তাই ভয় হইল যে এবারে বুঝি বা অবস্থা আরও সাংঘাতিক হয়। দেখিলাম বাঁ হাতের তালুতে তিন চার যায়গায় রক্ত বাহির হইয়াছে, এবং সমস্ত হাতের তালুতে ব্যথা; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঁ কাঁধে কোন চোট লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। হাতে এবং পোষাকে ধূলা কাদা লাগিয়া অপরূপ দৃশ্য হইয়াছে। আস্তে আস্তে নদীর ধারে গিয়া বাঁ হাতের তালু বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিলাম; কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত বন্ধ হইল। তার পর প্রশ্ন হইল, এখন কি করা যায়। অদূরে নদীর ও-পারেই মন্দির, তাহা না দেখিয়া যাইব না সাব্যস্ত করিলাম। উক্ত আনামী যুবকটির সঙ্গে একটু আলাপ হইল—ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে, কারণ আমার ফরাসী কথোপকথনের বিদ্যা বড় বেশী নয়। যুবকটির বাড়ী টংকিন —সেও এখানে প্রথম আসিয়াছে এবং ঐ মন্দির দেখিতে চলিয়াছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আমার বাড়ী কোথায়?—আমি বলিলাম ভারতবর্ষ।—তদুত্তরে সে উৎসাহের সহিত ফরাসীতে বলিয়া উঠিল 'গান্ধীর দেশ'! আমি বলিলাম হ্যাঁ।—এই সুদূর দেশে একজন সাধারণ আনামী যুবকের মনে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি

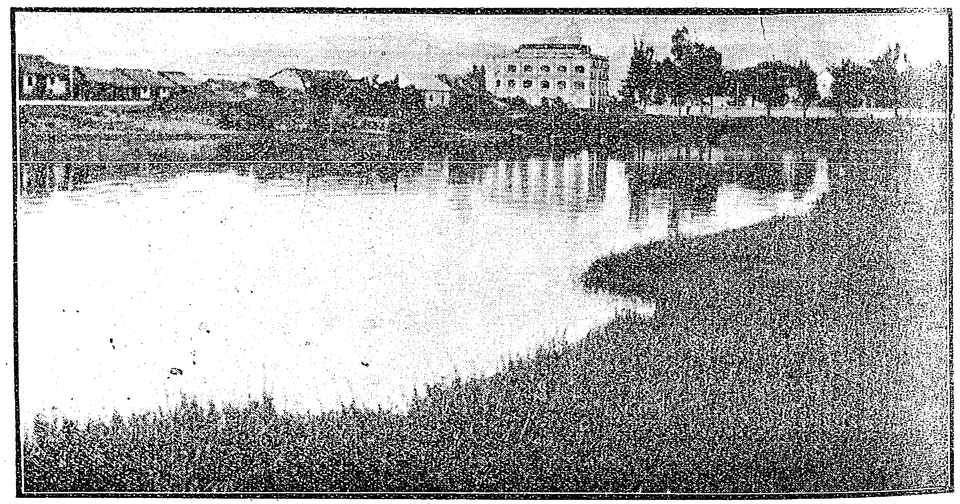

না-ট্রাং নদীপারের দৃশ্য—চিহ্নযুক্ত গম্বুজওয়ালা বাড়ীতে সুন ইয়াৎ সেন ১৮ বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

এইরূপ ভক্তির ভাব দেখিয়া আমার মনে বিশেষ গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দের উদয় হইল। আমি তাহাকে গান্ধীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবকটি বলিল যে, মহাত্মাকে তাহারা একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলিয়া ভক্তি করে এবং চীনদেশীয় 'সুন ইয়াৎ সেন' এর সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করে। আঙ্গুল দিয়া দূরে একটা বাড়ী দেখাইয়া বলিল যে, ঐ বাড়ীতে সুন ইয়াৎ সেন অনেকদিন বাস করিয়াছেন (পরে শুনিয়াছিলাম যে ১৮ বৎসরকাল চীনের এই নির্ব্বাসিত মহাপুরুষ ঐ বাড়ীতে বসবাস করিয়াছেন)। এইরূপ কথোপকথনে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করার পর খেয়া নৌকা আসিল; আমাদের দেশী ছোট নৌকার মত,—১০।১২ জন লোক ধরে। এই নৌকা করিয়াই নদী পার হইতে হইল। সমুদ্রের একেবারে কাছে, ঢেউও মন্দ নয়, একটু ভয়ও করিতে লাগিল। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নেই পার হওয়া গেল। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের এমন চমৎকার ব্যবস্থা যে, এই বিখ্যাত মন্দিরে যাইবার ভাল ঘাট তো কিছুই নাই, কোন্ পথ দিয়া কোন্‌দিকে কতদূরে যাইতে হইবে, তাহার নিদর্শন স্বরূপ কোন নোটিশও কিছু নাই। ভাগ্যে আনামী যুবকটি সঙ্গে ছিল, সে লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ছোট ছোট জেলেদের বাড়ীর আশে-পাশে আনাচ-কানাচের সরু আঁকা-বাঁকা কাঁচা রাস্তা দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা ক্রমে মন্দিরের নিকট পৌঁছিলাম। মন্দির কয়টি একটি ছোট পাহাড়ের উপর। নীচে থেকে পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি এবং তার ঠিক গোড়াতেই থাম-ওয়ালা একটি নাটমন্দিরের মতন কক্ষ ছিল। এই মন্দিরের ভিত্তি, ৮।১০টি থাম এবং সিঁড়ির কতকাংশ এখনও আছে। কিন্তু সেখানে এত কাঁটা বন ও জঙ্গল যে, সেখান দিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আমরা ঘুরিয়া আর এক পাশ দিয়া পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল করিয়া এককালে ৮।১০টি মন্দির এখানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু চারিটি মন্দির এখন পর্য্যন্ত কোনমতে খাড়া আছে, আর কয়টির ভিত্তি-চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান। এই চারিটিরও অন্তিম দশা—

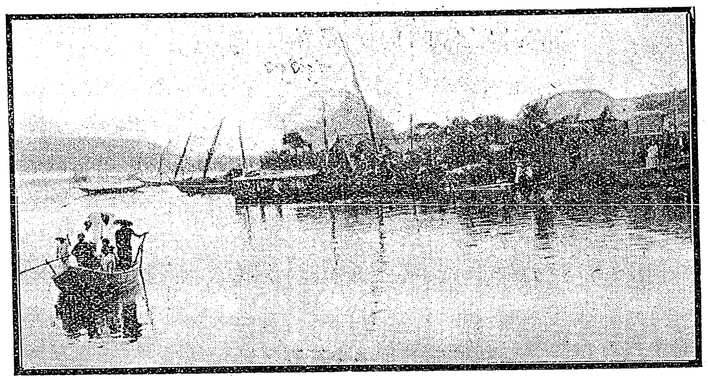

না-ট্রাং—খেয়া নৌকায় নদী পার হওয়ার দৃশ্য

মূল মন্দিরের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ গজাইয়াছে এবং তাহারই ফলে ছাদের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই মন্দিরগুলির দিকে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগ আছে

না-ট্রাং—পো-নগরের মন্দির

বা কোনকালে ছিল, এমত বোধ হইল না। মন্দিরগুলি সবই ইষ্টকনির্ম্মিত। মূল মন্দিরটি এখনও প্রায় ৫০।৬০ ফিট উচ্চ। ইহার গঠন-প্রণালী সাধারণ চম্পার মন্দিরের

মত (চিত্র দ্রষ্টব্য)। প্রথমে একটি নাটমন্দির,—ইহার মধ্য দিয়া মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। গর্ভগৃহটি

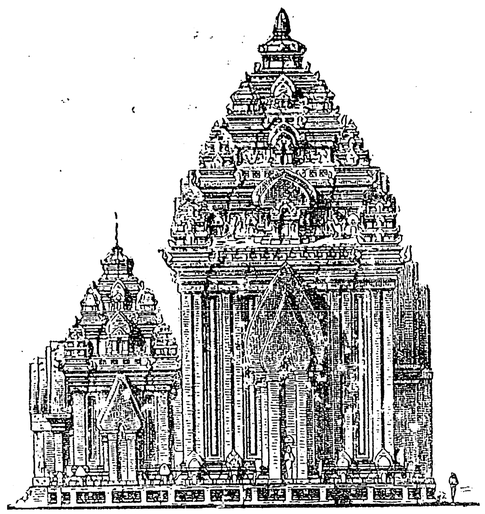

পো-নগরের মন্দির—এক পার্শ্বের দৃশ্য
(সুসংস্কৃত অবস্থার চিত্র)

চতুষ্কোণ, মধ্যস্থলে বেদীর উপর দেবী মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি উমা অথবা ভবানীর ;—কিন্তু বর্ত্তমানে বৌদ্ধগণ এই মন্দিরটি অধিকার করিয়া দেবীর সর্ব্বশরীর বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া চালাইতেছে। বেদীর উপর স্নানদ্রোণী, এবং ইহা হইতে একটি সরু নল দিয়া স্নানের জল-নিকাশের ব্যবস্থা আছে। গর্ভগৃহের ভিতর দিকের দেয়াল চারিটি পিরামিডের আকারে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছে।

মন্দিরের বহির্ভাগ নানা কারুকার্য্যে শোভিত। পূর্ব্ব দিকের প্রবেশদ্বার একটু বিচিত্র রকমে গঠিত। প্রথমে দুইটি স্তম্ভের উপর এস্কাবনের টেক্কার নক্সার একখানি পাথর। তৎপর ইহারই গাত্রসংলগ্ন ক্ষুদ্রতর অনুরূপ স্তম্ভ ও পাথর এবং তার পর আরও ক্ষুদ্রতর আর একটি ঐ নক্সার স্তম্ভ ও পাথর। এইরূপে পর পর তিন থাকে দরজার কাঠাম তৈরী হইয়াছে। স্তম্ভের উপর যে পাথর, তাহাতে দেবদেবীমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। মন্দিরের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে এইরূপ দরজার কাঠামের মত স্তম্ভ ও প্রস্তরখণ্ড দুই থাকে সাজান আছে। কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া বাস্তবিক প্রবেশের পথ নাই, কেবল বদ্ধ দেওয়ালের উপর একটি মুকুট-পরিহিত মূর্ত্তি বুকের কাছে দুই হাত একত্র করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই কাঠামের দুই পার্শ্বের দেওয়াল প্রাচীর-সংলগ্ন অনেকগুলি অর্দ্ধস্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত। এই সমুদয় অর্দ্ধস্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী ভাগ লতাপাতা ফুল প্রভৃতি নানা কারুকার্য্যশোভিত। মন্দিরের ছাদটি চারিতলা। সর্ব্বনিম্ন তলাটি মূল মন্দিরেরই অনুকরণ। ইহার ঠিক কেন্দ্রস্থলে ক্ষুদ্রতর আর একটি তলা—চারিপাশে খানিকটা খালি যায়গা—তার পর আর একটি, এইরূপ পর পর ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর চারিটি তলা উঠিয়াছে। সর্ব্বশেষ তলাটির উপর অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের ন্যায় একখণ্ড প্রস্তর। ছাদের প্রত্যেক তলার চারিকোণ খচিত প্রস্তরখণ্ড, এবং চারি দেওয়ালে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখে যে নাটমন্দির, তাহাও সংক্ষিপ্ত মূল মন্দিরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

মোটের উপর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে

লেখক

যে, স্থান-নির্ব্বাচনে ও গঠনকার্য্যে এই মন্দিরের শিল্পী সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। অনুচ্চ

পর্ব্বতখণ্ডের উপরে অবস্থিত এই মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইলে চতুর্দ্দিকে মনোরম দৃশ্য নয়নগোচর হয়—এক দিকে বিশাল সমুদ্র অপর দিকে অনন্ত-বিস্তৃত গিরিশ্রেণী। মাঝে একটি পার্ব্বত্য নদী এই মন্দিরের পর্ব্বতগাত্র ধৌত করিয়াই সাগরে মিশিয়াছে। অদূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকার সৈকতভূমি ও গিরিশ্রেণী-পরিবেষ্টিত প্রাচীন চম্পা (বর্ত্তমান না-ট্রাং) নগরী। এই দৃশ্য একবার দেখিলে সহজে বিস্মৃত হইবার নহে।

এই সমুদয় বিবেচনা করিলে এ মন্দিরটি প্রাচীন চম্পা রাজ্যে কেন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই মন্দিরগাত্রে ও সন্নিহিত ভূমিতে ২৮ খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে দ্বাপরযুগের ৫৯১১ (পাঁচ সহস্র নয়শত এগার) অব্দে রাজা বিচিত্রসগর এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একটি মুখলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশ্বাস যে খুব দৃঢ় ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। মন্দিরগাত্রের আর একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, ৬৯৬ শকাব্দে কতকগুলি জলদস্যু সমুদ্রপথে আসিয়া এই মন্দির লুণ্ঠন ও ভস্মসাৎ করে এবং মুখলিঙ্গটি অপহরণ করে। এই সংবাদ পাইয়া রাজা সত্যবর্ম্মা রণতরী লইয়া তাহাদিগের অনুসরণ করেন। যুদ্ধে দস্যুগণ পরাস্ত ও নিহত হয়—কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আসন্ন পরাজয়ের আশঙ্কায় তাহারা মন্দিরের লুণ্ঠিত ধনসম্পত্তি ও মুখলিঙ্গটি সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে। তখন সত্যবর্ম্মা পুনরায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ ও পরবর্ত্তী রাজা হরিবর্ম্মা একটি দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা সত্যবর্ম্মার ভাগিনেয় রাজা হরিবর্ম্মার পুত্র রাজা বিক্রান্তবর্ম্মার লিপিতে এই দেবীর অনেক স্তবস্তুতি আছে ;—দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

১। স্ফুরদ্দপুশ্ শ্রীর্ব্বরহেমলেখা
জ্জ্বলৎপ্রভা শ্রীবদনাম্বুজা সা।
রত্নপ্রভা রত্নকপোলবিম্বা
কৌঠারদেবী বরদা নতানাম্॥

২। চূড়ামণি-জ্বলিত-হেমশিরোরুহশ্রীঃ
কৌঠার-সাগর-সমীপ-নিবাসিনী যা।
শুদ্ধাংশুরত্নরুচিরাচিত লম্বকর্ণা
সা শ্রীমতী ভগবতী বিবভৌ ত্রিলোকে॥

এই শ্লোকদ্বয় হইতেই বুঝা যাইবে যে, এই সময়ে কৌঠারদেবী অথবা ভগবতী কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৌঠার উক্ত দেশের নাম, সুতরাং নবম শতাব্দীর পূর্ব্বেই ভগবতী দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা ও দেবীমূর্ত্তি স্বর্ণাবরণভূষিতা ও নানা সুসমৃদ্ধ অলঙ্কারে শোভিতা হইয়াছিলেন।

৮৪০ শকাব্দে রাজা ইন্দ্রবর্ম্মা সুবর্ণ-নির্ম্মিত ভগবতীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ৮৮৭ শকাব্দের একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, কাম্বোজ জাতির সহিত যুদ্ধের সময় ঐ সুবর্ণমূর্ত্তি কাম্বোজগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয় এবং তখন রাজা জয়-ইন্দ্রবর্ম্মা একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত চম্পার রাজগণ বহু সুসমৃদ্ধ দানের দ্বারা পো-নগরের মন্দিরের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ;—ভিন্ন ভিন্ন যুগের পাঁচখানি শিলালিপিতে এই সমুদয় দানের সবিস্তার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ১১৭৮ শকের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ দেবী-মূর্ত্তি ভগ্ন অথবা বিনষ্ট হয়। কারণ ঐ বৎসরের একখানি লিপিতে রাজনন্দিনী সূর্য্যদেবী কর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরে ভগবতী মাতৃলিঙ্গেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়েই উক্ত রাজকন্যা ভগবতী কৌঠারেশ্বরীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য অর্থ দান করেন। ১১৮৯ শকের একখানি লিপিতে উক্ত রাজনন্দিনী কর্ত্তৃক এই উভয় দেবীকেই ভূমি ও দাসদাসী দানের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহার পূর্ব্বেই কৌঠারেশ্বরীর মূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার পর এই মন্দির অথবা দেবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠার আর কোন উল্লেখ নাই। ইহার অনতিকাল পরেই চম্পারাজ্য দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় ;—সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান দেবীমূর্ত্তিই রাজনন্দিনী সূর্য্যদেবী-প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি। বর্ত্তমান মন্দিরটিও সম্ভবতঃ সত্যবর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত এবং কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকিতে পারে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ বহুপূর্ব্বে, প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্ত্তি বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন, ভারতবর্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল,—সম্ভবতঃ নাই। সুতরাং পো-নগরের ভগবতী দেবীর মন্দিরের ইতিহাস কেবল চম্পার ইতিহাসে নহে—হিন্দুধর্ম্মের দিক দিয়াও বিশেষ মূল্যবান।

তার পর

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

(১১)

দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন বৈকালে অভয়কে লইয়া মায়া সরমার কাছে আসিল।

কান্তিবাবুর বাড়ীর একটু দূরে কয়েকটি এক ধরণের বাড়ী ছিল। অজয় একটা লিমিটেড কোম্পানী করিয়া সেই বাড়ীগুলি করিয়াছিল এবং নিজে সে কোম্পানীতে পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার কিনিয়াছিল। হঠাৎ জমী-বাড়ীর দর ভয়ানক কমিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর ভয়ানক লোকসান হইয়া যায় এবং বাড়ীগুলি যে টাকার জন্য বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল, তার দাম তার চেয়ে কম হইয়া গিয়াছিল। সেই গোলযোগের সময় অজয়কে বিপন্ন হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। অজয়ের নিজের শেয়ার সে অন্য লোকের কাছে বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার করিয়াছিল। অজয় পলাইবার পূর্ব্বে অভয় তার পাওনাদারদের টাকা মিটাইয়া দিয়া শেয়ারগুলি বাঁধা রাখিয়াছিল। তখন সে শেয়ারের বাজার-দর কিছুই নাই। পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ারে অজয় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা দিয়াছিল। কিন্তু সেগুলির তখনকার বাজার-মূল্য কিছুই ছিল না। কেন না বাজারে সবাই জানিত যে দেনার দায়ে কোম্পানীর সব সম্পত্তি বিক্রী হইয়া যাইবে, অংশীদারেরা এক পয়সাও পাইবে না।

কিন্তু অভয় তার এটর্ণীর পরামর্শ অনুসারে কোম্পানীর পাওনাদারদের এক লক্ষ টাকা দিয়া তাদের দুই লক্ষ টাকার মর্গেজ কিনিয়া লইয়াছিল। তার পর এ তিন বৎসর অভয় সে সম্বন্ধে আর কিছুই করে নাই। ইতিমধ্যে বাড়ীগুলি বেশ ভাল ভাড়ায় বিলি হইয়া গেল, কোম্পানী ক্রমে ক্রমে ভাড়ার টাকা হইতে সুদ চালাইতে লাগিল। তার পর কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ অভয়ের সঙ্গে আপোষ করিয়া তাকে অর্দ্ধেক জমী ও দুইখানি বাড়ী বিক্রয় করিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি খালাস করিয়া লইয়াছিল। তাহার ফলে কোম্পানী ডিভিডেণ্ড দিলে, তাদের শেয়ারের দাম কিছু চড়িয়া গেল।

অভয় সরমার বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া সেই বাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া বলিল, "ও বাড়ীগুলো চেনেন দিদি? কে ক'রেছিল জানেন?"

"শুনেছিলাম অজয়বাবু এক কোম্পানী ক'রে ও-গুলো ক'রেছিলেন।"

"হাঁ। ওর অর্দ্ধেক আমি এখন কিনেছি।"

"তাই না কি? বেশ তো।"

"ওই কোম্পানীটা নিয়েই অজয়বাবু খুব বেশী জড়িয়ে প'ড়েছিলেন। সেই সময়ে জমীর দাম অত কমে না গেলে তাঁর কোনও বিপদই হ'ত না। এখন তো কোম্পানী একরকম দাঁড়িয়ে গেছে। এবারে ডিভিডেণ্ড দিয়েছে।"

সরমা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "তাই না কি? তা' ওতে তো অজয়বাবুর শুনেছি অনেক শেয়ার ছিল, সেগুলোতে এখন লাভ হবে তো?"

অভয়। তা হ'ত; কিন্তু শেয়ার তো তাঁর নেই। তাঁর সে শেয়ার আমার কাছে বাঁধা ছিল। যেদিন অজয় বাবুকে জামিনে খালাস ক'রে আনলাম, সেদিন আমি তাঁকে ব'লেছিলাম ও-শেয়ারগুলো নিয়ে নিতে। তা' কিছুতে নিলে না। ব'ল্লে, ওগুলো বেচে ফেলুন, আপনার দেনা যতদূর শোধ হয়। আমি তাঁকে ব'ল্লাম আমার কাছে অন্য যা বাঁধা আছে তাই থেকে আমার দেনা যতদূর হয় আদায় ক'রে নেব। সে ব'ল্লে, তা হবে না, সব দেনা শোধ হ'য়ে যদি কিছু বাঁচে তবেই সে নেবে। অজয়-বাবুকে সবাই জোচ্চোর বলে, আমাকে কিন্তু সে এক পয়সাও ঠকায় নি। আমি তার পর তাকে নিয়ে গিয়ে সব বেচাকেনা ক'রে হিসাব খতিয়ে শেষে দেখলাম যে ছ হাজার টাকা তার পাওনা হ'ল—আমার সব দেনা মায় সুদ শোধ ক'রে। আমি ব'ল্লাম—কাজ নেই অত সুদ দিয়ে, আপনি এ শেয়ারের বিশ হাজার টাকা নিন। তা কিছুতেই নিলে না—সুধু সেই ছ হাজার টাকা নিয়ে গেল—যেদিন সে খালাস হ'ল সেই দিন!

সরমা বলিল, "ছ হাজার টাকা!" সে নীরবে রহিল। তার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

অভয়। যাক গে, এখন সে সেই টাকা দিয়ে তার কারবারটা জাঁকিয়ে তুলতে পারবে। আর তো দেনা নেই তার। আর বুদ্ধিমান লোক, ব্যবসায় সে উন্নতি ক'রবেই!

সরমা বলিয়া ফেলিল, "ছাই ক'রবে। সে টাকা সে কি ক'রেছে জানেন? আমার কাছে তার সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দেনা ছিল, আমি চাইওনি সে টাকা, সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় সে টাকা আমাকে দিয়ে গেছে। আমি ব'ল্লাম, এখন থাক টাকাটা, তা' কিছুতেই শুনলে না।"

অভয় বলিল, "অ্যাঁ! সে টাকা দিয়ে ফেলেছে! তবে? তবে ওর ব্যবসা কি হবে ছাই! কি মুস্কিল! জানেন ও কি কষ্টে থাকে?"

সরমা। হাঁ, আমি তা দেখে এসেছি।

অভয়। ছ' হাজার টাকা পেলে একটু জাঁকিয়ে ব্যবসা ক'রতে পারতো, তাও ক'রলে না। কি করা যায় বলুন তো?

মায়া আসিয়া বলিল, "কার কি ক'রবে?"

অভয় বলিল, "এই অজয় বাবুর কথা ব'লছিলাম।"

মায়া বলিল, "তার আবার ক'রবে কি? খবরদার তুমি যেন আবার তার পিছনে টাকা ঢালতে যেও না। তাহ'লে আমার সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া হ'য়ে যাবে কিন্তু।

অভয় বলিল, "না, তা যাচ্ছি নে, কেন না, গেলে, সে নেবে না।"

"নেবে না, না আর কিছু। পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা অমান বদনে গিলে ফেললে আর—"

অভয়। ওঃ—সে কথা তোমাকে বলা হয় নি মায়া। অজয়বাবু আমার সব টাকা শোধ দিয়েছেন—এক পাণাকড়ি সুদ মাপ নেন নি।

মায়া শুনিয়া বিস্মিত হইল। কিছুক্ষণ বাদে সে বলিল, তবে সে আর কার মাথায় হাত বুলিয়েছে।"

অভয় হাসিয়া বলিল, "তাও নয় মায়া! আমার যা ছিল তার যে সব সম্পত্তি বাঁধা ছিল তারই থেকে সব শোধ হ'য়েছে।"

মায়া বলিল, "তাই বল, সে শোধ ক'রে নি, তোমার হাতে যা ছিল তাই থেকে শোধ হ'য়েছে। আমি ভাব-ছিলাম বুঝি বা সেই হাতে তুলে টাকাগুলো দিয়েছে।"

সরমা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। অজয়ের বিষয়ে মায়ার এ অনুদার সংশয় দেখিয়া সরমার চিত্ত পীড়িত হইল বেচারী অজয়ের প্রতি সমবেদনায়। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

পরের দিন সকালে সরমাকে ল্যাবরেটারী দেখিতে যাইবার জন্য অভয় বলিয়া গিয়াছিল। সরমা মোটরে উঠিতে গিয়া ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিল "পেট্রল নিতে হবে কি আজ?"

ড্রাইভার পেট্রল-ট্যাঙ্কে কাঠি ডুবাইয়া দেখিল। সে বলিল, "আজকের দিন চলবে, কাল নিলেই হবে।"

সরমা বলিল, "থাক, এখনই নিয়ে চল—টালিগঞ্জের সেই দোকানে চল, সেখান থেকেই তেল নেবো।"

অজয়ের দোকানের সামনে আসিয়া যখন গাড়ী থামিল, তখন অজয় দোকানেই বসিয়া ছিল, কারখানার কাজ তখনও আরম্ভ হয় নাই।

সরমা তাকে ডাকিয়া পেট্রল দিতে বলিল। অজয় তার দোকানের পাম্প হইতে পেট্রল ভরিয়া দিল। সরমা তাকে দাম দিবার সময় বলিল, "দেখুন অজয় বাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে, একবার দয়া ক'রে আমার ওখানে যাবেন কি?"

অজয় নত মস্তকে বলিল, "আমার দোকানে অন্য লোক নেই, দোকান ছেড়ে—"

"বেশ তো, যখন দোকান বন্ধ করেন তখন যাবেন, যে সময় হোক আমার কোনও আপত্তি নেই।"

একটু হাসিয়া অজয় বলিল, "আমার দোকান বন্ধ হয় রাত দু'টায়—ততক্ষণ পর্য্যন্ত তেলের খদ্দের অনেক আসে।"

"রাত দুটো! রোজ রাত দুটো পর্য্যন্ত আপনি জেগে ব'সে থাকেন?"

"থাকতে হয় বই কি? তবে ঠিক জেগে থাকি নে—একটু একটু ঘুমোই।"

"সর্ব্বনাশ! তা হোক, আপনার আসতেই হবে। আমার বড্ড দরকার। না হয় একটু লোকসান হবে আপনার। আজ সন্ধ্যেবেলায় আসবেন, কেমন?"

একটু বিবেচনা করিয়া অজয় বলিল, "আচ্ছা।"

সরমা মোটর হাঁকাইয়া চলিয়া গেল মায়ার বাড়ী।

আজ সে অজয়ের কাছে যে কথা শুনিল তাহাতে তার আরও দুঃখ হইল। একলা অজয় দোকান দেখে, ওই ছোকরা ছাড়া তার অন্য লোক নাই। আর এই সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত সে খরিদ্দারের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। ভাবিতে তার বুক ফাটিয়া গেল।

তার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল অজয়ের দীন জীবনের চিত্র। সে দেখিল, রাত দুইটা পর্য্যন্ত অজয় তার দোকানে বসিয়া আছে। পথ দিয়া মাঝে মাঝে মোটর চলিতেছে, অজয় খরিদ্দার পাইবার আশায় উঠিয়া বসিতেছে;—মোটর চলিয়া যাইতেছে, অজয়ের দোকানে তাদের কোনও প্রয়োজন নাই। নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার ঢলিয়া পড়িতেছে। শ্রান্ত চক্ষু দুটি হয় তো আর সে টানিয়া রাখিতে পারে না—একটু ঝিমাইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়—হয় তো রাত দুইটায় এক মোটর আসিল তেল লইতে। ধড় মড় করিয়া উঠিয়া অজয় কাঁপিতে কাঁপিতে পাম্পের কাছে গেল। তেল লইয়া মোটর চলিয়া গেল। অজয় আবার ঢলিয়া পড়িল তার আসনে!

ভাবিতে সরমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

অভয়ের বাড়ীতে যখন সে পৌঁছিল তখনও তার চক্ষু আর্দ্র। চোখ ভাল করিয়া পুঁছিয়া সে গাড়ী হইতে নামিল।

উপরে গিয়া দেখিল মায়া বসিয়া নিরুপমের সঙ্গে গল্প করিতেছে। সে দেখিতে পাইল নিরুপম তাকে দেখিয়া ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিরুপম ও তার চিঠির কথা সরমা এ কয় দিন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। তার মনটা আচ্ছন্ন ছিল অজয়ের দুঃখে। অজয়কে তার দুঃখের জীবন হইতে টানিয়া তুলিবার কি উপায় করা যায়, সেই চিন্তা সে সর্ব্বদাই করিয়াছে, অন্য কোনও চিন্তা তারি মনে স্থান পায় নাই—অভয়ের কথাও তার বড় একটা মনে পড়ে নাই।

এখন নিরুপমকে দেখিয়া তার সে কথা মনে পড়িল। নিরুপম যে তাকে দেখিয়াই সঙ্কুচিত হইয়া গেল, তাহাতে তার মনে হইল যে সরমা যে তার চিঠির উত্তর দেয় নাই তাহাতে নিরুপম স্থির করিয়াছে যে, সরমার রাগটা পড়ে নাই, তাই সে এতটা সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে।

কিন্তু সরমার তখন নিরুপমের উপর ক্রোধ ছিল না। বিশ্বের কারও উপর তখন ক্রোধ ছিল না তার। সমস্ত অন্তর তার সিক্ত হইয়া ছিল অপরিসীম করুণায়;—তাই সে নিরুপমের সঙ্কোচ দেখিয়া মনে আঘাত পাইল।

সে তাড়াতাড়ি নিরুপমকে বলিল, "এই যে আপনি এখানে আছেন! এ কয় দিন আপনাকে দেখতে পাই নি। আপনি যে আর যানই না। মা ব'লছিলেন, আপনি বোধ হয় রাগ ক'রেছেন, সত্যি না কি?"

অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিরুপম বলিল, "না, না, রাগ ক'রবো আমি? দোষও ক'রলাম আমি, রাগও আমি ক'রবো?"

সরমা হাসিয়া বলিল, "ও, সেই কথা! আপনি চিঠিতে লিখেছিলেন বটে কি একটা অপরাধ ক'রেছেন যার জন্য আমার রাগ করা উচিত। আমি তো ভেবেই পেলাম না কি সে অপরাধ। রাগ করবার একটা কারণ আছে, অথচ আমি সেটা জানি না, সেই কথা ভেবে আমার রাগ হচ্ছিল বটে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "তাই না কি ঠাকুরপো? এই নিয়ে আবার চিঠি চালিয়েছ? কি লিখেছিলে শুনি?"

নিরুপম বলিল "সে আর শুনে কি ক'রবে বউদি। অপরাধটাই যদি ওঁর মনে না পড়ে তবে আর সেটা খুঁচিয়ে তুলে লাভ কি?"

সরমা বলিল, "যাক গে—ও সব বাজে কথা রেখে দিন। যাবেন আপনি শীগ্‌গির একদিন। না গেলে আমি সত্যি সত্যি রাগ ক'রবো।"

নিরুপম বলিল, "সে রাগ করবার সুযোগ পাবেন না। আমি সে চরিত্রের লোক নই যে নিমন্ত্রণ পেলে অগ্রাহ্য ক'রবো।"

অভয় আসিয়া পড়িল। সে বলিল, "এই যে দিদি! আসুন তবে—দেখে যান ল্যাবরেটারীটা। সব ঠিক হ'য়ে গেছে। ও—নিরু আছ দেখছি। তা যাক এখন থাক, তোমরা কথাবার্ত্তা কও; তার পর গেলেই চ'লবে।"

নিরুপম বলিল, "না অভয়দা, আমার জন্য তোমার

ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ল্যাবরেটারী দেখলে মূর্চ্ছা হবে না। চল যাই, আমিও দেখি গে।"

অভয় বলিল, "কিন্তু ভাই, সেখানে গেলে অনেক কেমিষ্ট্রির কথা শুনতে হবে। ভূতের কাছে রাম নাম গাইবো?"

নিরুপম একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, "তা দোষ কি? উদ্ধার হ'য়েও তো যেতে পারি।"

সকলে মিলিয়া ল্যাবরেটারীতে চলিল। Bio-chemistryর জন্য তাতে যে সব নূতন অংশ প্রস্তুত হইয়াছিল, অভয় সে সকল সকলকে দেখাইল এবং বিশেষ বিশেষ অংশের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিল।

ল্যাবরেটারী দেখা হইলে সে সকলকে তার পড়িবার ঘরে লইয়া বসাইল এবং একখানা খাতা বাহির করিয়া সে সরমাকে দিয়া বলিল, "এই দেখুন, আমি আপনার জন্য ও আমার জন্যে কতগুলো series of experiments ছ'কে রেখেছি।"

সরমা খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল। অভয় উৎসাহের আতিশয্যে তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মাঝে মাঝে খাতার ভিতর সঙ্কল্পিত পরীক্ষার যন্ত্রের ছবি আঁকা ছিল, তার কতক প্রচলিত, আর দুই একটা অভয়ের উদ্ভাবিত। সেই সব ছবি যখন আসিয়া পড়ে অভয় তখনই ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেই ছবিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তার ব্যাখ্যা করে। মাঝে মাঝে উৎসাহের আতিশয্যে সে সরমার হাতের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

একখানা ছবি দেখাইয়া সে বলিল, "এটা একটা নতুন experiment। আমি এই যন্ত্রটা ক'রছি—এতে যতদূর সম্ভব গরুর পাকস্থলীর সবগুলি ক্রিয়া একটার পর আর একটা হ'য়ে যাবে। সেই প্রক্রিয়াগুলির হুবহু অনুকরণ ক'রলে, আমার বোধ হয় celluloseটা হজম করবার সহজ প্রণালীটা পাওয়া যাবে। সেইজন্যে দেখুন এখানে প্রথম "পাকস্থলীর ক্রিয়া হবে" বলিয়া সে ছবিটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরম উৎসাহের সহিত তার উদ্ভাবিত যন্ত্রের সমস্তগুলি অংশ ব্যাখ্যা করিয়া গেল।

তার পর বলিল, "এ experiment যদি ঠিক সফল হয় তবে ঘাস, বিচেলী, খড়, কাঠ কি যা কিছু থেকে মানুষের খোরাক তৈরী হ'তে পারবে।"

নিরুপম বলিল, "কিন্তু গরু যে জাবর কাটে তার কি ব্যবস্থা ক'রেছ?"

অভয় বলিল "ক'রেছি বই কি? এই দেখ না, এই প্রথম পাকস্থলীতে জিনিষটা treated হ'লে তাকে ফেলা হবে এই বড় বাক্সটার ভিতর, সেখানে তাকে নাড়াচাড়া ক'রে গরুর লালার সঙ্গে বেশ ক'রে মেশান হবে।"

নিরুপম। কিন্তু চিবোবার ব্যবস্থা কি?

অভয়। সে দরকার হবে না—কেন না, আমি ঘাসটাকে একেবারে একটা paste ক'রে তবে এই যন্ত্রে দেব কি না?

সরমা ও মায়া একটু বিস্মিত হইয়া নিরুপমের দিকে চাহিল। অভয়ের মুখে নিছক কেমিষ্ট্রীর আলোচনা যে সে বেশ মন দিয়া শুনিয়াছে, তার প্রশ্ন হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা গেল।

মায়া বলিল, "সে কি ঠাকুর-পো? কেমিষ্ট্রীর কথা শুনতেও দেখছি তোমার আজকাল মন লাগছে।"

নিরুপম বলিল, "তা এক আধটু লাগছে বই কি। বিশেষ অভয়-দা যে শেষে আমাদের ঘাস খাওয়াবার ব্যবস্থা ক'রছে, তাই শুনে আমার তাক লেগে গেছে।—হাঁ অভয়-দা, ঘাস থেকে না হয় খাবার তৈরী ক'রলে—সে খাবারের দাম কি ধান চালের চেয়ে সস্তা হবে?"

অভয়। সেইটেই হ'চ্ছে এর পরের প্রশ্ন। যদি এতে ক'রে ঘাস হজম করা যায়, তবে দেখতে হবে যে ব্যবসার মত ক'রে এই জিনিষ ক'রতে গেলে এ ক'রতে কত খরচ লাগতে পারে। খরচ যদি বেশী হয়, তবে আবার এই সব প্রক্রিয়াগুলির এক এক ক'রে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে, এর কোথায় কোন্ প্রক্রিয়াটা অপেক্ষাকৃত সস্তা হ'তে পারে। সস্তা না হ'লে, মনে কর এক শো টাকায় যদি একমণ হজম করবার যোগ্য ঘাস পাওয়া যায়, তাতে কোনও উপকারই হবে না।"

নিরুপম বলিল, "এখন উঠি অভয়-দা। আমার কাছারীর সময় হ'ল। মানুষকে ঘাস খাওয়াবার এই চেষ্টাটায় আমার ভারী রস লেগে গেছে। এটা করবার সময় আমাকে খবর দিও—দেখবো তোমরা কেমন ক'রে কি সব কর।"

অভয় হাসিয়া বলিল, "তা ডাকবো। ভূতের দেখছি মুক্তি হবার খুব বেশী দেরী নেই।"

নিরুপম হাসিল, আর অতি সন্তর্পণে একবার সরমার দিকে চাহিল। সরমাও তখন তার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তার চ'খের দিকে চাহিয়াই নিরুপম চক্ষু ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

ইহার পর মায়া উপরে গিয়া সরমাকে বলিল, "বিয়ের আগে ওঁর যে অবস্থাটা হ'য়েছিল আমাকে নিয়ে, ঠাকুরপোর অবস্থা দেখছি কতকটা সেই রকম দাঁড়িয়েছে। —অবশেষে কেমিষ্ট্রীতে রস লেগে গেল তার। এ যে ওঁর cadillac গাড়ী কেনার চেয়েও বিচিত্র!"

সরমা একটু হাসিল, কিন্তু কথাটায় তার মনটা ভার হইয়া গেল।

মায়া বলিল, "যাই হোক ভাই, ঠাকুরপোর কিন্তু তোর উপর ভারী মন প'ড়ে গেছে। তুই ওর উপর রাগ ক'রেছিস ভেবে ও যে কি মনমরা হ'য়ে প'ড়েছে তা' বলবার নয়। সেই যে সেদিন এসেছিল, তার পর আর আসে নি। আজ সকালে এসেছিল সুধু তোরই জন্যে।"

সরমা বলিল, "আমি আজ আসবো তা' জানতো তা' হ'লে।"

"না ভাই, জানতো না। ও এসেছিল সুধু আমার কাছে দুঃখের কথা ব'লতে। তুই আসবার আগে ও ব'লছিল তোর নামে অমনি যা' তা' ব'লে সে ভারি অন্যায় ক'রেছে। ব'লছিল, তুই না কি ওর উপর ভারী রাগ ক'রেছিস—ব'লতে তার মুখ যা' হ'য়েছিল তা' যদি দেখতিস তো তোর বুক ফেটে যেত। তুই এসে ভাগ্যিস ওকে মিষ্টি কথা ব'লে তাজা ক'রে দিলি, নইলে ও যে কি হ'য়েছিল তা কি ব'লবো। যেন সে ঠাকুরপোই নয়। জন্মে যেন কোনও দিন হাসে নি।"

সরমার মনটায় এ কথায় একটা মোচড় দিয়া উঠিল। করুণাময়ী সে, কারও দুঃখ সহিতে পারে না, আর তার নিজের কাজে বা কথায় কেউ দুঃখ পাইতেছে এ কথা ভাবিতে তার অনুতাপের সীমা থাকে না।

মনের ভাব গোপন করিবার জন্য সে একটু হাসিয়া মায়াকে বলিল, "দেখ মায়া, এ দূতীগিরি তুই শিখলি কোত্থেকে?"

মায়া বলিল, "না ভাই, সত্যি বলছি, একটি কথা যদি মিথ্যা ব'লে থাকি। তোকে ও সত্যি সত্যি—"

"মিথ্যে ব'লেছিস তো বলছি নে, বলছি দূতীগিরি ক'রছিস। এ বিদ্যে তোকে শেখালে কে?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "কেন তুই। ভুলে গেছিস কি, কেমন ক'রে তুই দিন রাত আমার কাছে ওঁর নাম জপতিস!"

সরমা বলিল "তা বটে, কিন্তু বিদ্যায় তুই দেখছি গুরুকে হার মানাবি।"

মায়া যাহা বলিল, সরমারও মনে সেই সন্দেহ হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল নিরুপমকে সে যত অন্তঃসার-শূন্য মনে করিয়াছিল, ততটা অসার সে নয়। সে বোধ হয় সরমাকে সত্য সত্যই ভালবাসিয়াছে। এ কথা ভাবিতে তার মনে দুঃখ হইল। নিরুপম ভালবাসিয়াছে, কিন্তু প্রতিদানে তার নিরুপমকে ভালবাসা দিবার শক্তি তো নাই। সে কথা সে নিরুপমকে কোন্ প্রাণে বলিবে? নিরুপমের উদ্যত প্রেমকে বিমুখ করিলে সে যে প্রাণে ব্যথা পাইবে এই কথা ভাবিয়া সরমার দুঃখ হইল।

নিরুপম যদি তাকে ভাল না বাসিত, তবে বরং সরমা ভাল না বাসিয়াও তাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারিত। কিন্তু ভালবাসার উত্তরে বঞ্চনা দিতে তার মন সরিল না। অথচ প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্যথা দিতেও মনে বাজিল। হয় তো বড়ই বাজিবে সে প্রত্যাখ্যান নিরুপমের মনে। কে জানে যে, এই প্রত্যাখ্যানের ফলে তারও জীবন শেষে অজয়ের মত উদাস হইয়া যাইবে না! ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠিল।

অজয়ের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সরমার মনে হইয়াছিল যে অজয় যে আজ এত দুঃখ পাইতেছে ইহার অনেকটাই তার স্বয়ংকৃত। অন্ততঃ এখন তো সে ইচ্ছা করিলেই অবস্থা আগের মত ভাল করিয়া ফেলিতে পারিত। অভয় তাকে যে শেয়ার দিতে চাহিয়াছিল, সেগুলি লইলে তার অবস্থা অনায়াসে ফিরিতে পারিত, সরমাকে সে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা না দিলেও তো তার কতকটা অবস্থার উন্নতি হইতে পারিত। এ টাকাগুলি হাতে পাইয়া সে অনায়াসে ছাড়িয়া দিল; তার নিদারুণ দুঃখ কষ্টের জীবন এতদিন সহিয়াও সে হাতের লক্ষ্মী ঠেলিয়া ফেলিল, ইহার হেতু সরমা ইহাই সাব্যস্ত করিল, যে, তার মনের ভিতর একটা প্রচণ্ড বৈরাগ্য আসিয়াছে। সুখের আশায় হতাশ

হইয়া সে আত্মনিপীড়ন করিয়া তার প্রতিকার করিতেছে, হতাশার আগুনে ইন্ধন জোগাইতেছে। এই কথা ভাবিয়াই তার মন অজয়ের প্রতি সমবেদনায় আরও বেশী কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সরমার মনে সংশয় ছিল না যে, যে দুঃখ অজয়ের মনটাকে এমনি করিয়া পোড়াইয়া ঝাঁঝরা করিয়া দিয়াছে, সেটা তার ধনভাগ্যের বিপর্য্যয় নয়—সে তার বঞ্চিত প্রেম। মায়াকে হাতে পাইয়া হারাইয়া সে আপনার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা এতটা হইত না।

মায়ার মুখে নিরুপমের কথা শুনিয়া তার বিশেষ করিয়া মনে পড়িল অজয়ের কথা। মনে হইল তাকে ভালবাসিয়া হতাশ হইয়া নিরুপমের অন্তর যদি অমনি রসশূন্য ও উদাস হইয়া যায়! ভাবিতে তার প্রাণে ব্যথা লাগিল।

কিন্তু নিরুপমকে বিবাহ করাও তো অসম্ভব! অভয়ের প্রতি প্রেমের এত বড় বোঝা মনে বহিয়া কেমন করিয়া সে নিরুপমের সংসার করিবে? আজও তো সে অনুভব করিয়াছে, কত টনটনে তাজা রহিয়াছে তার প্রেম। আজ যখন অভয় তাকে সব বুঝাইয়া বলিতেছিল, তখন তার অন্তরে যে অমৃতের প্রস্রবণ বহিতেছিল, সে তো সুধু জ্ঞান-পিপাসুর বিজ্ঞানানন্দ নয়। বিশেষ অভয় যখন প্রবল উৎসাহে তার গায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাকে সব পরীক্ষার বিবরণ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছিল, তখন তার দেহের শিরায় শিরায় যে তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়া গিয়াছিল তার অঙ্গস্পর্শে, তার তো বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নাই। তার দেহ মনের প্রতি অণু পরমাণু যে তীব্রভাবে অভয়কে কামনা করিতেছে—এমন মন লইয়া সে নিরুপমকে বিবাহ করিবে কেমন করিয়া?

কিন্তু এমন মন লইয়া সে কি সাহসে অভয়ের সহকর্ম্মিণী হইয়া তার ল্যাবরেটারীতে প্রবেশ করিবে? কেমন করিয়া সেখানে সে মনকে চাপিয়া আত্মরক্ষা করিবে? ভাবিতে তার ভয় হইল।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে এই কথা ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া সে কূল পাইল না। কোনও দিশা না পাইয়া সে হতাশ হইয়া গা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

উপায় নাই। বিবাহ না করিলে অভয়ের ল্যাবরেটরীতে তার কাজ করিতেই হইবে। না জানি তাহা হইতে কি সর্ব্বনাশ হইবে! কেন এ দুঃসাহস করিবে সে? নিজের সর্ব্বনাশ, আর কে জানে কার সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে? কে জানে ইহাতে মায়ার সর্ব্বনাশ হইবে না; তার শিশু পুত্রের জীবন বিষময় হইবে না!

সে স্থির করিল কাজ নাই অত দুঃসাহসে। হাজার হাজার মেয়ে রোজ যা করিতেছে, তাহা না করিয়া সে স্বতন্ত্র পথের সন্ধানে সর্ব্বনাশকে বরণ করিবে না। তার চেয়ে, নিজের যাই হোক, নিরুপমের নিদারুণ মনঃকষ্ট তো সে নিবারণ করিতে পারিবে! সেই ভাল।

সে বিবাহ করিলে নিরুপম সুখী হইবে, সুনীতি সুখী হইবেন। মায়া ও অভয়ও সুখী হইবে। এতগুলি লোকের সুখের চেয়ে তার নিজের মনটাকে সে বড় করিবে?

বাড়ীতে যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন সে মন স্থির করিয়াই ফিরিল। নিরুপমকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে পরের সুখের জন্য পরিপূর্ণরূপে আত্ম-বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া বাড়ী ফিরিল।

(১২)

সন্ধ্যাবেলায় সরমা অজয়ের প্রতীক্ষায় রহিল।

সাড়ে ছয়টার সময় একটা ট্যাক্সি আসিয়া তার বাড়ীর সম্মুখে থামিল। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ী হইতে নামিয়া তার পাগড়ী ও খাকী কোট খুলিয়া ফেলিল। একটা মোটা চাদর গায় জড়াইয়া সরমার ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। সরমা দেখিল সে অজয়।

অজয় আজ একটু পরিপাটি বেশে আসিয়াছে। ফরসা একখানা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিয়াছে, মাথার লম্বা কোঁকড়ান চুলগুলি তার পিঠের উপর দিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে। তার লম্বা দাড়ি গোঁফের উপরও বুরুষ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল।

সরমা অর্দ্ধপথে অগ্রসর হইয়া তাকে সম্ভাষণ করিল। সে হাসিয়া বলিল, "যা হ'ক আজ তবু বাঙ্গালীবেশে দেখলাম আপনাকে!"

অজয় একটু হাসিয়া নমস্কার করিল, কোনও কথা কহিল না।

তাকে লইয়া একটা ঘরের ভিতর বসাইয়া সরমা বলিল,

"আচ্ছা অজয় বাবু, আপনি যে ঐ মোটরের দোকান ক'রেছেন ওতে কি খুব লাভ হয় ?"

অজয় বলিল, "খুব বেশী কিছু লাভ হয় না, তবে আমার বেশ চ'লে যায়। কেন জিজ্ঞাসা ক'রছেন জিগ্‌গেস ক'রতে পারি কি ?"

সরমা বলিল, "আমার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। কারও কাছে ব'লতে সাহস হয় না, লোকে ঠাট্টা ক'রবে ব'লে, কিন্তু ভারী একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে। দেখুন, এই ব্যবসা-ট্যাবসাগুলো আপনারা পুরুষ-মানুষেরা সব একচেটে ক'রে রেখেছেন, মেয়েদের এতে স্থান নেই। আমার ইচ্ছা হয় আমি একটা ব্যবসা ক'রে, মেয়েছেলেরাও যে এমনি ক'রে উপার্জ্জন ক'রতে পারে সে কথা প্রতিষ্ঠিত ক'রবো। আমাকে মামা অনেক টাকা দিয়ে গেছেন। যদি ব্যবসা ক'রতে গিয়ে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা লোকসানও হয়, তাতে আমি মারা যাব না। কিন্তু যদি আমি সফল হই তবে আমাদের দেশের আরও অনেক মেয়ে ক্রমে ব্যবসায় নামতে পারবে। আপনার এই কারবারটা দেখে আমার মনে হ'চ্ছিল, এমনি একটা ব্যবসা ক'রলে কেমন হয় ? তাই আপনার মত জানবার জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।"

অজয় বলিল, "আপনি যদি নিতান্তই ইচ্ছা করেন তবে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারেন। কিন্তু আমার মত ব্যবসা ক'রে যে বেশী লাভ পাবেন তা' মনে হয় না। আমি সামান্যভাবে থাকি, কোনও রকমে আমার চ'লে যায়—তাতে আপনার পোষাবে কি ? অন্ততঃ আপনার যা উদ্দেশ্য, তাতে ব্যবসায় বেশ মোটা লাভ না হ'লে তো হবে না—লোকে তাতে আসবে কেন ?"

"কেন ? বেশী লাভ করা যায় না ? যদি ধরুন কিছু বেশী টাকা ফেলা যায় ?"

"হাঁ, বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ফেললে কিছু বেশী লাভ হ'তে পারে। কিন্তু অতগুলো টাকা ধাঁ ক'রে একটা ব্যবসায় ফেলবেন, সে ব্যবসার হালচাল কিচ্ছু না জেনে, সেটা ঠিক নয়। ব্যবসা চালাতে গেলে তার জন্য একটা বিশেষ শিক্ষার দরকার। নইলে আপনার মত অব্যবসায়ী হঠাৎ অতবড় একটা ব্যবসা ফেঁদে ব'সলে সুধু লোকসান দেবেন। এ ব্যবসায় অনেকটা অভিজ্ঞতা দরকার।"

"তবে আপনি ক'রলেন কি ক'রে ? আপনি কোথায় শিখলেন ?"

অজয় বলিল, "খুব বেশী কিছু শিখি নি আমি, কিন্তু মোটরের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বরাবরই ছিল। আগে যখন আমার মোটর ছিল, তখন তার সব কাজ আমি নিজেই ক'রতাম। তার পর ক'লকাতা থেকে যখন পালিয়ে গেলাম, তখন কিছুদিন দিল্লীতে একটা কারখানায় কাজ শিখেছিলাম। যা' শিখেছিলাম তাতেই সেখানে শেষে ১০০৲ টাকা মাইনে হ'য়েছিল। সেই মাইনে থেকে জমিয়ে যখন দু' হাজার টাকা হাতে হ'ল, তখন ক'লকাতায় ফিরে এলাম। এখানে এসে প্রথমে ট্যাক্সি কিনে চালাতে আরম্ভ ক'রলাম। তাতে বেশ লাভ হ'ল। আরও কিছু টাকা হাতে হ'লে আর দুখানা ট্যাক্সি কিনলাম। গাড়ীর মেরামতের জন্য আস্তে আস্তে ছোট একটা কারখানা ক'রলাম। তার পর সঙ্গে সঙ্গে এই দোকান হ'ল। এমনি ক'রে অভিজ্ঞতা জন্মে গেছে আমার। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে অনেক বই টই আছে, তাও পড়ি।"

সরমা বলিল, "তা বেশ তো ! এক কাজ করুন না, আপনি আমার অংশীদার হ'য়ে কাজ করুন না কেন। আমি টাকা দেব, আর আপনার কাছে ক্রমে কাজ শিখবো। আর আপনি হবেন ম্যানেজিং পার্টনার। আমরা দুজনে মিলে সব কাজ ক'রবো।"

নিরুপম আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। অজয়ের দিকে চাহিয়া সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। তার পর সে শুনিল সরমা বলিতেছে "আমরা দুজনে মিলে সব কাজ ক'রবো!" উৎসাহে প্রীতিতে তার মুখ চোখ উদ্ভাসিত। নিরুপমের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। সে বাহির হইয়া যাইবার জন্য এক পা পিছাইতেই সরমা তার দিকে চাহিল।

তখন কঠোর সৌজন্যের সুরে নিরুপম বলিল, "আসতে পারি ? আপনাদের disturb করি নি তো ?"

সরমা উঠিয়া হাসি মুখে নিরুপমকে সম্ভাষণ করিল। সে বলিল, "এই যে, আসুন। কি সৌভাগ্য। চলুন আপনাকে মার কাছে নিয়ে যাই, তিনি আপনার জন্য সেদিন কত দুঃখ ক'রছিলেন। অজয় বাবু, বসুন আপনি একটু।"

লক্ষ্মী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গমুরারী রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বলিয়া সরমা নিরুপমকে ভিতরের একটা ঘরে সুনীতির কাছে লইয়া গেল। সেখানে এক দণ্ড দাঁড়াইয়া তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া সে বলিল, "আপনারা কথাবার্ত্তা বলুন, আমি এক্ষুণি আসছি অজয় বাবুর সঙ্গে কাজটা সেরে।" নিরুপমের মুখ আরও মেঘাচ্ছন্ন হইল।

অজয়ের কাছে ফিরিয়া সরমা বলিল, "কি বলেন, এই প্ল্যানটাই ভাল হবে না?"

অজয় সামান্য একটু হাসিয়া বলিল, "প্ল্যান হিসাবে এটা মন্দ নয়, কিন্তু এ হতে পারবে না। আমার কার-বারের সঙ্গে আপনি মিশতে পারবেন না।"

"কেন? জিগ্‌গেস ক'রতে পারি কি?"

"সে অনেক কথা। একদিন আপনাকে জানাব। কিন্তু এ প্রস্তাব অনুসারে আমার কাজ করা একেবারে অসম্ভব।"

সরমা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, কিছু বলিল না।

অজয় বলিল, "তবে আমি এখন আসি, আপনার কাছে ঐ ভদ্রলোক এসেছেন—"

"না বসুন, একটু চা খেয়ে যান—ও হরি, আপনি তো চা খান না আবার। আচ্ছা আপনি চা খান না কেন? আমাকে সেদিন ব'ল্লেন না, আজ না ব'ল্লে ছাড়বো না।"

অজয় বলিল, "আমি একটা প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, সেইজন্য খাই নি।—"

"সে তো শুনেছি, কি সে প্রতিজ্ঞা?"

"প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার সব দেনা শোধ ক'রতে না পারবো, যাকে যাকে ঠকিয়েছি তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ক'রতে না পারবো, ততদিন কোনও বিলাসদ্রব্য ব্যবহার ক'রবো না।"

সরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "এখন তো আপনার সব দেনা শোধ হ'য়ে গেছে, হীরালাল আগরওয়ালার টাকাও দেওয়া হ'য়ে গেছে—এখন তো আপনার চা খেতে বাধা নেই।"

"না, প্রতিজ্ঞার বাধা নেই—তবু দেখছি, এমনি বেশ চ'লে যাচ্ছে, কেন আর মিছে অভাব বাড়ান।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সরমা কাতরকণ্ঠে বলিল, "বেশ চ'লছে। একে বলেন আপনি বেশ চলা! আপনার মত সুখী লোক, এমনি দীনভাবে দিনরাত্রি,—রাত দুটো পর্য্যন্ত—হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে চালাচ্ছেন—একে বলেন বেশ চলা।" তার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে কিছুতেই তার অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

অজয় উঠিয়া বলিল, "মাপ ক'রবেন, আমি এখন উঠি।"

সরমা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি চ'ক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "দাঁড়ান, একটা কথা শুনে যান। আগে আমি আপনাকে অনেক দিন অনেক শক্ত কথা ব'লেছি—অনেক মন্দ ভেবেছি আপনাকে। আপনি আমাকে সে সবের জন্য ক্ষমা ক'রবেন। আমি তখন বুঝতে পারি নি যে—"

বাধা দিয়া অজয় বলিল, "আপনাকে ক্ষমা ক'রবো? আপনি আমার গুরু! আমার জ্ঞানচক্ষু আপনি ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। যখন আমার হঠাৎ বিপদ হ'ল, পালিয়ে গেলাম, জানেন তখন কোন্ কথাটা মনে হ'য়ে আমার জীবনের গতি ফিরে গিয়েছিল? আপনি একদিন আমাকে ব'লেছিলেন, 'যাদের ভিতর পদার্থ নেই তারাই কাপড় চোপড় নিয়ে বাড়াবাড়ি করে—যাদের পদার্থ আছে তাদের ওতে কিছু আসে যায় না। ময়ূরের পেখম নইলে চলে না, কিন্তু কোকিলের পেখম ছাড়াও দিব্যি চ'লে যায়।' সেই কথায় আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেল। বাইরের চট তুচ্ছ ক'রে ভিতরের শাঁসটা অর্জ্জন করবার জন্য আপনাকে নিযুক্ত ক'রলাম। আপনি আমার এ মন্ত্রের গুরু!"

অজয় নমস্কার করিয়া বিদায় হইল। সরমা অনেকক্ষণ তার দিকে চাহিয়া রহিল। তার দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

অজয়ের ট্যাক্সি চলিয়া গেলে সরমা মুখ চোখ বেশ করিয়া মুছিয়া ভিতরে নিরুপমের কাছে গেল।

নিরুপম তীব্রদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সরমার মুখে রুদ্ধ আবেগের স্পষ্ট ছাপ তখনও লাগিয়া ছিল। চোখ দেখিয়াই বোঝা গেল সরমা কাঁদিতেছিল।

সরমা নিরুপমের সঙ্গে কথা জমাইতে পারিল না। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিল সহজভাবে কথা কহিতে, এক আধটা পরিহাসেরও চেষ্টা করিল, কিন্তু বুকের ভিতর তার করুণাময় অন্তর হাহাকার করিতেছিল, তাহাকে চাপিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ সহজভাবে কথা কহিতে পারিল না।

নিরুপমের মনের ভিতর গর্জ্জন করিতেছিল নিদারুণ ক্রোধ ও হিংসা। অপমানে সে জর্জ্জরিত হইতেছিল। তবু সে চেষ্টা করিয়া সৌজন্যের আবরণ রক্ষা করিয়া দুই চারটা কথা বলিল।

নিরুপমের মনে হইতেছিল, কি ভয়ানক কপট এই নারী। অজয়ের প্রতি সে আসক্ত; কিন্তু সেই গোপন প্রেমকে ঢাকা দিয়া সে মায়াকে পর্য্যন্ত ভুলাইয়া রাখিয়াছে। আর জানিয়া শুনিয়া গোপনে অজয়ের সঙ্গে প্রেমসম্পর্কে লিপ্ত থাকিয়াও সে নিরুপমকে খেলাইয়া তাকে প্রলুব্ধ করিতে কুণ্ঠিত নয়। রাগে তার মনটা ফুলিতেছিল; কিন্তু সেদিনকার মত সে সংযম হারাইল না। বিশেষতঃ সুনীতি সামনে বসিয়া থাকায় সে মনের ভাব আরও প্রবল-বেগে চাপিতে বাধ্য হইল।

কথাবার্ত্তা জমিল না। অমনি এক রকম ভাসাভাসা-ভাবে দুই চারটা কথা বলিয়া সরমা চা আনিতে উঠিয়া গেল। চা তৈয়ারী করিয়া সে নিরুপমকে দিল। নিরুপম বিনা বাক্যে চা পান করিল, সরমাও খাইল।

তার পর নিরুপম বলিল, "আজ তবে উঠি।"

সরমা বলিল, "এখনি যাবেন?"

নিরুপম বলিল, "হ্যাঁ, যাই। একটু দরকার আছে ভবানীপুরে।"

সরমা পীড়াপীড়ি করিল না। অজয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া তার মনটা বড় ভার হইয়া ছিল। সেও একটু নিরিবিলি থাকিবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

নিরুপমের সঙ্গে উঠিয়া সে ফটক পর্য্যন্ত গেল। সেই পথটুকুর বেশীর ভাগ দুজনে নীরবেই চলিল। দুই একটা উড়ো উড়ো কথা হইল। সরমা ভাবিয়াছিল এই সুযোগে নিরুপম হয় তো তার কাছে আবার বিবাহের প্রস্তাব করিবে। প্রস্তাব করিলে সে সম্মতি জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তবু, নিরুপম যখন সে কথা না তুলিয়াই চলিয়া গেল, তখন সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যেন বলির পশুর মত সে হাড়িকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া ছিল—প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

নিরুপম চলিয়া গেলে সরমা একলা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। যতই ভাবিল ততই দুঃখে তার প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অজয় তার চক্ষে প্রকাণ্ড, মহান হইয়া উঠিল। অজয়ের চরিত্র-গৌরব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাকে মুগ্ধ করিল। একটা নূতন গৌরবের জ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়া অজয় আজ তার মনশ্চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

অজয় মানুষ—পুরুষের বাচ্ছা।

অজয় বলিল, সরমা তার গুরু। সরমার একটা কথায় তার জীবনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া সরমা আত্মপ্রসাদ লাভ করিল, কিন্তু দুঃখে তার মন ভরিয়া গেল। অজয় যে চরিত্র-গৌরব লাভ করিয়াছে তাতে সে তৃপ্তি লাভ করিল, কিন্তু সে গৌরবের জন্য ইচ্ছা করিয়া এতটা দুঃখ বরণ করিবার কি প্রয়োজন ছিল। সরমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সে যদি তার টাকা লইয়া ব্যবসা করিত তবে সে বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত। তাতে কোনও হানি ছিল না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীই তো এমন করিয়া থাকে। কিন্তু তার কাছে এই সামান্য সহায়তাও সে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিল না।

কেন? কিসের জন্য তার এই আত্মনিপীড়ন?

সরমার মনে হইল ইহার কারণ আর কিছুই নয়—ইহা তার বঞ্চিত প্রেমের হতাশা।

এ কাঁটা তার মন হইতে কেমন করিয়া উৎপাটন করিবে সরমা?

একটা সম্ভাবনা তার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। যদি এমন কোনও নারী তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে, যার ভালবাসা পাইয়া অজয় মায়ার প্রেমে বঞ্চিত হইবার ক্ষতি পূরিত জ্ঞান করিতে পারে, তবে দূর হইতে পারে তার ব্যথা। আর—তার মনে হইল যে তেমন নারী—সুধু সে নিজে।

সরমাই চেষ্টা করিয়া মায়াকে অজয়ের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। সে নিজে তাকে তেমনি ভালবাসা দিয়া তার অপকারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে, অজয়কে তৃপ্ত করিতে পারে।

কেন সে তাহা করিবে না? এত বড় একটা দুঃখ অজয়ের সে আপন হাতে তাকে দিয়াছে, সে দুঃখ নিবারণের অমোঘ ঔষধ আছে তার নিজের হাতে। সেই মহৌষধ বিতরণে কৃপণতা করিবে সে?

কথাটা সরমা মনের ভিতর বসিতে দিল না। কিন্তু তাহা তার সম্বিতের চারি পাশে ঘুরিতে লাগিল।

পরের দিন সকালে উঠিয়া সেই ঘরে আসিতেই তার মনে হইল অজয়ের কথা। ঐখানে ঐ চেয়ারে সে ম্লান মুখে বসিয়া ছিল। তার সুন্দর মুখমণ্ডলে এমন একটা প্রশান্ত স্নিগ্ধ বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল যে, সে মুখ দেখিলেই তার প্রতি সমবেদনায় প্রাণ ভরিয়া উঠে। সে মুখের ছবি এখনও সরমার মনের ভিতর জ্বল জ্বল করিতেছিল। সরমা তার চক্ষের সম্মুখে কেবলি দেখিতেছিল অজয়ের সেই কাতর চক্ষু দুটি, তার বিষাদছায়াচ্ছন্ন মুখখানি! অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া সে ব্যথার সহিত অজয়ের সেই মূর্ত্তির ধ্যান করিতে লাগিল।

তার চিত্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল করুণায়, হৃদয় ছাইয়া গেল এই হতাশ প্রেমিকের প্রতি স্নেহে। মনে হইল অজয়ের মনের ভিতর হইতে এই মর্ম্মপীড়া উৎপাটিত করিবার জন্য বুঝি সে সব করিতে পারে।

বিবাহ করিতে পারে কি? এই প্রশ্নের কল্পনায় তার মনের কোনওখানে সে কোনও বাধা অনুভব করিল না। বরং তার মনে হইল সে তার চিরজীবনের স্নেহ দিয়া, সেবা দিয়া, প্রীতি দিয়া অজয়ের মন হইতে তার নষ্ট সৌভাগ্যের এই ব্যথা দূর করিয়া দিতে পারে।

অনেকক্ষণ সে কথাটা ভাবিল। অজয়কে তার বিবাহ করিবার পথে কোনও বাধা সে অনুভব করিল না। একবার তার মনে হইল যে অজয়ের সঙ্গে তার দেখা হইবার পরই তার নামে নিরুপম যে কথাটা রটনা করিয়াছিল, সেটা বুঝি বা আগামী ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী ছায়া মাত্র। বুঝি ইহাই ভগবানের মনে ছিল, তাই এমনি করিয়া মিথ্যার ভিতর দিয়া কথাটা রটিয়া গিয়াছিল। আরও মনে হইল যে, হীরালালের কাছে সে যে মিথ্যা অভিনয় করিয়াছিল, তার মাঝেও বুঝি এই বিধি-নির্দ্দেশের আভাস ছিল! ভাবিতে তার হাসি পাইল।

কোনও বাধাই কি নাই? সর্ব্বান্তঃকরণে সে কি অজয়ের পত্নী হইতে পারে? মনে হইল অভয়কে সে ভালবাসিয়াছে—এখনও তার কল্পনায় হয় তার আনন্দ, তার সম্ভাষণে হয় তার উল্লাস, তার ক্বচিৎ অঙ্গস্পর্শে হয় অপূর্ব্ব পুলক! পরের প্রতি এই ভালবাসা লইয়া সে অজয়কে কি দিতে পারিবে? দিবে সেবা, প্রীতি, স্নেহ—কিন্তু প্রেম?

অনেকক্ষণ তার অন্তরের তলে অনুসন্ধান করিয়া সে ভাবিল হয় তো সে পারিবে। হয় তো এখনি সে অজয়কে ভালবাসিয়াছে। হয় তো এই কথাটাই সত্য যে, সে অভয় ও অজয় দুজনকেই ভালবাসে!

এ কথা মনে হইতে সে বিরক্ত হইল। ছি! কি ঘৃণার কথা! কিন্তু তবু, তার মনে হইল, যতই লজ্জার কথা ইহা হউক, কথাটা সত্য!

কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সরমা ভাবিল, এ চিন্তার কোনও সার্থকতা নাই। কেন না, অজয়ের চরিত্র সে যতদূর বুঝিয়াছে তার সঙ্গে সরমার বিবাহে সে কিছুতেই সম্মত হইবে না। সে সরমাকে কেবল দু' হাতে সরাইয়া রাখিতে ব্যস্ত। তার কাছে কোনওরূপ সাহায্যই সে লইতে চায় না, তার সঙ্গে দেখা করিতে পর্য্যন্ত অজয়কে সহজে সম্মত করান যায় না। কোনও রকম ঘনিষ্ঠতাকে সে আমল দিতে চায় না। সে কেবল তার অভ্যস্ত সৌজন্যের সহিত সরমাকে যথাসম্ভব তফাতে সরাইয়া রাখিতে চায়। সুতরাং অজয়ের সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ স্থাপনের আশা সুদূর-পরাহত।

তবে কি অজয় সুধু জীবনে একবার ভুল করিয়াছিল বলিয়া চিরকাল তার জীবনকে এমনি ছন্নছাড়া করিয়া রাখিবে, অযথা এমনি সে আপনাকে কষ্ট দিবে?

ভাবিতে সরমার হৃদয় চুরচুর হইয়া গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে সরমার অভয়ের ল্যাবরেটারীতে কাজ আরম্ভ করিবার কথা। সে আহারান্তে সেখানে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ পারিল সে ল্যাবরেটারীতে কাজ করিল। অভয় তার পাশে থাকিয়া সব বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিল।

অভয়ের পাশে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে তার চিত্ত প্রবল ভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছিল, সমস্ত দেহ তার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, কতক আবেগে, কতক সে আবেগ প্রকাশ হইয়া যাইবার আশঙ্কায়।

সরমা একটা টেষ্ট টিউবে করিয়া একটা পদার্থ গ্যাসের উপর ধরিয়া গরম করিতেছিল। অভয় আর একজন সহকর্ম্মীর কাজ দেখিবার জন্য একটু সরিয়া গিয়াছিল। সরমা টেষ্ট টিউব লইয়া নাড়াচাড়া করিতে

করিতে চোখ ফিরাইয়া একবার অভয়ের দিকে চাহিল—টেষ্ট টিউবের ভিতর হইতে কতকটা পদার্থ তাহাতে পড়িয়া গেল। অভয় তখন ফিরিতেছে। সে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "সাবধান—প'ড়ে যাচ্ছে।"

সরমা তাড়াতাড়ি সেদিকে চাহিয়া দেখিল। তার এই ত্রুটিতে সে লজ্জিত হইয়া এতটা ঘাবড়াইয়া গেল যে তার হাত হইতে টেষ্ট-টিউবটি হঠাৎ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অভয় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "Very bad! নষ্ট ক'রে ফেললেন!"

সরমা আরও লজ্জায় মরিয়া গেল।

এমনি একটা কাণ্ড আর কেউ করিলে অভয় ক্ষেপিয়া উঠিত। কিন্তু সরমার কাছে আসিয়া অভয় আত্মসংবরণ করিয়া সহজ সুরে বলিল, "এঃ আপনার Practicalএর হাত তো বড় কাঁচা!"

শুনিয়া সরমার কান্না পাইল। Practicalএর হাত তার খুব ভাল বলিয়া সে শিক্ষকের কাছে এত দিন প্রশংসা পাইয়াছে। আর তার এ বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া অভয়ের কাছে প্রশংসা আদায় করিবার জন্য তার লোভের অন্ত ছিল না। সেই অভয়ের সম্মুখে আজ প্রথম দিনে সে এ কি কাণ্ড করিয়া বসিল। আর, অভয় বলিল কি না তার হাত কাঁচা! এ দুঃখ যে তার রাখিবার ঠাঁই নাই।

সেদিনকার কাজ কোনও মতে শেষ করিয়া যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন তার মাথার ভিতর কেবলি ধ্বনিত হইতে লাগিল, অভয়ের সেই তীব্র গর্জ্জন—"Very bad—নষ্ট ক'রে ফেললেন"; আর তার সেই সমালোচনা—Practicalএর হাত তার কাঁচা। দুঃখে তার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। অশ্রু সে রোধ করিতে পারিল না। সে ভাবিল, আজ তাকে কিসে পাইয়াছিল। এমন একটা সাধারণ কাজ যাহা সে ল্যাবরেটারীতে রোজ অন্ততঃ পঞ্চাশবার করিয়াছে, সেই কাজটায় সে এমন অসাবধানতা করিয়া ফেলিল। ছি ছি! অভয় তাকে কত প্রশংসা করে, সেই প্রশংসা তার প্রাণে যে কি অমৃত ঢালিয়া দেয় তা' তো জগতে কেউ জানে না। ইহার পর আর কি তেমন বড় করিয়া অভয় তাকে দেখিতে পারিবে। এই সামান্য অনবধানতায় সে অভয়ের শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, অভয় হয় তো এখন তাকে একটা সামান্য মেয়ে বলিয়া মনে করিতেছে। যার সমাদর তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার কাছে আজ এমনি খাটো হইয়া তাই তার কান্না পাইল।

মন ভার করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। দেখিতে পাইল তার নামে একখানা চিঠি আছে। চিঠি লিখিয়াছে অজয়। সরমা পড়িল,

"করুণাময়ী,

"আপনার সঙ্গে কথা কহিবার সময় আমি আপনার অংশীদার হইবার প্রস্তাব অস্বীকার করিয়াছি, কিন্তু তার কারণ আপনাকে বলি নাই। এখন মনে হইতেছে আপনি হয় তো ভুল বুঝিতে পারেন এবং হয় তো আমাকে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করিতেছেন। তাই কারণটা আপনাকে জানাইতেছি।

"আপনার কাছে আমার ঋণের অন্ত নাই। আপনি তিরস্কার করিয়া আমাকে নবজীবন দিয়াছেন, করুণা করিয়া আমাকে কারাগার হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আমার মত ঘৃণ্য অপরাধীকে যে এতখানি করুণা মানুষে করিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না। আপনার ভগ্নীর প্রতি স্নেহে এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে দুঃসাহসের কাজ করিয়াছেন, যে লজ্জার বোঝা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সে সুধু দেবতারই সম্ভব।

"সুতরাং আমি যদি কোনও মতে, সহস্র ক্ষতি করিয়াও আপনার কোনও উপকার করিতে পারিতাম, তবে আমি কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু দয়াময়ী, আপনি হীরালালকে বঞ্চনা করিতে পারেন, আমাকে ঠকাইতে পারিবেন না। আপনি যে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া নিজের স্বার্থের জন্য ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এ কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। আমি বুঝিয়াছি এই ব্যবসায় উপলক্ষ্য করিয়া ঐ টাকা দিয়া আমার অবস্থার উন্নতি করিতে সহায়তা করিতে চান।

"সেইজন্য আমি উহা লইতে পারিলাম না। আমি শপথ করিয়াছি, কেবলমাত্র নিজের শক্তি ও সাধ্যে যাহা উপার্জ্জন করিতে পারি তার চেয়ে বেশী উপার্জ্জনের লোভ করিব না। পরের কাছে কোনওরূপ অর্থসাহায্য লইব না, পরের পয়সা লইয়া ব্যবসা করিব না, এবং ধারে কোনও কারবার করিব না। ভগবানের অনুগ্রহে এই প্রতিজ্ঞা এই তিন বৎসর পালন করিয়া আসিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আর কোনওরূপ সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়া আমাকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিবেন না।

"আপনার ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে বড় কঠিন। কেন না আমার বর্ত্তমান জীবনের সবই আপনার দয়ার দান—আপনার কাছে ভিক্ষা লইব না বলাটা বড় স্পর্দ্ধার কথা হয় এবং তাহা বলিতে বড় কুণ্ঠা অনুভব করি। আশা করি আপনি আর এমন প্রস্তাব করিয়া আমাকে কুণ্ঠিত করিবেন না।

চির কৃতজ্ঞ
অজয়।"

বস্! মিটিয়া গেল। ইহার পর সেবা ও প্রীতি দিয়া তার দুঃখের জীবন হইতে অজয়কে মুক্তি দিবার কোনও সম্ভাবনাই তার রহিল না। অভয়ের কাছে সমাদর পাইয়া জীবন চরিতার্থ করিবার যে আশা সে করিয়াছিল, তাহাও আজ চুরমার হইয়া গিয়াছে। তবে কি তার ব্যর্থ জীবন সুধু শূন্য হইয়া থাকিবে?

আর একদিন তার মনে হইয়াছিল যে, তার অদৃষ্ট যেন চারিদিক দিয়া ধাক্কা দিয়া তাকে নিরুপমের কোলে ঠেলিয়া দিতেছে। আজও তার সেই কথাই মনে হইল। মনে হইল, জীবনে আর কোনও পথই তার মুক্ত নাই, তার তুচ্ছ জীবন আরও শত শত তুচ্ছ নারীর মত একটা বোঝার মত বহিয়া বেড়াইতে হইবে,—বুঝি ঐ নিরুপমের প্রেমহীন পত্নী হইয়া।

পরিপূর্ণ হতাশার সহিত এই নিয়তির হাতে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া সে তার বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া সে ভাবিল—বিছানায় শুইয়া ভাবিল তার বর্ত্তমান জীবনে ঘনীভূত জটিল সমস্যার কথা! যে কথা সে বহুবার ভাবিয়াছে সেই সমস্ত কথাই আবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া সে ভাবিল। অভয়—অজয়—নিরুপম পর পর তার চিন্তা অধিকার করিল, একসঙ্গে ভিড় করিয়া তারা অধিকার করিল! ঘুরিয়া ফিরিয়া সে একই কথা বার বার ভাবিল—অভয়ের কথা, অজয়ের কথা, নিরুপমের কথা।

শেষে পরিশ্রান্ত হইয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল। ঘুম তার চক্ষে আসিল না। অভয়, অজয়, নিরুপম তার মাথার ভিতর শত সহস্র বিচিত্র ভাবে চক্রের মত ঘুরিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। আলো জ্বালিয়া সে একখানা বই লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। পড়িল, কিন্তু কথাগুলি মাথায় ঢুকিল না, মাথায় ঘুরিতে লাগিল, অভয়, অজয়, নিরুপম!

"দূর কর ছাই!" বলিয়া সে বইখানা ফেলিয়া উঠিল।

এ কি দুর্ভাবনা এই কয়দিনের মধ্যে তার মাথার ভিতর তালগোল পাকাইয়া উঠিয়াছে! তার মনে হইল যে গত সাত আট দিনের ভিতর সে পড়াশুনা করিয়াছে খুব কম—চিন্তা করিয়াছে খুব বেশী; আর তার চিন্তার বিষয় হয় অভয়, না হয় অজয়, না হয় নিরুপম! তিনটি পুরুষ—তিনটি যুবক!

এরা তিনজনে মিলিয়া এই কয় দিনের মধ্যে তার মনের মধ্যে কি যে এক প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে, তার ঠিকানা নাই। আর কোনও চিন্তাই তার নাই—সুধু এক কথা—তার এই রূপ যৌবন, তার বুকভরা ভালবাসা, ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা, এই সব সে কার হাতে তুলিয়া দিবে। এইটাই যেন তার নারী-জীবনের একমাত্র সমস্যা, ইহার পূরণেই যেন তার নারী-জীবনের একমাত্র সার্থকতা।

তার মনে পড়িল, সাত দিন আগে সে এই সমস্যাটাকে এত বড় করিয়া দেখে নাই—ইহার কথা, বলিতে গেলে ভাবেই নাই। এই যে পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থকতা লাভ করিবার আদর্শ কত তুচ্ছ, কত নগণ্য বলিয়া সে ইহাকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করিয়াছে। নারী-জীবনের কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আদর্শ লইয়া তার জীবন নিয়মিত করিবার কল্পনা করিয়াছে। জীবনব্যাপী অবিচলিত জ্ঞানসাধনায় আত্মসমর্পণ করিয়া গৌরব লাভ করিবার, চরিতার্থ হইবার কত না সঙ্কল্প করিয়াছে। সেই সব আদর্শে কি তৃপ্তি, কি শান্তি, কি আনন্দ সে পাইয়াছে চিরদিন।

এই সাত আট দিনের মধ্যে হঠাৎ তার মনের মধ্যে এ কি নিদারুণ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল যে, তার চিরপোষিত এই মহীয়ান আদর্শ একেবারে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়া

তার চিত্তপটের অগ্রভাগ ভরিয়া ফেলিল সুধু এই তিনটি পুরুষ!

মনে হইল কি অপদার্থ সে! কি তুচ্ছ সামান্য নারী। এত লেখাপড়া শিখিয়া, এত বড় বড় আদর্শের সন্ধান পাইয়া, এমন সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আজ কি রামী শ্যামী বামার মত, সাধারণ তুচ্ছ নারীদের মত চরিতার্থতা খুঁজিতে বসিয়াছে সুধু পুরুষ-সংসর্গে! আর একটা এত তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার তার জীবনে হঠাৎ এত বড় হইয়া উঠিয়াছে, যে ইহার ভাবনায় দিনরাত তার মনটা কাটা-ছেঁড়া হইয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে!

প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, কিছুতেই নয়! এমনিভাবে তুচ্ছ নারীর মত পুরুষের চিন্তাকে সে তার জীবনে প্রবেশ করিতে দিয়া জীবনটা ছারখার হইতে দিবে না। ও-পথ তার পথ নয়, ও-পাঠ তাহার নয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত পুরুষকে মন হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া সে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পূর্ব্বের মত বিজ্ঞানের সেবা করিবে। অভয়—অজয়—নিরুপম কাউকে সে তার চিন্তার মধ্যে এক ফোঁটা স্থান দিবে না!

প্রতিজ্ঞা করিয়া সে স্থির হইয়া পড়িতে বসিল। মনটা বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত সে সকল চিন্তা মন হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে পাঠ্য-বিষয়ে মনোনিবেশ করিল। ক্রমে বইয়ের উপর তার মন বসিয়া গেল। এক ঘণ্টা মনঃসংযোগ করিয়া পড়িয়া সে বই রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণ মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

(১৩)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সরমা মুখ হাত ধুইয়া চা খাইয়া তার বই-খাতা লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া পড়িতে বসিল। বেলা দশটা পর্য্যন্ত সে একাগ্রচিত্তে পড়িল বাইও-কেমিষ্ট্রীর একখানা বই। সে বইয়ের প্রায় একশত পাতা পড়িয়া ফেলিল এবং তার মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে সে তার খাতায় নোট করিল। বিশেষ ভাবে যে যে বিষয় তার আজকার Experimentএর জন্য প্রয়োজন সেইগুলি সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নোট করিল।

তার পর স্নানাহার করিয়া সে অভয়ের বাড়ী গেল। সে উপরে গেল না। সোজা গিয়া ল্যাবরেটারীতে প্রবেশ করিল।

অভয় তখন একটা পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন ছিল। আজ সকালে সে এ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছে; এখন পর্য্যন্ত স্নানাহারের অবসর পায় নাই। সরমা অভয়কে দেখিল, অভয় লক্ষ্য করিল না। অভয়ের এই সাধনা-মগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত সরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তার পর জোর করিয়া চোখ ফিরাইয়া সে আপনার জায়গায় গেল।

অভয় তার Experimentএর সহায়তার জন্য কতকগুলি নোট করিয়া রাখিয়াছিল। সরমার ড্রয়ারেই সে নোট ছিল। সরমা তাহা বাহির করিল না। আজ নিজে সে বাড়ী হইতে যে নোট করিয়া আনিয়াছিল তাহা লইয়া সে তার পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর অভয় তার স্থান ছাড়িয়া উঠিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে দেখিল বারটা বাজিয়া গিয়াছে। অভয়ের দুইটি সহকর্ম্মী তখন আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, অভয় তাহাদের একজনকে ডাকিয়া তার Experimentটা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নোট করিতে বলিয়া ত্রস্তেব্যস্তে স্নানাহার করিতে গেল।

একবার সরমার দিকে চাহিয়া সে বলিল, "এই যে আপনি এয়েছেন। আমি এক্ষুণি আসছি, ততক্ষণ আপনি সব যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক ক'রে নিন।"

সে চলিয়া গেল। সরমা একাগ্রতার সহিত তার Experiment করিয়া গেল।

আহারান্তে অভয় যখন ফিরিয়া আসিল তখন সরমার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। অভয় তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সরমা সামান্য ভাবে তাকে সম্ভাষণ করিয়া তার কাজ করিয়া গেল। অভয় দেখিতে লাগিল।

সরমা মন শক্ত করিয়া অবিচলিত স্থৈর্য্যের সহিত তার কাজ করিয়া গেল। কোনও ভুল-চুক হইল না; খুব জটিল সে পরীক্ষা, কিন্তু তাহা সে অনবদ্যভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া সম্পন্ন করিল। বেলা তিনটার সময় তার পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। অভয় দুই তিনবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিল। সমাপ্ত হইলে সরমা পরীক্ষার ফল নোট করিয়া অভয়কে দেখাইল।

অভয় উল্লসিত হইয়া বলিল, "অতি চমৎকার হ'য়েছে।

কাল বোধ হয় আপনি বড় Nervous হ'য়ে গিয়েছিলেন। আজ তো দেখলাম ভারী পরিষ্কার আপনার হাত।"

সরমার চিত্ত এ প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই পরীক্ষার সম্পর্কে তার মনে কয়েকটা প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল, সে তাহা অভয়কে জিজ্ঞাসা করিল। একটা কথা শুনিয়া অভয় বলিল, "তাই তো, এ কথা তো ভাববার কথা। আমার এ কথা মনেই হয় নি। আচ্ছা, আমি এ কথা ভেবে দেখবো।"

সরমা আরও খুসী হইল। সে তার খাতাপত্র গুছাইয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

মায়া তখন তার ছেলের বেশ-ভূষা করিতেছে। সরমাকে দেখিয়া বলিল, "তুই কখন এসেছিল? উপরে আসিস নি যে এতক্ষণ।"

"না ভাই, আজ একেবারে ল্যাবরেটারীতে গিয়েছিলাম। আমি এখন যাচ্ছি ভাই—বাড়ীতে কাজ আছে।"

মায়া বলিল, "দাঁড়া, তোর সঙ্গে কথা আছে। খোকাকে এই জামাটা পরিয়ে আসছি।"

সরমা একটু অপেক্ষা করিল। মায়া খোকার সাজ-গোজ সারিয়া তাকে চাকরের হাতে দিয়া সরমাকে বসাইয়া বলিল, "আচ্ছা তোদের কি হ'য়েছে বল তো? ঠাকুরপো রেগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে র'য়েছে—কি ব্যাপারখানা বল তো?"

সরমা বলিল, "ব্যাপার কি তা' আমি কেমন ক'রে ব'লবো। যে রেগেছে তাকে জিগ্‌গেস্ কর গে। তার মনের খবর আমি জানবো কি ক'রে?"

"তাকে জিগ্‌গেস্ ক'রে উত্তর পাই নি, তাই জিগ্‌গেস্ ক'রছি। কা'ল এসেছিল, আমি তোর নাম ক'রতেই সে ব'ল্লে, 'বউদি মাপ ক'রো, তোমার দিদির নাম আমার কাছে ক'রো না। আমি তার সম্বন্ধে কোনও কথা আলোচনা ক'রতে চাইনে।' আমি জিগ্‌গেস্ ক'রলাম 'কেন? কি হ'য়েছে?' সে ব'ল্লে 'কিছু হয় নি, কিন্তু কোনও কথা জিগ্‌গেস্ ক'রো না। যদি কর তবে বল আমি উঠি।' কি ব্যাপার বল তো?"

সরমা বলিল, "সত্যি বলছি, ব্যাপার আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না। তার সম্বন্ধে শেষ খবর আমি এই জানি যে সে গিয়েছিল পরশু দিন আমার কাছে। চা খেয়ে খানিকক্ষণ গল্প সল্প ক'রে চ'লে এয়েছে। এর বেশী আমি কিছু জানি না।"

মায়া বলিল, "অবাক কাণ্ড! এ সবের মানে কি কিছু যদি বুঝে থাকি। তরশুদিন এসে আমার কাছে কত কান্নাকাটি ক'রলে, আমার তো মনে হ'ল ও তোর জন্যে ম'রে যাচ্ছে। পরশু গেল, চা খেয়ে এলো, আর কা'ল সন্ধ্যে বেলায় চটে গেল! না ভাই, এর একটা ব্যবস্থা ক'রতে হবে। আমি খুব জোর ক'রে ব'লতে পারি, একটা কিছু ভুল হ'য়েছে তার। নইলে সে তোকে সত্যি সত্যি বড্ড ভালবেসে ফেলেছে।"

সরমা বলিল "থাম ভাই, ও কথায় আর কাজ নেই। সে ভাল বাসুক না বাসুক, রাগুক চটুক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আমি একেবারে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি ওসব কথাই আর আমি কইব না। পুরুষ মানুষের কথা বা চিন্তা মনের আশে পাশে আসতে দেব না। তোকেও বলে রাখছি, তুই কোনও পুরুষ মানুষের কথা আমার কাছে কইবি না। আমি জীবনের ব্রত ক'রেছি বিজ্ঞানের সাধনা, ওই সব চিন্তায় সময়ের বাজে খরচ ক'রে আমি মনটাকে বিক্ষিপ্ত হ'তে দেব না।"

মায়া বলিল, "নে, নে, ও সব বক্তৃতা রাখ। অমন বক্তৃতা ঢের শুনেছি তোর মুখে বরাবর—আর তার পরই দেখেছি ওঁর জন্যে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে। তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, ও-সব নেকামী রাখ।"

"নেকামী নয় ভাই, এ আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। কোনও পুরুষ মানুষকে আমি আর আমার কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছি নে!—ওরা ভারী উৎপাত করে। কারো সঙ্গে যদি একটু হেসে কথা কইলাম, সে একেবারে ঘাড়ে চ'ড়ে ব'সবে—না যদি কইলাম কথা একদিন, রেগে যাবে, না হয় কেঁদে কান ঝালাপালা ক'রবে। ওরা ধ'রেই নিয়েছে যে ওদের ছাড়া আমাদের চ'লবে না। আর ওদের ভাবনা চিন্তা করা ছাড়া যেন আমাদের গতি নেই। সবার সম্বন্ধে যে সে কথা ঠিক নয় সেই কথাটা আমি প্রমাণ ক'রতে চাই। এইবার দেখিস, কেউ যদি আমার কাছে এগোয় তবে চাব্‌কে দূর ক'রবো।"

মায়া বলিল, "বুঝলাম, একটা ঝগড়া হ'য়েছে। আচ্ছা দেখি, আমি এর তল্লা পাই কি না? তোর কত বড়

হিম্মত যে আমার কাছে মনের কথা লুকোবি, তাও দেখে নেব।"

সরমা গম্ভীর ভাবে বলিল, "তুই তোর মনের কোণায়ও এ কথা ঠাঁই দিস নে যে আমি তোকে কোনও কথা লুকোচ্ছি। আমি সত্যি বলছি তোর ঠাকুরপোর রাগের কারণ আমি কিচ্ছু জানি না। আরও বলছি শোন, সেদিন যদি সে আমাকে বিয়ে ক'রতে চাইতো তবে আমি তক্ষণি রাজী হ'তাম। আমার বরাত জোর যে সে চায় নি। নইলে আজ হয় তো আমার কথা দিয়ে কাঁদতে হ'ত। সে চ'লে আসবার পর পর্য্যন্তও আমার সে মত বদলায় নি। বদলেছে পরে।"

"কিসে বদলাল শুনি?"

"কাল রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। ভেবে দেখলাম যে ওতে আমার সুখ হবে না। আমার মন সত্যি সত্যি চায় না পুরুষের সঙ্গ। মন চায় লেখাপড়ার চর্চ্চা ক'রতে। আমি যদি বিয়ে করি, তবে আমি আমার স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ ক'রবো। আরও ভেবে দেখলাম যে এই কয়দিন এই সব জিনিষ ভেবে ভেবে আমার অনেকটা সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে। তাই স্থির ক'রলাম, ও-সব চিন্তাই মনে আসতে দেব না, ও-প্রসঙ্গও আলোচনা ক'রবো না। তার পর থেকে আমার একটা যেন দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে। মনটা অনেকটা সুস্থ মনে ক'রছি। এখন তোকে আমার অনুরোধ ভাই, তুই আমার এই মনের শান্তিটা নষ্ট করবার কোনও চেষ্টাই করিস নে।"

মায়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, মনটা যে কত সুস্থ আছে তোর আজ সে দেখতেই পাচ্ছি। তুই আজ হাঁড়িপানা মুখ ক'রে যে সব লম্বা লম্বা বক্তৃতা করছিস তাতেই বুঝতে পারছি তোর মনটা সুস্থ নেই।"

সরমা বলিল, "নাঃ, তোর সঙ্গে পারবো না। তোর যেটা মনে হবে সে কথাটা মন থেকে সরাবে এমন পালোয়ান জন্মে নি এখনও।"

"না ভাই সে জন্মেছে। সে পালোয়ান ওই খোকা। তার জেদ আমার চেয়েও বড়। স্রেফ কান্নার জোরে ও আমার কোনও কথাই ঠিক রাখতে দেয় না।" বলিয়া মায়া হাসিল।

সরমাও হাসিল, সে বলিল, "তবে এখন আসি ভাই।"

"সে কি? এমনি যাবি কি? উনি আসুন; চা-টা খা; তার পর যাস।"

সরমা বলিল, "না ভাই যাই। অনেকটা প'ড়তে হবে আজ, তা ছাড়া আরও ঢের কাজ আছে।—তা ছাড়া তোর উনিও তো পুরুষ মানুষ!"

"ঈস্!—সেই পুরুষ মানুষের সঙ্গে তো এতক্ষণ কাটিয়ে এলি।"

"সেখানে তিনি গুরু! গুরুর স্ত্রী-পুরুষ নেই।"

বলিয়া সরমা চলিয়া গেল।

গাড়ীতে বসিয়া সরমা ভাবিল, নিরুপমের রাগ করিবার কারণটা কি? হঠাৎ তার খেয়াল হইল যে নিরুপম সেদিন গিয়া তাকে অজয়ের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছে! সে অবশ্যই তাহা হইতে অনুমান করিয়াছে যে, সরমা অজয়ের সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেছিল—অতএব ক্রোধ! কি স্পর্দ্ধা! যেহেতু নিরুপম বাবুর নজর পড়িয়াছে সরমার উপর, সেই জন্য সরমা এমনভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে যে, সে যদি অন্য কারও সঙ্গে কথা কয় কিম্বা আর কাহাকেও ভালবাসে, তবে বাবু রাগ করিবেন! ক্রোধে তার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

সরমা আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করিল, অজয়, অজয় বা নিরুপমের কথা ভাবিয়া সে তার অমূল্য সময় নষ্ট করিবে না। একাগ্র নিষ্ঠার সহিত সে তার বিদ্যার সাধনা করিবে!

চৌরঙ্গীর কাছে আসিয়া সরমার ড্রাইভার বলিল, একটা টিউব ফুটা হইয়া গিয়াছে যাইবার সময় vulcanise করিতে দিয়া গেলে ভাল হয়।

সরমা বলিল, "আচ্ছা, চল টালিগঞ্জের সেই দোকানে।"

ড্রাইভার গাড়ী লইয়া অজয়ের দোকানে গেল।

অজয় আসিয়া ড্রাইভারের নিকট হইতে টিউব লইল। সরমাকে নমস্কার করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি আমার চিঠি পেয়েছেন কি?"

সরমা বলিল, "পেয়েছি।"

"আমার পক্ষে কোনও বেয়াদবী হ'য়েছে কি?"

সরমা বলিল, "না, সে কথা কেন মনে ক'রছেন? আপনি যা লিখেছেন তার জন্য আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

অজয় স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল, যেন সে একটা মহা পুরস্কার পাইয়াছে।

সরমার মন কিন্তু তাতে বিরক্ত হইল। কেন হইল বলা কঠিন! কিন্তু সরমা সে বিরক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অজয়ের চিন্তা জোর করিয়া মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিল।

ইহার পর এক সপ্তাহ সরমা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত একনিষ্ঠ ভাবে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া গেল, অন্য কোনও চিন্তাকে সে মনে স্থান দিল না। পরীক্ষা কার্য্যে সরমার অসামান্য নিপুণতা দেখিয়া অভয় পুলকিত হইল এবং তার সে উচ্ছ্বাস বা প্রশংসা গোপন করিবার কোনও চেষ্টাই সে করিল না।

সপ্তাহান্তে একদিন সে সেদিনকার পরীক্ষা শেষ করিয়া অভয়ের লাইব্রেরীতে বসিয়া একখানা বৈজ্ঞানিক জর্ণাল পড়িতেছিল, মায়া আসিয়া তাকে বলিল, "কি ক'রছিস তুই? তোর ল্যাবরেটারীর কাজ হ'য়ে গেছে?"

"হাঁ।"

"তবে উপরে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

"আসছি ভাই, এই প্রবন্ধটা শেষ ক'রে আসি।"

"ওটা তুই বাড়ী নিয়ে যাস এখন। এখন আয়।"

ব্যগ্রভাবে সরমা বলিল, "একটু ভাই! বেশী দেরী হবে না। ভারী interesting জিনিষটা। একটু মাপ কর।"

মায়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, "কি প'ড়ছিস দেখি—এত আঠা লাগলো কিসে?"

সরমার সত্য সত্যই আঠা লাগিয়া গিয়াছিল। সে পড়িতেছিল একটী পরীক্ষার কথা, যাহাতে একটা জীবের জরায়ু কাটিয়া লইয়া সেটাকে একটা আরকে ফেলিয়া একজন বৈজ্ঞানিক তিন দিন সম্পূর্ণ সজীব ও সক্রিয় রাখিয়াছিলেন। বিষয়টি তার বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় না হইলেও ইহাতে তাহার কৌতূহল প্রবল ভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল।

মায়া প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া বলিল, "একে বলে যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। তুই ভাবছিস কি বল দিকিনি? এমনি ক'রতে ক'রতে বৈজ্ঞানিকেরা ক্রমে মায়ের পেটের বাইরে ল্যাবরেটারীতে শিশু সৃষ্টি ক'রবেন? কেন এ নিয়ে মাথা ঘামান বল দিকিনি? এমন জ্যান্ত ল্যাবরেটারী র'য়েছে তোর পেটের ভিতর, সেটাকে নিষ্কর্ম্মা করিয়ে ব'সে রাখছে যে, তার কি দরকার এ খোঁজে।"

কথাটা ভাল করিয়া সরমার কাণে ঢুকিল না। সে নিবিষ্ট ভাবে পড়িতেছিল। সে সুধু বলিল, "আর দশ মিনিট ভাই! তার পরই আসছি।" বলিয়া আবার সেই প্রবন্ধের ভিতর ডুবিয়া পড়িল।

মায়া তাকে ছাড়িল না। সে জোর করিয়া তাকে উপরে লইয়া গেল। সরমা জর্ণালখানা হাতে করিয়া গেল।

উপরে গিয়া মায়া বলিল, "আমি সব বের ক'রেছি তোদের কথা। ঠাকুরপোকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।"

সরমা বলিল, "শুনে সুখী হ'লাম, কিন্তু তাঁর দোষ-গুণের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ভাই?"

"একটু আছে বই কি? তার কথা শুনে আমার একটু খটকা লেগে গেছে। তাই তোর কথাটা শুনতে চাই। হয় তো সব কথাটাই একটা ভুল। কিন্তু তা' যদি না হয় তবে ভাবনার কথা।"

সরমা বলিল, "কোনও ভাবনার কথা নেই আমার। কেন না সমস্ত পুরুষ জাতি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কারও কিছুতে আমার কিছু আসে যায় না।"

মায়ার খোকা সেই সময় ঘরের ভিতর আসিল। সরমা ছুটিয়া গিয়া তাকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে লাগিল।

হাসিয়া মায়া বলিল, "তোর কথা যে মিথ্যে তা' প্রমাণ হ'য়ে গেল।"

"কেমন ক'রে?"

"কেন? খোকা আমার পুরুষ নয়?"

সরমা হাসিয়া উঠিল। মায়া আবার বলিল, "শোন, পুরুষের কথায় তোর না-হয় কিছুই না গেল এল, কিন্তু আমার খট্‌কাটা মিটিয়ে দে। অজয় কি এসেছিল তোর কাছে ফের।"

সরমার চক্ষে একটা তীব্র দৃষ্টি খেলিয়া গেল। সে বুঝিল নিরুপম অজয়কে উপলক্ষ করিয়া আবার মায়ার কাছে অভিযোগ করিয়াছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে মায়াকে বলিল, "হাঁ এসেছিল, তাই কি?"

মায়া বলিল, "দেখলি? আমি বলিনি! সে তোকে

ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় আছে। আস্কারা পেয়ে সে পায় পায় এগিয়ে আসছে। তুই যদি খুব শক্ত হ'য়ে তাকে ঝেড়ে না ফেলিস, তবে শেষে পস্তাতে হবে বলছি।"

সরমা কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। ক্রোধে তার অন্তর ভয়ানক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। নিরুপম যে অজয় ঘটিত সব কথা এমনি করিয়া মায়ার কাছে লাগাইয়াছে, সে কথা মনে হইতে তার নিরুপমের উপর এত দুর্জ্জয় ক্রোধ হইল যে সে কথা কহিতে পারিল না। একটু শান্ত হইয়া সে বলিল, "যা ভাবছিস তা নয় মায়া। সে যে আপনি এসেছিল তা নয়। আমি ডেকেছিলাম তাই এসেছিল।"

"তুই তাকে ডাকতে গিয়েছিলি? বলিস কি?"

"হাঁ—খুব আশ্চর্য্য হ'চ্ছিস? সব কথা যদি জানতিস তবে আশ্চর্য্য হতিস না। কিন্তু তোকে সে সব কথা ব'লে লাভ নেই। কিন্তু এই কথাটা জেনে রাখ যে আমি তাকে ডেকেছিলাম তাকে ব্যবসার জন্য কোনও গতিকে কিছু টাকা গছিয়ে দিতে—তা' সে নেয় নি। তুই তাকে যত মন্দ ভাবছিস তত মন্দ সে নয়। অন্ততঃ তোর দেওরের চেয়ে মনুষ্যত্ব হিসাবে সে অনেক উপরে উঠে গেছে।"

শুনিয়া মায়া শঙ্কিত হইল। অজয় যে ধূর্ত্ত জুয়াচোর ছাড়া অন্য কিছু এ কথা তার একবারও মনে হইল না। মনে হইল যে সে সরমাকে অনেকটা অভিভূত করিয়াছে, নতুবা সরমা তার পক্ষে এতটা টানিয়া কথা কহিত না, আর অজয়ের নিন্দার কথা উঠিতেই তার মুখ চোখ এতটা লাল হইয়া যাইত না। মায়ার কাছে এটা ভারী দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে হইল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মায়া বলিল, "অবিশ্যি তোর উপর জোর ক'রবার অধিকার নেই কারো, কিন্তু ভাই, একটা কথা তোকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। হোক অজয় বাবু হাজার ভাল লোক, কিন্তু এ তো আর ভোলবার উপায় নেই যে সে চুরী ক'রেছিল। জেল থেকে না হয় তুই তাকে বাঁচিয়েছিস, তবু চোর তো সে বটেই। তা ছাড়া লোকের কাছে তার দুর্নামের অন্ত নেই। তোর যদি সত্যি সত্যি মন শেষে এমন হ'য়ে পড়ে যে তাকে বিয়ে ক'রতে রাজী হ'স—সে কত বড় সর্ব্বনাশের কথা হবে ভেবে দেখ।"

সরমা আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। তার পর একটু শুষ্ক হাস্যের সহিত সে বলিল, "কেন? তুই যাকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপে গিয়েছিলি, আমি যদি তাকে বিয়ে করিই, এমন কি সর্ব্বনাশ হবে তাতে?"

মায়া বলিল, "সে সর্ব্বনাশ থেকে তুই আমাকে রক্ষা ক'রেছিস, আমি তোকে এ সর্ব্বনাশ থেকে রক্ষা ক'রবো।"

হাসিয়া সরমা বলিল, "সে জন্য তোর মাথা ঘামিয়ে ম'রতে হবে না। তুই এই কথাটা জেনে রাখিস যে বৌ-ছেলের সঙ্গে কোনও কারবারে আমি নেই। বিয়ে আমি কোনও দিন ক'রবো না। আর অজয়ের সঙ্গে আমার ভাবটা জানবার জন্য তোর যদি এতই আগ্রহ হ'য়ে থাকে, তবে এবার যেদিন যাবি, তার চিঠি দেখে আসিস।"

"চিঠি লিখেছে সে?" মায়া চমকিত হইয়া উঠিল। "তুইও তাকে লিখিস?"

"মাঝে মাঝে লিখতে হয় বই কি? সে সব চিঠির নকল আছে—তোকে দেখাব'খন।"

মায়া বলিল, "চল, আমি সব চিঠি দেখবো।"

সরমার সঙ্গেই মায়া বালিগঞ্জে গেল।

সরমা তাকে বলিল, "আগে আমার চিঠিগুলোর নকল দেখাই।" বলিয়া সে তার ড্রয়ার হইতে একখানা বিল খাতা বাহির করিয়া দেখাইল। মায়া দেখিল খাতাখানা পেট্রল প্রভৃতির অর্ডার বই।

সরমা বলিল, "দেখছিস কত প্রেম এতে আছে? পেট্রল তিন গ্যালন। মোবিল অয়েল এক টিন। দেখলি?"

মায়া বলিল, "রঙ্গ রাখ—সে কি লিখেছে তাই দেখি।"

সরমা কিছুক্ষণ খুঁজিয়া অজয়ের চিঠিখানা বাহির করিয়া মায়াকে দিল। মায়া নিবিষ্টভাবে পত্রখানা পড়িয়া গম্ভীর ভাবে সরমাকে ফিরাইয়া দিল।

সরমা বলিল, "এই চিঠিতে দুটো কথা প্রমাণ হ'চ্ছে। সেদিন আমাদের যে কথা হ'য়েছিল সেটা ব্যবসার কথা—প্রেমের নয়। দ্বিতীয়তঃ অজয় নিরুপমের চেয়ে ছোট লোক নয়।"

মায়া কিছু বলিল না, ভাবিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় কুস্তি ও তাহার শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

এই প্রবন্ধের কিছু অংশ ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষে" বাহির হইয়াছিল। নানা কারণ বশতঃ এতদিন পরবর্ত্তী অংশ বাহির করিবার সুবিধা হয় নাই। প্যাঁচগুলি লেখা এবং ছবির দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ভুল তুলাইবার কিছু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। আশা করি পাঠকগণ লেখা পড়িয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

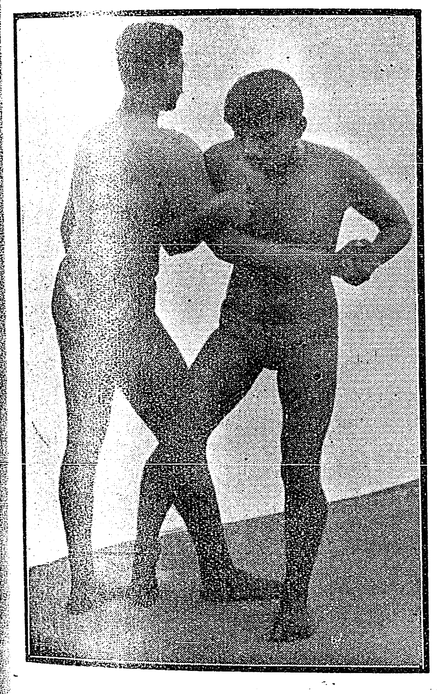

বাহাল্লী—১ম

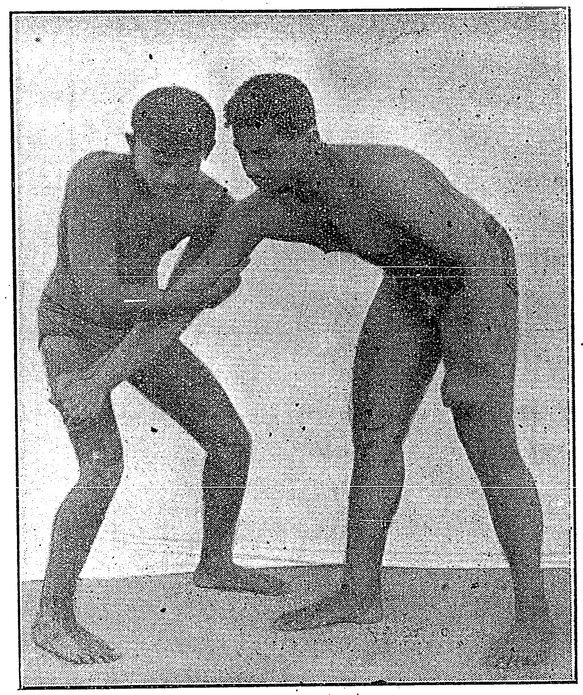

দন্তি—১ম

পাঁয়তারা

কুস্তির কৌশল শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই পাঁয়-তারা কি, তাহা শিক্ষা করিতে হয়। শরীরের ভার ও টাল (weight and balance) ঠিক রাখিয়া পা অদল-বদল করাকেই "পাঁয় তারা" বলে। কেহ ডান পা, কেহ বাঁ পা আগাইয়া (যাহার যেরূপ সুবিধা সেই ভাবেই) পাঁয়তারা রাখে। তবে সকল সময়ই অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া নিজের পাঁয়তারা ঠিক রাখিতে হয়। অপরের যখন ডান পা আগে থাকে, নিজেকে তখন ডান পা এবং অপরের যখন বাঁ পা আগে থাকে, নিজেকে তখন বাঁ পা আগাইয়া দাঁড়াইতে হয়। এই ভাবে দাঁড়ানকেই যথাক্রমে ডান এবং বাঁ পাঁয়তারা বলে ও ইহাতে পাঁয়তারার জোর থাকে না—এইরূপ ভাবে হিসাব করিয়া না দাঁড়াইলে পাঁয়তারার

ভুল হয় ও তাহাতে অপরকে প্যাঁচ মারিবার সুবিধা দেওয়া হয়।

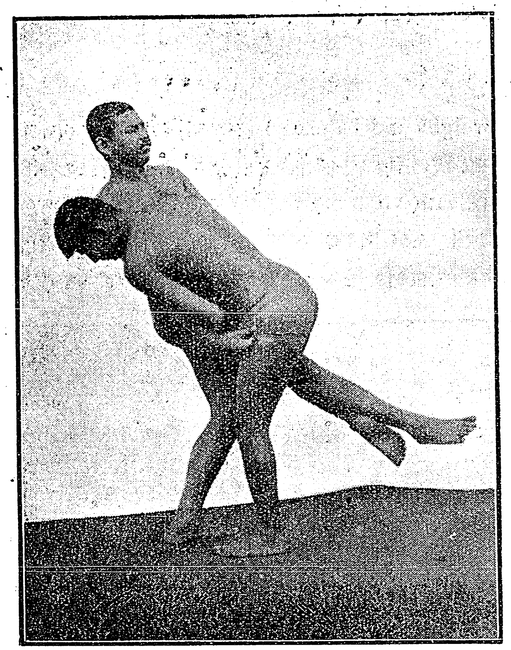

সখী—

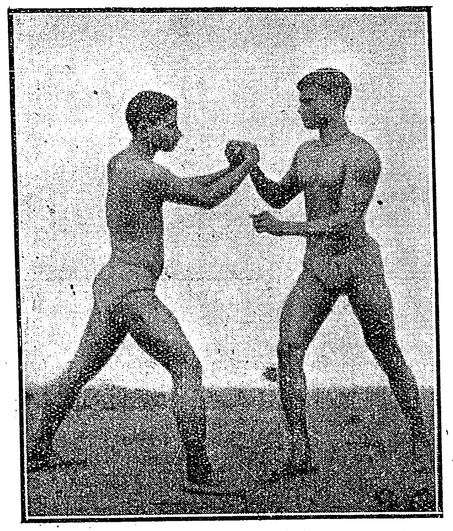

কিল্লি—১ম

সেলামী

জুজুৎসু, অসি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সেলামী লইবার একটী প্রথা আছে। সেইরূপ কুস্তি আরম্ভ করিবার সময়ও প্রথমেই উভয়কে সেলামী লইতে হয়। উভয়ই ডান পা আগাইয়া, ডান হাতে হাত দিয়া সেলামী লয়। সেলামী লইবার সময় উভয়কেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কেহ যেন কাহারও আঙ্গুল বা হাত

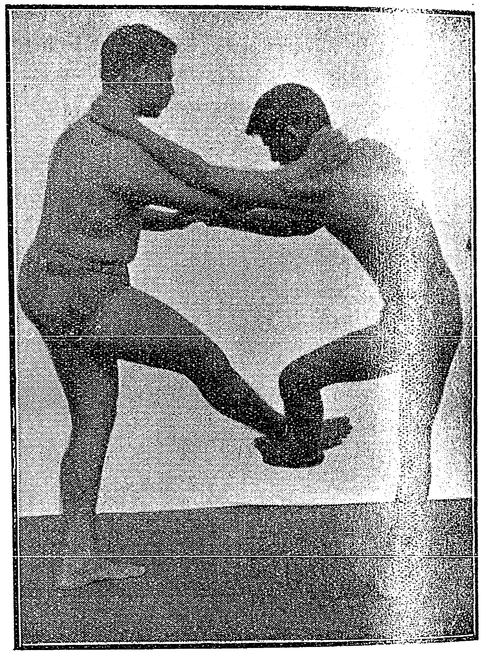

চাপরাস

ধরিয়া লইতে না পারে। সেলামী হইতেও অনেক প্যাঁচ মারা যায়।

এইবার, কি ভাবে অপরকে নিচে আনিতে বা চিৎ করিতে পারা যায়, তাহাই দেখাইব। প্যাঁচ-গুলি অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত করিতে হইবে। নিম্নলিখিত প্যাঁচ-গুলি এক ধার দিয়াই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক প্যাঁচগুলিই দুই ধার দিয়া এবং অনেক অবস্থা হইতেই মারিতে পারা যায়; তবে হাত, পা ও শরীরের কাজও বদলাইয়া করিতে হইবে। প্যাঁচগুলি অভ্যাস করিবার

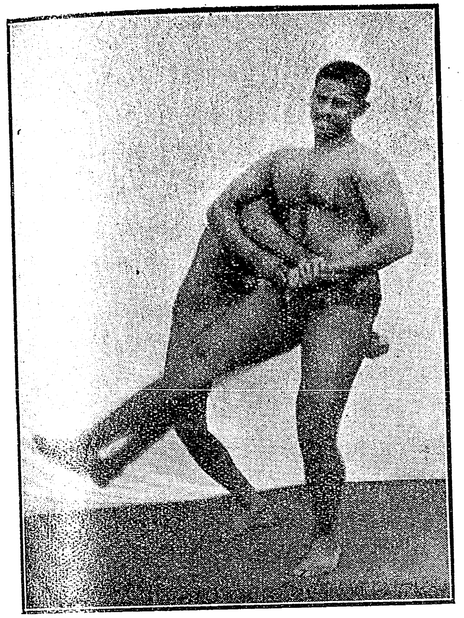

দস্তি—১ম

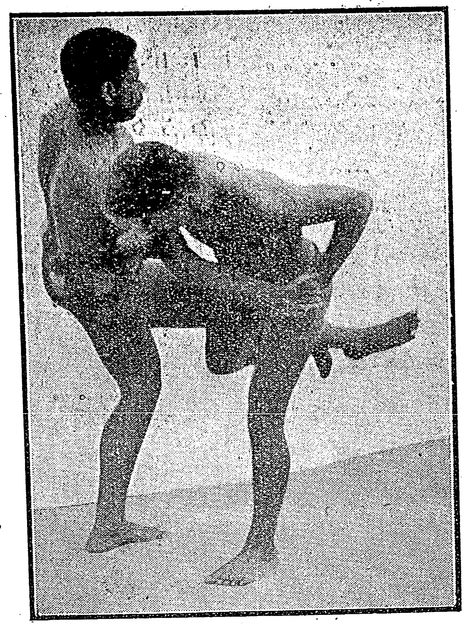

বাহাল্লী—২য়

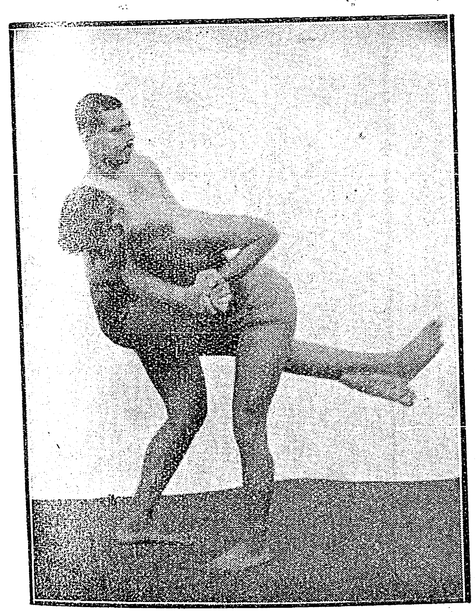

সখী

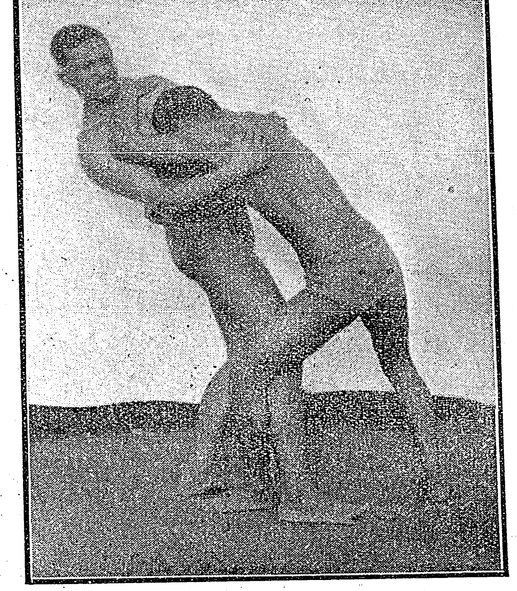

ক—১ম—"লোকান"

সময় মনোযোগের সহিত করিতে হয়। অভ্যাসের সময় এইগুলি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখা উচিত।

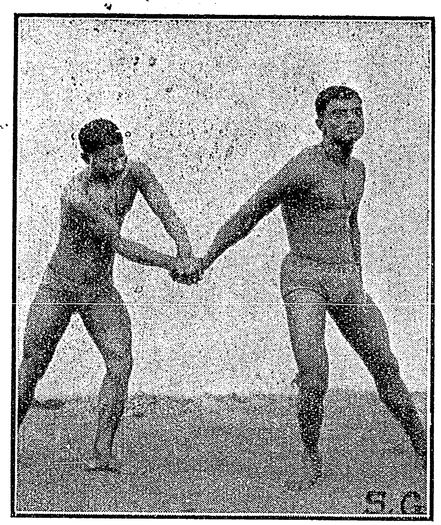

কিল্লি—২য়

দস্তি

সেলামী লইতে যাইবার সময়ই ডান হাত দিয়া অপরের ডান হাতটী এবং বাঁ হাত দিয়া তাহার ডান কনুইয়ের একটু উপরে ধরিয়া, নিজের ডান দিকে টানিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা তাহার ডান দিকে আগাইয়া দিয়া, পিছনে যাইয়া, কোমরটী জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা পিছাইয়া লইতে হয়। এইরূপে পিছনে যাওয়াকেই "দস্তি" বলে।

সেলামী লইবার পর যখন উভয়ে হাতে হাত দিয়া দাঁড়ায়, তখন অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া—যার তাহার ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে যেমন বাঁ হাতে তাহার ডান হাতটী ধরা আছে, সেইরূপই ধরিয়া রাখিয়া একটু নিচু করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার ডান কনুইয়ের একটু উপরে ধরিয়া নিজের ডান দিকে টানিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা তাহার ডান দিকে আগাইয়া দিয়া, পিছনে যাইয়া কোমরটী জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা পিছাইয়া লইতে হয়। এইরূপে পিছনে যাওয়াকেও "দস্তি" বলে।

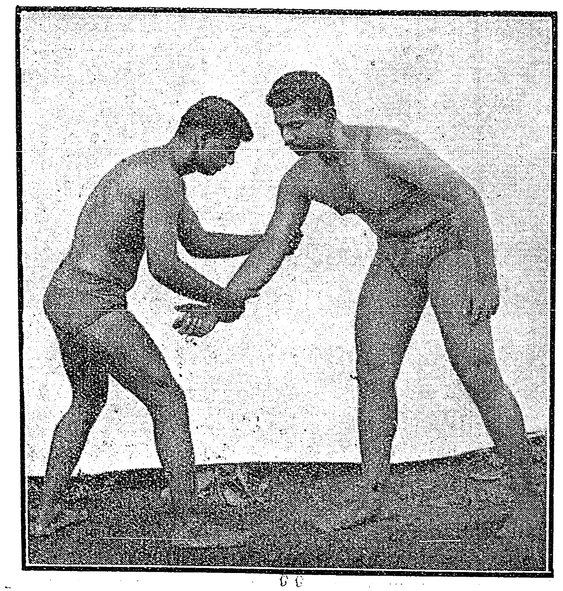

দস্তি—২য়

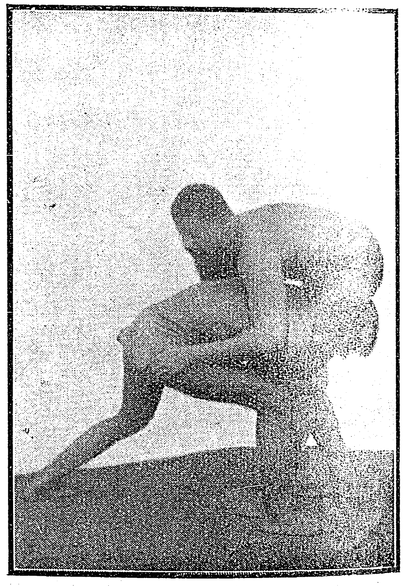

"পট"—

ক—১ম "একপটটাং"

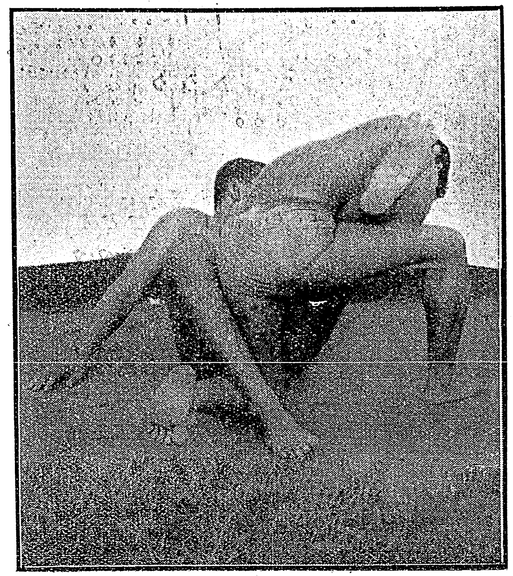

ক—২য় "একপটটাং"

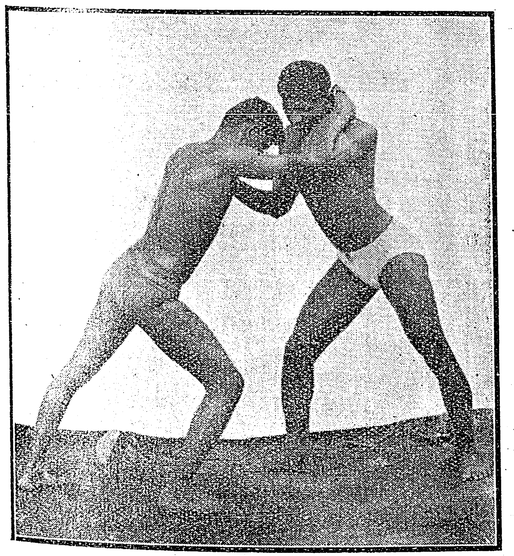

ডান পাঁয়তারা

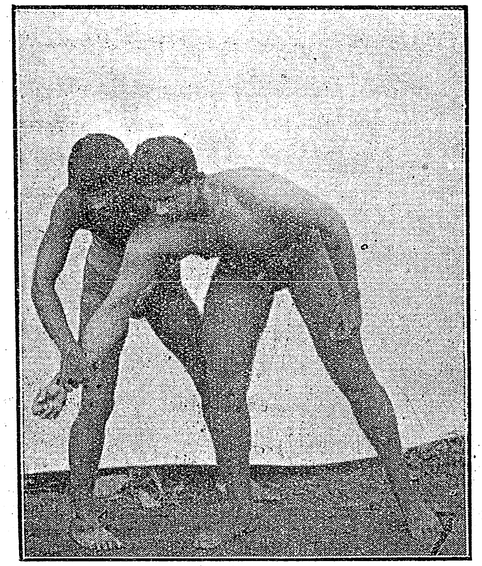

দস্তি—২য়

কিল্লি

সেলামী লইবার পর যখন উভয়ে হাতে হাত দিয়া দাঁড়ায়, তখন অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া যদি তাহার ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে যেমন বাঁ হাতে তাহার ডান হাতটী ধরা আছে, সেইরূপই ধরিয়া রাখিয়া পরে ডান হাত দিয়া তাহার হাতের মুঠাটী চাপিয়া ধরিয়া, ডান পাটী পিছাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত দিয়া তাহার কব্জীটী নিজের ডান দিকে মোচড় দেওয়াকে "কিল্লি" বলে।

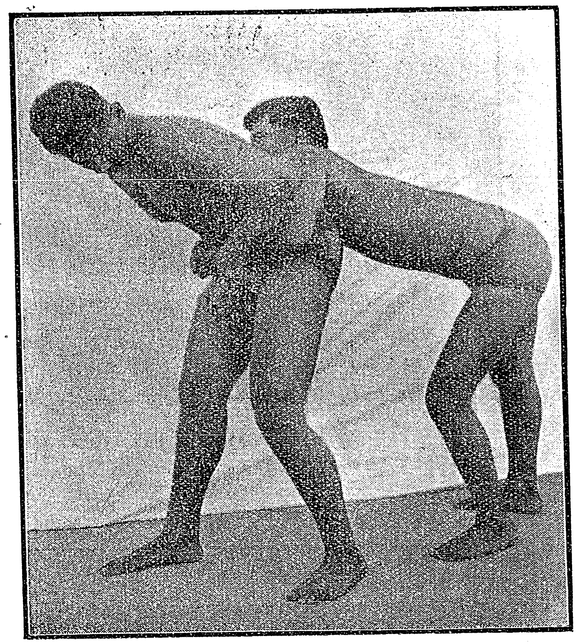

দস্তি—২য়

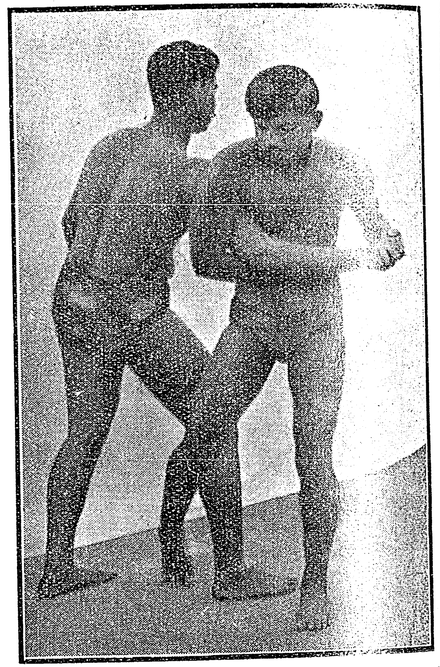

বাহাল্লী—১ম

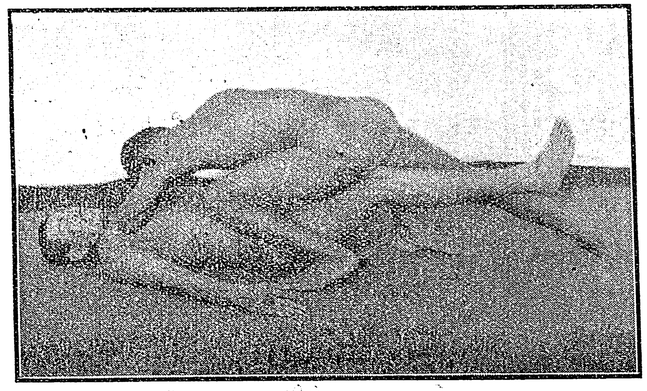

ক—২য় "লোকান"

বাহাল্লী

যদি অপরের ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে তাহার ডান হাতটী বাঁ হাত দিয়া ধরিয়া লইয়া, ডান হাতটী তাহার ডান বগলের নিচু দিয়া লইয়া গিয়া গুলির কাছে চাপিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা তাহার ডান পায়ের ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া তাহার হাঁটুর পিছনে লাগাইয়া জোরে পিছনে তুলিতে ও সাম্‌নে শরীরের ঝোঁক দিতে হয়। এইরূপে চিৎ করাকে "বাহাল্লী" বলে।

হাতটী তাহার বগলের নিচু দিয়া না

লইয়া গিয়া হাতের উপর দিয়া লইয়া গিয়া উপরি-উক্ত ভাবে হাতের ও পায়ের কাজ করিয়া চিৎ করাকেও "বাহাল্লী" বলে।

চাপরাস

সাম্‌নে, কিংবা ধারে বা পিছনে, যে কোন অবস্থাতে যদি অপরের পাঁয়তারা ভুল থাকে বা তাহার শরীরের টাল (balance) ঠিক না থাকে, তবে পায়ের গোটা দিয়া তাহার পায়ের গাঁটের কাছে মারিয়া ফেলিয়া দেওয়া বা চিৎ করাকে "চাপরাস" বলে।

সখী

যদি অপরের ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে তাহার ডান হাতটী বাঁ হাত দিয়া ধরিয়া লইয়া ডান হাতটী তাহার ডান বগলের নীচু দিয়া লইয়া গিয়া গুলির কাছে চাপিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা টী তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া, আগান পা টী টানিয়া লইয়া সামনে শরীরের ঝোঁক দিয়া চিৎ করাকে "সখী" বলে।

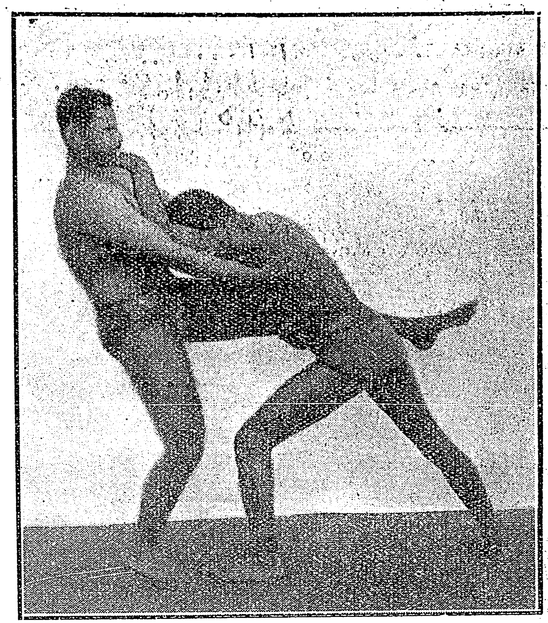

"এক হাত এক পট"

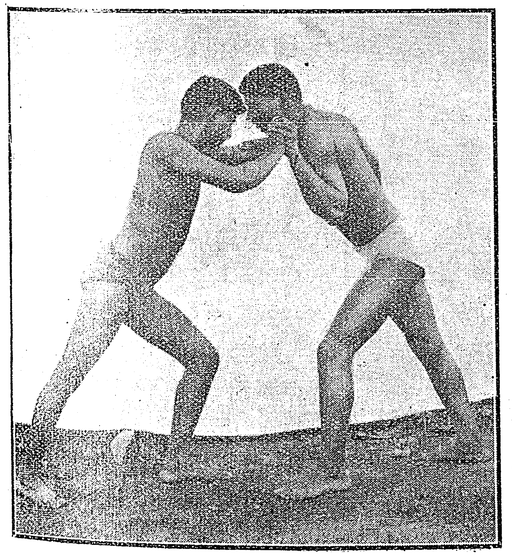

বাঁ পাঁয়তারা

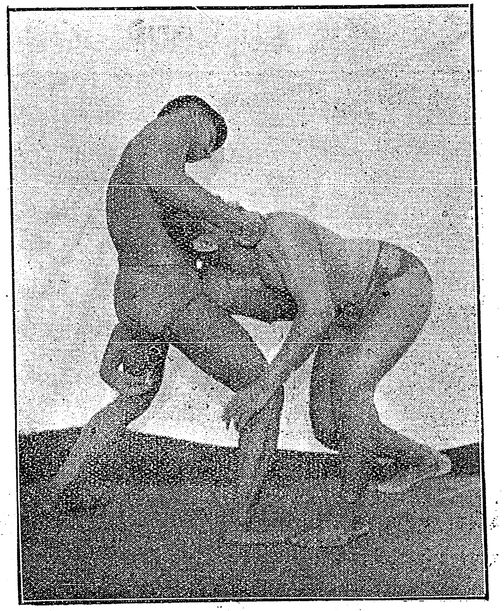

"গোমুখী"

এ ছাড়া আরও অনেক অবস্থা হইতে এই প্যাঁচটী মারা যায়; যেমন তাহার দুই বগলের মধ্য দিয়া দুই হাত চালাইয়া দিয়া কিংবা তাহার লেঙ্গটের দুইধার দুই হাতে

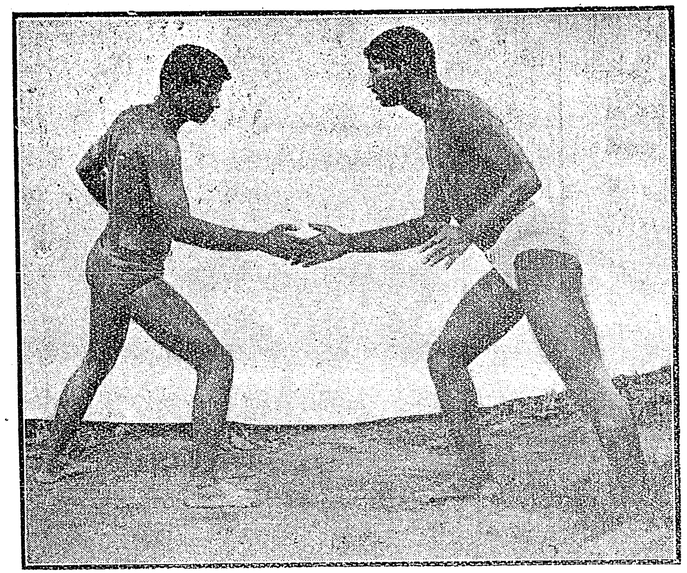

সেলামী

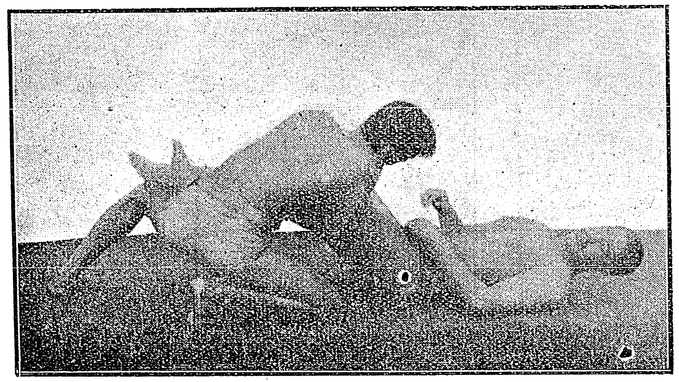

ক—২য়—"পট"

ধরিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্তভাবে পায়ের কাজ করিয়া চিৎ করাকেও "সখী" বলে।

পট

দুই হাত দিয়া অপরের দুই হাঁটুর একটু উপরে জড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে এক হাঁটু মাটিতে ও অপর হাঁটু তুলিয়া বসিয়া তাহার পা-দুইটী টানিতে হয়। যে হাঁটু তোমা থাকিবে সেইদিকে মাথা বাহির করিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে পা-দুইটী টানিয়া চিৎ করাকে "পট" বলে।

একপট-টা

অপরের পাঁয়তারা দেখিয়া যদি তাহার বাঁ পাঁয়তারা থাকে, তবে একটু নিচু হইয়া দুই হাত দিয়া তাহার বাঁ হাঁটুর একটু উপরে ধরিয়া নিজের ডান-দিকে টানিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে একটু ডানদিকে ঘুরিয়া বাঁ পা-টী তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার ডান উরুতে, নিজের বাঁ উরুতের পিছনটী লাগাইয়া "টা," প্যাঁচের ন্যায় পা-টী তুলিয়া চিৎকরাকে "একপট-টা" বলে।

গোমুখী

অপরে যখন "পট" ধরিবার জন্য দুই হাত দিয়া পাদুইটী ধরে, তখন যদি তাহার মাথা নিজের বাঁ দিকে থাকে, তবে ডান হাতটী তাহার ডান দিক দিয়া লইয়া গিয়া থুতনীর কাছে ধরিয়াও বাঁ হাতটী মাথায় রাখিয়া জোরের সহিত মাথাটী তাহার বাঁ দিকে ঘুরাইয়া ফেলিয়া দেওয়াকে "গোমুখী" বলে।

এক হাত একপট

অপরের যে পাঁয়তারাই থাকুক্ না কেন, বাঁ কিংবা ডান হাত দিয়া তাহার হাঁটুর পিছনটী ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকে অপর হাতটী লাগাইয়া (গলাতে বা মুখেও হাতটী লাগাইতে পারা যায়) জোরে ধাক্কা দিয়াও পা-টী টানিয়া চিৎ করাকে "এক হাত একপট" বলে।

লোকান

যদি অপরের ডান পাঁয়তারা থাকে, তবে ডান হাতটী তাহার কোমরের বাঁ দিক দিয়া লইয়া গিয়া পিছনটী ধরিয়া ও বাঁ হাতটী তাহার বুকে লাগাইবার (গলাতে বা মুখেও হাতটী লাগাইতে পারা যায়) সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা-টী তাহার ডান পায়ের ডানদিক দিয়া পিছনে লইয়া গিয়া আট্‌কাইয়া পা-টী টানিয়া, জোরে ধাক্কা দিয়াও কোমরটী টানিয়া চিৎ করাকে "লোকান" বলে।

গৌরী গিরির মেয়ে

জসীমউদ্‌দীন

হিমালয় হ'তে আসিলে নামিয়া তুষার বাসর ত্যজি,
হিমের স্বপন অঙ্গে মাখিয়া সাঁঝের বসনে সাজি।
হে গিরি-দুহিতা, তোমার নয়নে অলকার মেঘগুলি
প্রতি সন্ধ্যায় পরাইয়া যেত মায়া-কাজলের তুলি।
তুহিন তুষারে অঙ্গ মাজিতে, দুগ্ধ-ধবল কায়
রবির কিরণ পিছলি পিছলি লুটাত হিমানী বায়।
রাঙা-মাটি-পথে চলিতে চলিতে পথ যেন মমতায়
আল্‌তা রেখায় রঙিন হইয়া জড়াইত দুটি পায়।
অঙ্গকে তোমার পাহাড়ী পবন ফুলের দেউল লুটি,
গন্ধের বাণী সূচনা করিত সারা রাত ছুটি ছুটি।
গহিন গুহায় ঝুরুরে কুহরে কল কল্লোলে ঘুরি,
ঝরণা তোমার চরণে বিছাত মণি-মাণিকের নুড়ি।

পাষাণের ভাষা শুনিতে যে তুমি ঝরণায় পাতি কান,
শুনিতে শুনিতে কোন্ অজানায় ভেসে যেত তব প্রাণ।
ঝরণার সোঁতে ভাসিয়া আসিত, অলস সোণার ঘুম,
তোমার নয়নে বিছাত দূর স্বপনের চুম।
শিথিল দেহটি এলাইয়া দিয়া ঘন তুষারের গায়,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ঘুমেরে যে ঘুম পাড়াইতে নিরালায়।
তোমার দেহের বিম্ব আঁকিয়া আপন বুকের পরে,
পরতের পর পরত বিছাত তুষার রজনী ভ'রে।

তোমার ছায়ারে যত সে লুকাত, চাঁদের কুমার তত,
তুষার পরত ভেদিয়া সেথায় একেলা উদয় হ'ত।
দূর গগনের সাত-ভাই-তারা শিয়রে বিছায়ে ছায়া,
পারুল বোনের নিশীথ শয়নে জ্বালিত আলোর মায়া।
দিন রজনীর মোহনার সোঁতে শুক তারকার তরী,
চলিতে চলিতে পথ ভুলে যেত ঘাটের বাঁধন স্মরি।

পূর্ব্ব তোরণে দাঁড়ায়ে প্রভাত ছুঁড়িত আবীর ধূলি;
তোমার নয়ন হইতে ফেলিত ঘুমের কাজল তুলি।
কিশোর কুমার প্রথম হেরিয়া তোমার কিশোরী কায়া,
মেঘে আর মেঘে বরণে বরণে মাখাত রঙের মায়া।

কি কুহকে ভুলে ওগো গিরিসুতা! এসেছ মরতে নামি,
কে তোমার লাগি পূজার দেউল সাজায়েছে দিবা যামি?
হেথায় প্রখর মরীচিমালীর জ্বলে হুতাশন জ্বালা,
দাহনে তোমার শুকাবে নিমেষে বুকে মন্দারমালা।
মরতের জীব বৈকুণ্ঠের নাহি জানে সন্ধান,
ফুলের নেশায় ফুলেরে ছিঁড়িয়া ভেঙে করে শতখান।
রূপের পূজারী রূপেরে লইয়া জ্বালায় ভোগের চিতা,
প্রেমেরে করিয়া সেবাদাসী এরা রচে যে প্রেমের গীতা।
হাত বাড়ালেই হেথা পাওয়া যায়, তৃষ্ণারে বড় করি,
তপ-কৃশ তনু গৈরিকবাসে জাগে নাক বিভাবরী।

হেথা সমতল, জোয়ারের পানি একধার হ'তে ভাসি,
আর ধারে এসে গড়াইয়া পড়ে ছল-কল-ধারে হাসি।
হেথায় কাম্য সহজ লভ্য, পরিয়া যোগীর বাস,
গহনগুহায় যোগাসনে কেউ করে না কাহারো আশ।
হেথাকার লোক খোলা চিঠি পড়ে, বন রহস্য আঁকি,
বন্ধুর পথে চলে না তটিনী কারো নাম ডাকি ডাকি।

তুমি ফিরে যাও হে গিরি-দুহিতা, তোমার পাষাণপুরে,
তোমারে খুঁজিয়া কাঁদিছে ঝরণা কুহরে কুহরে ঘুরে।
তব মহাদেব যুগ যুগ ধরি ভস্ম লেপিয়া গায়,
গহন গুহায় তোমার লাগিয়া রয়েছে তপস্যায়।
অলকার মেয়ে ফিরে যাও তুমি, তোমার ভবনদ্বারে,
চিত্রকূটের লিখন বহিয়া ফেরে মেঘ জলধারে।

তোমার লাগিয়া বিরহী যক্ষ গিরিদরী পথ কোণে,
পাষাণের গায়ে আপন ব্যথারে মর্দ্দিছে আনমনে।
শোকে কৃশতনু বিহ্বল মন, মৃণাল বাহুরে ছাড়ি
বার বার ক'রে ভ্রষ্ট হইছে স্বর্ণবলয় তারি।
বাণীর কুঞ্জে ময়ূর ময়ূরী ভিড়ায়েছে পাখা তরী,
দর্ভকুমারী নিবারের বনে তৃণ আছে বিস্মরি।
তুমি ফিরে যাও তব অলকায় গৌরী গিরির শিরে,
চরণে চরণে তুষার ভাঙিও মন্দাকিনীর তীরে।
কণ্ঠে পরিও কিংশুক-মালা, পাটলপুষ্প কানে,
নীপ-কেশরের রচিও কবরী নব আষাঢ়ের গানে।

তীর্থ-পথিক বহু পথ বাহি শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
কোন এক প্রাতে যেয়ে পৌঁছিব 'শিঞ্জল' গিরি ছায়।
দিগন্ত-জোড়া ঘন কুয়াশার লোল অঞ্চলখানি,
বায়ুরথে বসি কিরণ কুমার ফিরিবে সুদূরে টানি।
আমরা হাজার নরনারী সেথা রহিব প্রতীক্ষায়,
কোন শুভখনে গিরি-কন্যার ছায়া যদি দেখা যায়!
দিবসের পর দিবস কাটিবে, মহাশূন্যের পথে
চরণের পর চরণ চলিবে উড়াল মেঘের রথে।
কুহকী প্রকৃতি মেঘের গুচ্ছে বাঁধিয়া বাদল ঝড়,
ঘনঘোর রাতে মহা উল্লাসে নাচিবে মাথার 'পর।
ভয়-বিহ্বল দিবস লুকাবে কপিল মেঘের বনে,
খর বিদ্যুৎ অট্ট হাসিবে গগনের প্রাঙ্গণে।
তীর্থ-পথিক তবু ফিরিবে না, কোন্ শুভদিন ধরি,
বহুদূর পথে দাঁড়াবে আসিয়া গৌরী গিরির 'পরি।
সোণার অঙ্গে জড়ায়ে জড়ায়ে বিজলীর লতাগুলি,
ফুল ফোটাইবে হাসি ছড়াইবে অধর দোলায় দুলি।
কেউ বা দেখিবে—কেউ দেখিবে না, অনন্ত মেঘ'পরে
আলোক প্রদীপ ভাসিয়া যাইবে শুধু ক্ষণিকের তরে।
তার পর সেথা ঘন কুয়াশার অনন্ত আঁধিয়ার,
আকাশ ধরণী বন প্রান্তর করে দেবে একাকার।

আমরা মানুষ—ধরার মানুষ এই আমাদের মন
যদি কোন দিন পরিতে না চাহে কুটীরের বন্ধন;
যদি কোন দিন সুদূর হইতে আলেয়ার আলোপরি
বেঘুম শয়ন করে চঞ্চল ডাকি মোর নাম ধরি,—
হয়ত সেদিন বাহির হইব, গেহের তুলসী তলে
যে প্রদীপ জ্বলে তাহারে সেদিন নিবায়ে যাইব চ'লে।
অঙ্গে পরিব গৈরিক বাস, গলায় অক্ষ হার,
নয়নে পরিব উদাস চাহনী মায়া-মেঘ-বলাকার।
কাশীশ্বরের চরণ ছুঁইয়া পুত পবিত্র কায়
জীবনের যত পাপ মুছে যাব প্রয়াগের পথ গায়।
হরিদ্বারের রঙিন ধূলায় ঘুমায়ে শ্রান্ত কায়,
ত্রিগঙ্গা জলে সীনান করিয়া জুড়াইব আপনায়।
কমণ্ডলুতে ভরিয়া লইব তীর্থ নদীর বারি,
লছমনঝোলা পার হয়ে যাব পূজা গান উচ্চারি।
তাপসী জনের অঙ্গের বায়ে পবিত্র পথছায়ে,
বিশ্রাম লভি সমুখের পানে ছুটে যাব পায়ে পায়ে।
দেউলে দেউলে রাখিব প্রণাম, তীর্থ নদীর জলে
পূজার প্রসূন ভাসাইয়া দিব মোর দেবতারে বলে।

মাস বৎসর কাটিয়া যাইবে, কেদার বদরী ছাড়ি
ঘন বন্ধুর পথে চলিয়াছে সন্ন্যাসী সারি সারি
কঠোর তপেতে ক্ষিণ্ণ শরীর—শ্রান্তক্লান্তকায়,
সমুখের পানে ছুটে চলে কোন্ দুরন্ত তৃষ্ণায়।
সহসা একদা মানসসরের বেড়িয়া কনক তীর
হোমের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে হাজার সন্ন্যাসীর।
শিখায় শিখায় লিখন লিখিয়া পাঠাবে শূন্যপানে,
মন্ত্রে মন্ত্রে ছড়াবে কামনা মহা-ওঙ্কার গানে।
তারি ঝঙ্কারে স্বর্গ হইতে বাহিয়া কনক রথ,
হৈমবতী গো, নামিয়া আসিও ধরি মর্ত্ত্যের পথ।
নীল কুবলয় হস্তে ধরিও দাঁড়ায়ে সরসী নীরে,
মরাল মরালী পাখার আড়াল রচিবে তোমার শিরে।
প্রথম উদিতা উষসী-জবার কুসুম মূরতি ধরি,
গলিত হিরণ কিরণে নাহিও হে গিরিদুহিতা গৌরী।
অধর ডলিয়া রক্ত মৃণালে মুছিও বলাকাপাখে,
অঙ্গ ঘেরিয়া লাবণ্য যেন লীলাতরঙ্গ আঁকে।
চারিধার হ'তে ভকত কণ্ঠে উঠিবে পূজার গান
তারি সিঁড়ি বেয়ে স্বরগের পথে ক'র তুমি অভিযান।

* * * *

তীর্থ-পথিক, ফিরিয়া আসিব আবার মাটীর ঘরে,
গিরি-গৌরীর কাহিনী আনিব কমণ্ডলুতে ভরে'।
দেউলে দেউলে গড়িব প্রতিমা, পূজার প্রসূন করে
জনমে জনমে দেখা যেন পাই—প্রণমিব ইহা স্মরে'।

পাশাপাশি

(গল্প)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

অনাদি আর অক্ষয়—ব্যাণ্ডেল-ষ্টেশনে টিকিট-চেকারের কাজ করে। এক বছর একসঙ্গে কাজ করিতেছে। ষ্টেশনের বাহিরে জমির ধারে বড় বড় ঘাস-ভরা জমি। সেই জমির উপর একতলা বাড়ী—মাঝখানে উঁচু দেওয়ালের পার্টিশান। তারি এক দিকে থাকে অনাদি, অপর দিকে অক্ষয়। দুজনেই সস্ত্রীক বাস করে—বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। পত্নীরা তরুণী। অনাদির স্ত্রী পদ্ম, আর অক্ষয়ের স্ত্রী অম্বুজা। দুজনের প্রণয় বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

পদ্ম নভেল পড়িতে ভালোবাসে, অম্বুজা শিল্প-কাজে পটু। অনাদি আর অক্ষয় ষ্টেশনে বাহির হইয়া যায়; দুটি তরুণী বধূ নিজেদের গৃহে রান্নাবান্না চুকাইয়া যেটুকু অবসর পায়, তার মাঝে পদ্ম তক্তাপোষে উপুড় হইয়া শুইয়া নভেলের পাতায় তন্ময় হয়; আর অম্বুজা জানলার ধারে বেতের মোড়া টানিয়া তাহাতে বসে, তার হাতে কখনো থাকে কার্পেট, কখনো সূতার বাণ্ডিল। কার্পেটে পশমের ফুল তোলে, নয় সূতায় লেশ বোনে। নভেলে তার রুচি নাই। কি সব বাজে কথা লিখিয়া ছাপায়,—পড়িলে মন খারাপ হয়, নিজের সংসারের দৈন্য আর অভাব ব্যথায় নিবিড় হইয়া বুকে বাজে।

অনাদি লোকটার মেজাজ ভারী অদ্ভুত। মাছ ধরার সখ তার প্রচণ্ড; কোথাও গান-বাজনার আসর বসিয়াছে শুনিলে সিক্-রিপোর্টের ব্যবস্থা করিয়া সেখানে ছোটে ··

অক্ষয় দাবা-খেলায় মাতে। গাড়ীর সিগ্‌নাল পড়িয়াছে, ফ্ল্যাগম্যান বারবার তাগিদ দিতেছে, অক্ষয়ের সে-কথা কাণে যায় না। গজ ছাড়িয়া মন্ত্রীর চাল লইয়া সে তখন মত্ত। শেষে গাড়ী যখন হুড়মুড় শব্দে প্লাটফর্ম্মে ঢুকিয়া পড়ে···

কিন্তু নির্ব্বিরোধী মানুষ, শান্ত প্রকৃতি, সাত চড়ে কথা কয় না। আর অনাদি? আছে তো বেশ আছে—একবার ক্ষেপিলে রক্ষা নাই। দুড়দাড় করিয়া জিনিষ-পত্র ভাঙ্গা, চীৎকার, কলরব—চকিতে প্রলয় বাধাইয়া তোলে! কিন্তু ঐ নিমেষের জন্য! একটু ছোট বাধা পাইলেই সব স্থির—অনুতাপ-অশ্রুজলেরও সীমা থাকে না। এ বয়সে তার অনুতাপের মাত্রা দেখিয়া লোকে হাসিয়া বলে,—কাঁদবে যদি তো চটো কেন?

অনাদি বলে,—কে জানে, কিছুতে কেমন নিজেকে সামলাতে পারি না।

তার এ মেজাজ গৃহে-বাহিরে সর্ব্বত্র সমান। পদ্মকে কম সহিতে হয় না। মন আঘাত পায় প্রচুর,—শরীরও রক্ষা পায় না! ষ্টেশন-শুদ্ধ লোক অনুযোগ তোলে,—স্ত্রীর গায়ে হাত তোলো! ছি! মাতাল নও, দাঁতাল নও—এ কি বদ রীত্···

অনাদি স্থির হইয়া কি ভাবে, শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলে—বেচারী! সে যে কেন চুপ করে থাকে? হাত তুলতে গেলে কেন সে চোখ রাঙায় না···?

ষ্টেশনের বন্ধুরা বলে,—বাঙালীর ঘরের বৌ যে ··

প্রায়শ্চিত্তও বাদ যায় না। তখনি স্যাকরার ডাক পড়ে, কিম্বা শাড়ীর দোকানে ছোটে; নয়তো গুরুদাস লাইব্রেরী কিম্বা পাব্‌লিশিং হাউসে বইয়ের অর্ডার যায়। অম্বুজা আসিয়া পদ্মকে বলে,—আমার এমন ভয় হয়! যখন মেজাজ ভালো থাকে, বোঝাতে পারো না?

পদ্ম হাসিয়া বলে,—আমায় বোঝাবার অবসর দেয় কৈ? নিজেই কান্নাকাটি করে হাত ধরে মাপ চায়,—বলে, আর কখনো এমন হবে না—রাগ চণ্ডাল!

অম্বুজা বলে,—কিন্তু চণ্ডালকে তাড়াবার উপায় কখনো করতে দেখলুম না!

এ-কথায় পদ্ম চুপ করিয়া হাসে। অম্বুজা সূতায় লোহার কাঁটা চালাইতে চালাইতে বিদায় লয়।

২

সেদিন দুপুরবেলা খাইতে আসিয়া অনাদি খুব একপশলা বর্ষণ আর গর্জ্জন তুলিয়া গেল। পাশের বাড়ীতে অম্বুজা ভয়ে একেবারে কাঁটা!

অক্ষয় খাইতে খাইতে দাবার চাল ভাবিতেছিল।

অম্বুজা কহিল—শুনলে?

গম্ভীর ভাবে অক্ষয় শুধু বলিল,—হুঁ।

অম্বুজা কহিল—তোমরা এর বিহিত করতে পারো না? একদিন রাগের বশে বেকায়দায় যদি মার-ধর করে—বৌটো যে মরে যাবে!

সকালে গজের চালে মাত্ করা চলিত কি করিয়া, অক্ষয় তখন সেই কথা ভাবিতেছিল। অম্বুজার কথার জবাব দিল না।

অম্বুজা কহিল—শুনচো না?

অক্ষয় কহিল—হুঁ!

অম্বুজা বিরক্ত হইল, কহিল—ঐ এক হুঁই শিখেচো! ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে আছো সারা ক্ষণ! স্ত্রী···তার পানেই চাইতে জানো না···সংসার যেমন চলে, চলুক··· মাথা কুটে মলেও কোনো দিকে চোখ পড়ে না!

অক্ষয়ের চেতনা জাগিল। অক্ষয় কহিল,—কি বলচো?

অম্বুজা কহিল—আজ মাসের ক'দিন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম···

অক্ষয় কহিল—ও, আজ সাতাশে। আর চারদিন পরে মাহিনা পাবো।

অম্বুজা কহিল—তবেই আর কি! আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল!

অক্ষয় অম্বুজার পানে চাহিল, কহিল—সত্যি, কি, বলো না? আমি একটা কথা ভাবছিলুম!

অম্বুজা কহিল—জানি, দাবা। তাই ভাবি, তোমার স্ত্রী না হয়ে যদি বোড়ে হতুম, তাহলে সুখ ছিল।

অক্ষয় অপ্রতিভ হইল। এমন অভিযোগ অম্বুজা মাঝে মাঝে তোলে—সে স্ত্রী, এমন কিছু বয়সও তার হয় নাই। এ-বয়সে মানুষের স্ত্রী স্বামীর কাছে কত আদর, কত সোহাগ পায়! এ বয়সের স্ত্রীকে স্বামী আদর করিয়া কত কি আনিয়া দেয়, তার কি চাই, সহস্র প্রশ্নে তা জানিবার প্রয়াস পায়!···এমনি অভিযোগ সে মাঝে মাঝে শুনে··· কিন্তু তাও রাত্রিবেলায়! হুঁ-হাঁ করিয়া কোনোমতে ঘুমের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া অক্ষয় নিস্তার পায়। আজ দিনে-দুপুরে অম্বুজা আবার সেই অভিযোগ তুলিয়াছে!···

কথাটা সত্য অম্বুজার পানে তেমন করিয়া সে তাকায় কৈ?

অম্বুজার পানে এখন চাহিল। অক্ষয় গরীব টিকিট-চেকার। অম্বুজাকে কিন্তু গরীবের ঘরের বৌয়ের মত দেখায় না। ভালো শিল্কের একখানি শাড়ী পরিয়া অম্বুজা যদি ট্রেণের সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় চড়িয়া বসে, বড় ঘরের বলিয়া কে না ভুল করিবে! সে তো সেকেণ্ড ক্লাশে বহু বাঙালী নারী-যাত্রী দেখিয়াছে—রূপে বা মুখশ্রীতে অম্বুজা যে তাদের অনেক উপরে, এ-কথা বহুবার তার মনে উদয় হইয়াছে—দারিদ্র্যের মাঝে এটুকু জ্ঞান কম গর্ব্বের বস্তু নয়!

কিন্তু ঠিক্, অম্বুজার কোন্ দাবী সে মিটাইতে পারিয়াছে? শাড়ী? গহনা? দিবার শক্তি নাই! বেশ, আদর? ভালো কথা? অন্যায় হইয়াছে! কিন্তু তার সে সময় কোথায়? এক একবার সে এমন কথাও ভাবে, ছুটী লইয়া রেলের ফ্রী-পাশে অম্বুজাকে সাথী করিয়া পশ্চিমের কোথাও গিয়া মাসখানেক কাটাইয়া আসিবে—সেখানে ছুটীর আনন্দটুকু অম্বুজার 'পরেই ঢালিয়া দিবে!···

নানা কাজে এ চিন্তা কোথায় আবার হারাইয়া যায়!···

অক্ষয় কহিল—কি বলছিলে, বলো···

অম্বুজা কহিল—নিজের দুঃখ জানাচ্ছি না। তার নেই। ঐ পদ্মার কথা বলচি···তোমাদের বন্ধু অনাদিবাবুর বৌ···

অক্ষয় কহিল—কি হলো আবার?

অম্বুজা কহিল—কি রকম ধুমসুনি আর গর্জ্জন উঠলো···শুনলে না?

অক্ষয় কহিল—ও তো নতুন নয়।

অম্বুজা কহিল—তোমরা ভালো করে বলতে পারো না···যাতে এর নিবৃত্তি হয়? ভদ্রলোকের ঘরে এ কি ইতরের কাণ্ড!

অক্ষয় কহিল—ঢের বলা হয়েচে। আমাদের নিত্য ঐ কথাই হয়···

অম্বুজা কহিল—তবু এর বিরাম হয় না?

অক্ষয় কহিল—উপায় কি, বলো?

অম্বুজা কহিল—ওঁর সঙ্গে সকলে কথাবার্ত্তা বন্ধ করো কিছুদিন।

অক্ষয় কহিল—অনাদি নিজেই কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। সেদিন বলছিল, একটা মাদুলি-টাদুলি দিতে পারো কেউ, যাতে এ মেজাজ গরম না হয়? বেঁচে যাই, দাদা··· বৌটোও বাঁচে। বৌ বড় ভালো·· অনাদি শত মুখে তার সুখ্যাতি করে।

অম্বুজা কহিল—আহা! দয়া কত! বৌ ভালো... তাই ছোট লোকের মত পিটতে পারেন! এ তো এক-দিনের ব্যাপার নয়, দৈবাতের কথাও নয়—নিত্যি··· কোনো দিন কামাই দেখলুম না!

অক্ষয় আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। পাতের ভাত পাতে রহিল।

অম্বুজা কহিল—নাও গো, খেয়ে নাও···তোমার আবার ডিউটির সময় হলো।

—তাও বটে! অক্ষয় দ্রুত ভাতের গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

অম্বুজা পার্টিশন-দেওয়ালে কাণ পাতিয়া রহিল। ওদিকে কলরব তখন থামিয়া আসিয়াছে!···

মুখ-হাত ধুইয়া অক্ষয় ষ্টেশনে চলিয়া গেল। অম্বুজা ঘরে খিল আঁটিয়া ভাত বাড়িল···বাড়িয়া আবার সেই দেওয়ালে কাণ পাতিল। কিছু শুনা গেল না। ভাবিল, একবার গিয়া দেখিয়া আসি!

কিন্তু যাওয়ার প্রয়োজন হইল না। অনাদির কথা শুনা গেল। সদরে দাঁড়াইয়া অনাদি বলিতেছিল,—এই পাঁচখানা বইয়ের অর্ডার এখনি ডাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ···পরশু তুমি পাবে, পদ্মা। লক্ষ্মীটি, এখন ভাত খেয়ে নাও···আর বেলা করো না—পিত্তি পড়বে। আর মুখখানা কালি মেড়ে রয়েছে, সাবান দিয়ে ধুয়ে ফ্যালো গে···। আমি ষ্টেশন থেকে মাতাদিনকে এখনি ত্রিলোকি বাবুর বাড়ী পাঠাবো। 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বই ওদের বাড়ী আছে—মাতাদিন তোমায় দিয়ে যাবে!···

পদ্মার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

অম্বুজা নিজের মনে শ্লেষ-ভরে কহিল,—আদর দেখে বাঁচি না! সেই যে কথা আছে—তোমার যেমন ভালোবাসা, মুসলমানের মুর্গী পোষা! হাড় ছেঁচে এখন তাতে প্রলেপ লাগাচ্ছেন! গোরু মেরে জুতো দান আর কাকে বলে!

৩

আহারাদির পর অম্বুজার আর বোনা হইল না; সে চলিল পদ্মাকে দেখিতে। দ্বার বন্ধ ছিল, কড়া নাড়িতে উপর হইতে সাড়া মিলিল,—কে গা?

অম্বুজা কহিল,—অনেক দূর থেকে আসচি গো—বিদেশিনী।

সে-স্বর পদ্মা চিনিল, কহিল—আ মরণ! তুমি? যাই··

পদ্মা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তার রগে মস্ত ছ্যাঁচা দাগ—কপালটাও মার্ব্বেলের মত ফুলিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া অম্বুজা শিহরিয়া উঠিল।

দ্বার বন্ধ করিয়া দু'জনে দোতলায় উঠিল। তক্তাপোষের বিছানায় 'হরিদাসের গুপ্তকথা' বইখানা পড়িয়া আছে। অম্বুজা দেখিল, গোরু মারিয়া জুতা দান হইয়া গিয়াছে!

অম্বুজা কহিল,—কপালে বেশ কাটা দাগ দেখচি। ফুলোও···আজকের প্রেম রণে এই লাভ?

মৃদু হাসিয়া পদ্মা কহিল,—তাই।

অম্বুজা কহিল—তুমি কি করে হাসো পদ্মা, আমি তাই ভাবি।···কি করে কাটলো, শুনি?

পদ্মা কহিল,—জোরে ঠেলে দিয়েছিল—ঐ দেরাজের কোণে কপালটা ঠুকে গেছে।

পদ্মা চুপ করিল, অম্বুজা নিরুত্তরে তার পানে চাহিয়া। পদ্মা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—নিজেই আইডিন দিয়ে গেছে ব্যথা হবে না লো!

অম্বুজা কহিল—বারো মাস এই প্রহার সহ্য করো! কি বলে হাসো? সত্যি! স্বামীর সঙ্গে মারধরের সম্পর্ক তো নয়।

পদ্মা কহিল—ঠিক যে মারে, তা নয়। তবে ধাক্কাধুক্কিটা চলে। মানুষের মেজাজ ···ও তো ব্যাধি, ভাই। নাহলে···

অম্বুজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পদ্মা কহিল—ভালোও বাসে খুব।··

অম্বুজা কহিল—থামো তুমি—আর ভালোবাসার নাম করো না।

পদ্ম কহিল—তা না বললে যে পাপ হবে, ভাই।···এই সেদিন মাথা ধরেছিল, বিছানায় পড়েছিলুম। শেষ লোক্যাল-খানা বেরিয়ে গেলে ফিরলো সেই রাত এগারোটায়। মেজাজ বুঝি কেমন ভালো ছিল! এসে বললে—শুয়ে যে? আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। রান্না হয়নি—বললুম, মাথাটা ভারী ধরে রয়েচে সেই সন্ধ্যা থেকে। তা রান্না করতে দিলে না—মাথায় ওডিকলোনের পটি দিয়ে শুয়ে থাকতে বললে। বলে বেরিয়ে গেল সেই হুগলীতে। মিষ্টি, রাবড়ি—প্রায় পাঁচ সিকের কিনে নিয়ে এলো!···

অম্বুজা নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। পদ্মর কথা শেষ হইলে বলিল—তবেই আর কি, সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল!···তা, আজ হয়েছিল কি?

পদ্ম কহিল—ব্যাপার খুব তুচ্ছ। ওর মেজাজ গরম করতে খুব বড় আয়োজনও তো দরকার হয় না। তাছাড়া কিসে মেজাজ গরম হবে, আর কিসে হবে না, তা আজ সাত বছর একসঙ্গে ঘর করেও বুঝতে পারলুম না, ভাই।···

অম্বুজা কহিল,—তবু আজকের যুদ্ধের কারণ শুনি···

পদ্ম কহিল—খেতে বসলো ··বসেই বললে, তোমার ভাত বাড়ো—দুজনে একসঙ্গে খাবো। আমি বললুম,—আমি পরে খাবো'খন—তোমার হোক। তা বললে—না, কথ্খনো খাবো না তাহলে। আমি ভাই সত্যি কথা বলি, তখন দুর্গেশনন্দিনীখানা প্রায় শেষ করে এনেচি। কতলু-খাঁকে মেরে ফেলেচে, মস্ত হৈ-হৈ পড়ে গেছে—তাই ভাবলুম, কেউ ধরা পড়লো কি না, সেটুকু পড়ে খেতে বসবো। অমনি বাবুর মাথা গরম হয়ে উঠলো। তবু···বসলো খেতে, কিছু বললে না।···তারপর আমার মনে পড়লো, মিছরীর পানা দেওয়া হয়নি—রোজ ভাতের আগে খায়। যেমন দেওয়া, অমনি যেন তেলে বেগুন ছাড়লুম! ফোঁশ্ করে উঠলো—এক গ্লাস কেন? তোমায় না রোজ খেতে বলেচি? আমি বললুম,—খাবো'খন—মিছরীর তো পানা পালাচ্ছে না। তা বললে, কৈ, আনো তোমার গেলাস, দেখি···। তখন আমি বললুম,—আজ ঐ এক গ্লাসই করেচি, নিজের জন্য মিছরী ভিজুতে ভুলে গেছি। তখন বললে—বেশ, আর একটা পাত্র দাও—এর অর্দ্ধেক তুমি খাবে, তবে বাকীটুকু আমি খাবো। আমি বললুম,—আজ ঐ টুকুন হয়েচে, তুমিই ওটুকু খাও। এ-কথা যেমন বলা, দুম্ করে গেলাসটা দেওয়ালে ছুড়ে দিলে —কাঁচের গেলাস ঝন্‌ঝন করে ভেঙ্গে গেল। আমি বকলুম, যত বয়স হচ্ছে, তত ছেলেমানুষী বাড়চে! কখখনো আমি খাবোনা মিছরীর পানা—জন্মেও না। এই কথায় ভাত ফেলে উঠে একেবারে ধেই-ধেই নৃত্য। এটা ফ্যালে, ওটা ভাঙ্গে—হাত ধরে বোঝাতে গেলুম, মারলে আমায় ধাক্কা—সেই ধাক্কায় দেরাজের কোণে লেগে কপালটা কেটে গেল!

অম্বুজা নিস্পন্দ—তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

পদ্ম কহিল—কোনো দুঃখ হয় না আর।···এ আমার ললাট-লিপি, ভাই। কত লোকের স্বামী যে কত কুকাজ করে বেড়াচ্ছে! এর আর কোনো দোষ তো নেই! তাছাড়া ঐ মেজাজ নিয়ে আগে যাকে-তাকে ঠেঙিয়ে বেড়াতো। আমিই মিনতি করতুম, বলতুম—ওগো, পরের উপর অমন তম্বী করো না—রাগ হয়, সে রাগ আমার উপর বর্ষণ করো···তা ভাই, সে কথা যে রাখে না, তা বলতে পারি না।···আমার উপর এ তম্বী—এটুকু না করলে বাঁচবে কেন? বলে, পুরুষ হলে মেজাজও পুরুষের চাই!

এ কথায় অম্বুজার পক্ষে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দায় হইল। সে হাসিল, হাসিয়া কহিল—তা বটে!···তা হ্যাঁ পদ্ম—

পদ্ম কহিল—কি?

অম্বুজা কহিল—তুমি না খুব বইটই পড়ো! বইয়ে এই সব কথা লেখে—না, যে, স্ত্রীর উপর স্বামী জুলুম এমনি অত্যাচার করবে—স্বামীর কাছে স্ত্রীর সম্ভ্রম কত, পাড়ার লোকে যাতে এক নিমেষে বুঝে নেবে?

পদ্ম কহিল—ও নিয়ে মিছে বলা, ভাই। বলুম তো, আমার ললাটের লিখন এই—কাজেই আমার সয়ে গেছে। ···তা, বসো···

দু'জনে তক্তাপোষে বসিল—সামনে জানলা খোলা। খোলা জানলা দিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের একাংশ দেখা যাইতেছিল। একখানা ট্রেণ দাঁড়াইয়া আছে। মেয়ে-কাম-রার জানলায় সুন্দর একটি মুখ, এক তরুণী যাত্রিনীর; আর প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া এক তরুণ বাঙালী। দুজনে কথা কহিতেছিল। পদ্ম কহিল—শুয়ে শুয়ে বই পড়ি আর ট্রেণ এসে দাঁড়ালে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, কত দেশের কত রকম লোকই নিত্য যাচ্ছে আসছে··এমন ভালো লাগে!···

বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। পদ্ম কহিল—তোমার সে আসনখানা বোনা হলো?

অম্বুজা কহিল—সেই পদ্ম-ভরা জল, আর মাঝখানে রাজহাঁস?

পদ্ম কহিল—হাঁ।

অম্বুজা কহিল—শেষ হয়ে গেছে,—ঘরগুলো পুরোতেই যা শুধু বাকী। হয়ে যেতো—কিন্তু ভাই, লেশ নিয়ে পড়েচি।···তবে মিছে সব!

—কেন?

অম্বুজা কহিল—ঐ যে দুখানা কার্পেটের ছবি বুনে-ছিলুম, বাঁধানো হলো না! পড়ে থেকে একখানা আশুলায় কেটে দিলে, আর একখানা ময়লা হয়ে গেল। তার পর এই লেশ—কম বুনে রেখেচি? একটি গাদা! ওঁকে এত বলি যে, ওগো, কিছু কাপড়ের টুকরো এনে দিয়ো,—ওঁর আর সময় হয় না। দাবা নিয়েই মত্ত!···বেশী তাগাদা দিলে বলেন,—কোথায় সব পাওয়া যায়, জানি না!

পদ্ম কহিল—এঁকে দিয়ে আনিয়ে নেবে? বলো যদি তো আমি ব্যবস্থা করি।

অম্বুজা কহিল—ওঁকে বলবো'খন।···

সরকারী-দাসী লক্ষ্মীর মা একগাদা দামী কাপড়-সমেত ঘরে ঢুকিল, কহিল—একটু একটু মেঘ করচে, মা। কাপড়গুলো রোদ থেকে তাই তুলে আনলুম।—আমায় তো আবার বাজারে যেতে হবে—তোমার মাংস আনতে। এখন খাশী কাটে তারা, এই বেলা না গেলে ভালো মাংস পাবো না।

—মেঘ করচে?—পদ্ম ও অম্বুজা দুজনেই আকাশের পানে চাহিল। ভাদ্র মাস—কখন্ মেঘ জমে, কখন সরে, তাও যেমন আগে হইতে ধরা কঠিন, তেমনি বৃষ্টিও যে কখন্ ফশ্ করিয়া দু'এক পশলা ঝরিবে, তারো কোনো ঠিকানা নাই!

পদ্ম কহিল,—মাদুর পেতে মাদুরের উপর ওগুলো রাখ্···তারপর আমি গুছিয়ে তুলবো।

দাসী মাদুর পাতিয়া তাহার উপর কাপড়গুলা রাখিয়া চলিয়া গেল।

অম্বুজা দেখে, দু-তিনখানি রঙীন শিল্কের শাড়ী, ব্লাউশ, সেমিজ, সায়া। বেশ সৌখীন জিনিষ।

অম্বুজা কহিল—এ সবাতো পুরোনো নয়। কবে কেনা হলো?

হাসিয়া পদ্ম কহিল—কিনলেই হলো! ওঁর মেজাজ বৈ তো নয়! এর এক-একটির সঙ্গে আমার কত লাঞ্ছনা, কত শান্তির কাহিনী যে জড়ানো আছে!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অম্বুজা কহিল—কি রকম?

পদ্ম কহিল,—ঐ যে গোলাপী শাড়ী—শোনো তবে ওর ইতিহাস। সেদিন ওঁর মাংস খাবার সখ—বলে গেলেন, কোর্ম্মা খাবো। তৈরী করলুম। মাংস তো ভাই আমি কিনতে যাবো না···ঐ ষ্টেশনের কাকে ধরে কিনতে দিয়েছিলেন—সে যা মাংস দিয়ে গেল, সিদ্ধ করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল! ঝাড়া সাড়ে তিন ঘণ্টা···তারপর সে নরম হয় না। কি করি? সেই মাংসই রেঁধে রাখলুম। উনি ফিরলেন, রাত তখন বারোটা। গরম করে মাংসের বাটী ধরে দিলুম। মুখে দিয়ে বললেন—এ কি গাছ কেটে রেঁধেচো? এ মাংস মানুষে খায়? সেই মাংসের বাটী ছুড়লেন ঐ বিছানার দিকে। আমার যেমন গেরো, আমি তাড়াতাড়ি উঠলেই পারতুম—তা উঠিনি। সেই বাটী এসে লাগলো আমার পায়ের আঙুলে—নখটা উড়ে গেল। আমি যাতনায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। তখন পা ধুইয়ে দেওয়া, ওষুধ আনতে ছোটা···ব্যস্! তার দুদিন পরে বুঝি কলকাতায় গেছলেন। আপিসের কি কাজে সাহেব পাঠিয়েছিল—ফিরলেন ঐ শাড়ী কিনে।···তার পর ঐ আশমানী রঙেরটা? সে এই ব্যাণ্ডেলে আস্‌বার ঠিক আগের দিনের ব্যাপার। মগরা থেকে এখানে এলেন··· একখানা লোহার খাটিয়া ছিল। আসবার আগের দিন আমায় বললেন, ওটা নিয়ে যাবো। আমি বললুম, ওটা বহুকেলে পুরোনো পায়াটা নড়বড়ে। সেখানকার বংশী সিগনালার বখ্‌শিস চাইছিল। তাই বললুম, ওগো, এটা বংশীকে দিয়ে যাই। বেচারী! ব্যস্—দু' কথা চার কথায় একেবারে মারমূর্ত্তি! সে খাট মাঠে নিয়ে গিয়ে দিলেন তাতে দিয়াশলাই জেলে। আমি একেবারে এতটুকু! ছি, বংশী কি ভাবলো!···শেষে রাগ চলে যেতে বংশীকে নগদ পাঁচ টাকা দেওয়া হলো, দিয়ে বললেন, তুই একখানা খাটিয়া কিনে নিস্ এ-টাকায়। ওটা ভাঙ্গা ছিল। তার পর ব্যাণ্ডেলে এসে আমায় বাসায়

রেখে উনি গেলেন কলকাতায়। ফিরলেন ঐ শাড়ী নিয়ে···

অম্বুজার মন্দ লাগিতেছিল না। এ যেন কবে সেই ছেলেবেলায়-শোনা আরব্য উপন্যাসের গল্প! দৈত্য খুব মারধর করে—আবার রাজকন্যাকে পিঠে বহিয়া সমস্ত পৃথিবী দেখাইয়া বেড়ায়!···তার স্বামী অক্ষয় তাকে প্রহার করে না, সত্য—কিন্তু এমন আদর করিয়া কিছু দেয়ও না কখনো! তার কি আছে? পূজায় নেহাত না দিলে নয়! তাও কি নিজে পছন্দ করিয়া কখনো কিনিয়া দিয়াছে? কাহাকেও ধরিয়া তাঁতিনী ডাকাইয়া বড়-জোর একখানা ফরাশডাঙ্গার নয়, শান্তিপুরের শাড়ী। তাও কখানি তার আছে?

কথা বলিতে বলিতে পদ্মর বুকের মধ্যে স্মৃতির সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল—ছেলেমানুষী কি কম! হুঁঃ। আমি বলি, এত কাপড়-চোপড়ে কি দরকার? গরীব মানুষ—কোনো জমিদার বাড়ীতে নেমন্তন্ন হচ্ছে না, থিয়েটার দেখতেও যাচ্ছিনা। কেন কেনো? তা বলে, আমি দেখবো—তোমায় নানা সাজে সাজিয়ে কেমন মানায়!···

অম্বুজার দৃষ্টি বিরক্তির পাশ কাটাইয়া ক্রমে মুগ্ধ, বিহ্বল হইতেছিল! সেই সঙ্গে বুকের মধ্যে কোথায় যেন অভিযোগও মাথা ঝাড়িয়া উঠিতেছিল!

পদ্ম কহিল—একদিনের কথা তবে বলি, শোনো, ভাই···

অম্বুজা পদ্মর পানে চাহিয়া ছিল। দু'জনের দৃষ্টি মিলিল। পদ্মর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। মুখ নামাইয়া সে কহিল—না থাক্, ভারী লজ্জা করে!

অম্বুজা কহিল—আমার কাছে আবার লজ্জা কি লা?

পদ্ম কহিল—না, যা করে,—ভাবতেই লজ্জা হয়! আমি কি কচি খুকীটি আছি? না, ও নিজেই···

বাধা দিয়া অম্বুজা কহিল—বলো, বলো···

শুনিবার আগ্রহ তার সীমাহীন।

পদ্ম কহিল—এই দশ-বারো দিনের কথা। সেদিন ছিল বুঝি পূর্ণিমা। হাঁ, পূর্ণিমাই। ঐ জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঢেউ ছুটিয়ে দিয়েছিল ঘরের মধ্যে। উনি ফিরলেন,—আমি জানলার ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এসেই করেচে কি—যাক্ সে কথা—ঘুম ভেঙ্গে গেল। বললে, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল—বড্ড লোভ হলো কি না! আমি উঠে পড়লুম—তা আমায় ধরে বসলো, তোমায় সাজতে হবে! আমি অবাক্! তা করলে কি—

এই অবধি বলিয়া পদ্ম হাসিয়া উঠিল, কহিল—না ভাই, ভারী লজ্জা করচে! বলতে পারবো না।

অম্বুজা কহিল—লক্ষ্মীটি, ভাই, বলো···

পদ্ম কহিল—উঠে পাউডারের কৌটো বার করলে। আমায় পাউডার মাখানো হলো। মাথিয়ে বললে, চুল বেঁধো না—এলোচুল করো। তাই করলুম। তার পর আলমারি খুলে সিল্কের কাপড় বার করলে। আমায় পরতে হলো। তার পর জানলার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখলে ঝাড়া ঠিক আধ ঘণ্টা···দেখার সাধ আর মেটে না! পা আমার ব্যথায় ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো।

পদ্ম হাসিতে লাগিল। অম্বুজা গুম্ হইয়া রহিল। সে যেন পটে-আঁকা বিচিত্র ছবি দেখিতেছিল! সহসা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া কহিল—ও ভাই, বেশ মেঘ করে এলো যে। যাই, আজ কতকগুলো বড়ি দিয়েছি আবার···তুলিগে—না হলে সব যাবে।···

অম্বুজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এতটুকু বিলম্ব না করিয়া নিজের গৃহে ফিরিল।

৪

তার পর কলরব-কোলাহল কি পাশের বাড়ীতে উঠিত না? উঠিত। না ওঠাই আশ্চর্য্য! কারণ সে ব্যাপার নিত্য-ক্রিয়ায় দাঁড়াইয়াছে!

তবে এখন কলরব উঠিলে অম্বুজা রাগ করে না—স্তব্ধ হইয়া দেওয়ালের আড়াল হইতে শোনে! ভাবে, কাল পদ্ম আবার কি সোহাগের উপহার পাইবে, ছাখো!

এত অশান্তিতেও কি সুখেই না আছে! স্বামী শাসন করে? করুক শাসন!—আদরেরও সীমা নাই! আর সে···?

ভোলানাথ স্বামী···সব ভুলিয়া আছে! স্ত্রী যে একটা চেতন পদার্থ—তার মন আছে, সে-মনে সাধ আছে, আশা আছে—মুখের পানে কখনো চাহিয়াছে কি? এ-মুখে কঠিন আঘাত কখনো দেয় নাই, সত্য! কিন্তু আদরের একটা চুম্বনও দিতে আসে না! নারী হইয়া, স্ত্রী হইয়া সে শুধু রান্না-বান্না করিয়াই দিন কাটাইতেছে—সংসার-যন্ত্রের চাকা ঘুরাইতেছে···ঠিক ঐ এঞ্জিনখানার মত!

কিন্তু এঞ্জিনও স্নেহ পায়। তার ধোওয়া-মোছা, তেল-কয়লার জোগান্ ঠিক হয় কি না, মালিকের সেদিকে লক্ষ্য আছে চিরকাল। আর সংসারের এঞ্জিন সে—তার মনের দাবী? সে দাবী কতখানি মিটিতেছে, এ-এঞ্জিনের মালিক সেদিকে সম্পূর্ণ উদাসীন! আপিসের কাজ, অবসর মিলিলে দাবা আর তাস—ব্যস্, তার জীবনের কাজ সারা হইয়া গেল!·····

এ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার কার্শন সাহেব কি একটা শুইপে দেড় হাজার টাকা পাইয়াছে। ষ্টেশন-শুদ্ধ লোক ধরিয়া বসিল—খাওয়াও সাহেব।

সাহেব লোক ভালো, কহিল—All right.

ষ্টেশনের অদূরে অনেকখানি খালি জায়গা পড়িয়া ছিল। তার উপর পাল খাটাইয়া পার্টির ব্যবস্থা হইল। বাঙালী খানা, ইংরাজী খানা—সেই সঙ্গে বায়োস্কোপ আর বাই-নাচ। বাঙালী কর্ম্মচারীদের নিমন্ত্রণ হইল সপরিবারে। ষ্টেশনে একেবারে জীবনের তরঙ্গ ছুটিল।···

অক্ষয় ও অনাদিরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—সস্ত্রীক। অনাদি সেইখানেই থাকিয়া গেছে। পর্দ্দা খাটাঙ্কে, চেয়ার সাজানো—কোথাও না ত্রুটি ঘটে! অক্ষয়কেও তদ্বির করিতে হইতেছে—সাহেব যদি রাগ করে!···

বেলা তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। পদ্ম আসিয়া অম্বুজাকে ডাকিল—ও ভাই···

অম্বুজা চুল বাঁধিতেছিল। পদ্মর হাতে সাবান, কাঁধে গামছা ঝুলানো। পদ্ম কহিল—তোমার হলো? আমি এলুম, একসঙ্গে গা ধোবো বলে—

স্নানের জায়গা দু'বাড়ীতেই আছে। পদ্ম কহিল—তোমার পিঠ আমি রগড়ে দেবো, আর তুমি ভাই আমার পিঠ রগড়ে দেবে। সাফ্-সুৎরো হয়ে যেতে হবে তো। ওদের মেম-সাহেবরা আসবে—চোখোচোখিও হবে—ওরা না ভাবে, বাঙালীর মেয়েগুলো নোঙরা ভূত!

অম্বুজা কহিল—আমি কিন্তু যাবো কি না, ঠিক বুঝতে পারচি না, ভাই।

বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া পদ্ম কহিল,—সে কি ভাই, যাবে না কি? এমনি তো খাঁচার পাখী হয়ে আছি বারো মাস—কোথাও বেরুতে পাই না—না কোনো আমোদ, না আহ্লাদ! আজ যদি বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়েচে···

পদ্মর মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি! অম্বুজা তা লক্ষ্য করিল। ম্লান মুখে সে কহিল—আমার কি ছাই ভদ্র কাপড়-চোপড় কিছু আছে! সেই কোন্ কেলে ফরাশ-ডাঙ্গার এক কালাপাড় শাড়ী—তা পরে নাপতিনী সেজে যাবো কি করে?

পদ্ম কহিল—কেন, সিল্কের শাড়ী?

অম্বুজা কহিল—কবে আর কিনে দেছে, বলো?

পদ্ম কহিল—তা বলে যাবে না ভাই? বায়োস্কোপ আছে, নাচ আছে—এ-সব দেখা তো ভাগ্যে ঘটে না··

অম্বুজা কহিল—না ভাই, কাপড় নেই। আমার যাওয়া হলো না!

পদ্ম কহিল—অক্ষয় বাবুকে বললে না কেন ভাই—উনি একখানা শিল্কের শাড়ী আর কিনে আনতে পারতেন না? এই হুগলী চুঁচড়োতেই পাওয়া যায়!

—তা তো যায়। কিন্তু কখন্ কেনে, বলো? কাল বলেছিলুম। তা বললেন,—তাইতো, তোমার শিল্কের শাড়ী না হলে তো চলেও না। তা আমি ছাই ও-সব চিনি না। কোথায় ভালো কাপড় পাওয়া যায়, তাও জানি না···ব্যস্ ···তারপর বোড়ের কথা ভাবতে লাগলেন!

পদ্ম কহিল—এঁকে দিয়েও তো আনাতে পারতেন!

অম্বুজা কহিল—ও কি মানুষ! জানে, চাল-ডাল কিনে দিচ্ছি, কয়লা আনিয়ে দিচ্ছি—বৌ রাঁধচে-বাড়চে, খাচ্ছে-দাচ্ছে—আর তাকে দেবার কি আছে!···

পদ্মর হাসি-মাখা মুখখানি অম্বুজার কথায় বেদনা-মলিন হইয়া উঠিল। সে একটু স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—যদি কিছু না ভাবো ভাই, তো একটা কথা বলি,—বোনের চোখে ছাখো বলেই এ-কথা বলার ভরসা হচ্ছে···

অম্বুজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পদ্মর পানে চাহিয়া রহিল।

পদ্ম কহিল—আমার যে শিল্কের শাড়ীখানা তোমার পছন্দ হয়···আমার যখন আছে—সত্যি ভাই, তুমি না গেলে আমিও যাবো না। বোনের মত দুজনে পাশাপাশি আছি·· তোমায় যেতেই হবে।

অম্বুজা পদ্মর পানে চাহিল। তার স্বরে সত্যই স্নেহের অজস্রতা! তার মধ্যে গর্ব্ব নাই, অহঙ্কার নাই···

অম্বুজা কহিল—যা বলেছিলে, খাঁচার মধ্যেই বাস করচি বটে! সখ্ করে কোথাও যে নিয়ে যাবে, তা নেই।

এখানেও ঐ চুঁচড়োয় বায়োস্কোপ হয়। তার পর ইমামবাড়ী আছে—গঙ্গাস্নান আছে, তার কিছু না! বেশ ভাই পদ্ম, তোমার একখানা শাড়ীই দিয়ো···পাঁচজনে আসবে, পাঁচরকম দেখবো—সে লোভও ছাড়তে পারচি না—অথচ এ-রকম দাসীর বেশেও যেতে পারি না···

পদ্ম কহিল—এই তো বোনের মত কথা! এবার তুমি এক কাজ করো ভাই, কিছুতে ছেড়ো না—শাড়ী-গহনা আদায় করো তাগাদায়-তাগাদায়! কেন দেবেন না? কি এমন খরচ?···

অম্বুজা কহিল—সত্যি!···

৫

বায়োস্কোপ দেখিয়া নিমন্ত্রণ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত একটা বাজিয়া গেল। পদ্ম আর অম্বুজা যে যার গৃহে গেল। অক্ষয় ও অনাদি এখনো ফিরে নাই। সাহেবরা নাচের আসর ছাড়িতে চায় না, কাজেই বাঙালী বাবুদেরও থাকিতে হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিয়া অম্বুজা বিছানায় পড়িয়া অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল—নিমন্ত্রণে মেমেরা যোগ দিয়াছিল,—বড়বাবুদের বাড়ীর মেয়েরাও আসিয়াছিল—অবস্থা যেমন হোক, বেশ-ভূষায় সে-অবস্থা সকলে ঢাকিয়াই আসিয়াছিল! দারিদ্র্য লইয়া গৃহের মধ্যে যতই দুঃখ করি, বাহিরে আর পাঁচজনের কাছে সে দুঃখ জাহির করিব কেন? আহা বলিয়া কৃপা-চক্ষে চাহিবে? না, তা সহ্য হইবে না!···

ঐ পদ্ম···! তার স্বামী যে-মাহিনা পায়, অক্ষয়ও তাই পায়! তার সংসারে সে আর তার স্ত্রী—অক্ষয়ের সংসারেও তাই। স্ত্রীর উপর তার পীড়ন? ও পীড়ন গায়েও লাগে না, স্বামী যদি আদরে-সোহাগে পর মুহূর্ত্তে চিত্তে অমন তৃপ্তি আনিয়া দেয়!

পদ্মর তুলনায় তার জীবন ব্যর্থ,···একেবারে ব্যর্থ, নিরর্থক!···

আকাশে যেমন তারার সংখ্যা নাই, অম্বুজার মনে চিন্তাও তেমনি সংখ্যাহীন!···

ঐ ··ও বাঁড়ীর দ্বারে করাঘাত···না? অম্বুজা উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ঐ দ্বার খুলিল···পদ্ম নিশ্চয় আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াছে!···তার পর···? তার পর?

হয়তো পদ্ম এখনো তার অঙ্গ-সজ্জা খুলিয়া ফেলে নাই! হয়তো অনাদি বলিবে, একবার দাঁড়াও তো—কেমন তোমায় মানাইয়াছে, দেখি!···তারপর বিহ্বল দৃষ্টিতে পদ্মর পানে চাহিয়া থাকিবে—সেই আধ ঘণ্টা!·· নারীর জীবন তো সার্থক এইখানেই!···

অম্বুজা বেশভূষা ত্যাগ করিল না···এ বেশে স্বামীর সামনে সেও একবার দাঁড়াইয়া দেখিতে চায়। ভোলানাথেরও টনক নড়িয়াছিল—তার ভোলানাথ কি সে-ভোলানাথের চেয়েও ভোলা?

···কিন্তু ঐ ও-বাড়ীর অনাদি ফিরিল। অক্ষয়ের এখনো এত কি কাজ যে,গৃহে ফিরিবার কথা মনে নাই?···

বসিয়া বসিয়া অম্বুজা রাগে জ্বলিতে লাগিল।···মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হয়···ও-বাড়ীতে? কৈ কোনো কলরব নাই আজ! নিশ্চয় বিভ্রম-মোহের পালা চলিয়াছে!

অম্বুজার চোখে ঘুম নাই। দূরের কলরব শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নাচের আসরে বাজনাও আর শুনা যায় না!···

ঐ যে, ষ্টেশনের সব একে-একে ফিরিতেছে! অক্ষয়·? অম্বুজা জানলা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল।···রাত তিনটা বাজিয়া গেছে বহুক্ষণ···

ঘড়িতে চারিটা বাজিতেছে।···

দ্বারে করাঘাত।···অম্বুজা গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। অক্ষয় কহিল—বর্দ্ধন কিছুতে ছাড়লে না! বলে, এক বাজী! কাজেই খেলতে হলো। নাহলে কখন আসতুম।··তুমি জেগে না থাকলে কতক্ষণ ধরে যে কড়া নাড়তুম! তোমার ভাগ্যে ঘুম ভাঙ্গলো···বর্দ্ধন বলছিল, খেলে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যাক, এসো ··

বকিতে বকিতে অক্ষয় উপরে চলিল। মুখ-হাত ধুইয়া সে শুইয়া পড়িল—শুধু একবার অম্বুজাকে কহিল,—তুমি ঘুমোবে না?

অম্বুজা সগর্জ্জনে কহিল—না।

অক্ষয় কহিল—ঘুমের সময় চলে গেছে···তাই। তবু স্থির হয়ে শুয়ে চোখ বুজে থাকো···ঘুম আসবেই।

অম্বুজা ভাবিল, রুখিয়া বলে, চোখ সে বুজিয়াই আছে চিরদিন—কিন্তু আরো···?

তার দুই চোখে ঝর-ঝর ধারে অশ্রু ঝরিল। পরের কাছ

হইতে ধার-করা বেশভূষায় নিজেকে সে সাজাইয়াছে—স্বামী তাকে দেখুক···সে নারী!

কিন্তু হায়, স্বামী ফিরিয়াও চাহিল না! বেশভূষা সাপের মত যেন তাকে বেড়িয়া ধরিয়াছে!

সে-বেশ ছাড়িয়া নিজের সেই আধ-ময়লা শাড়ী পরিয়া পদ্মর সিল্কের শাড়ী ভাঁজ করিয়া সে তুলিয়া রাখিল। তারপর বিছানার ধারে গিয়া দাঁড়াইল, অক্ষয় বেশ ঘুমাইতেছে। তার নাক ডাকিতেছে।

অম্বুজার মনে হইল, ঐ পাথরের পুতুলটাকে রীতিমত নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া তুলিয়া তাকে সে বলে, এমন শান্ত মাটীর পুতুল হইতে কে তোমায় সাধিয়াছিল? ইহার চেয়ে দুবেলা যদি আমায় প্রহারও করিতে—কিল, চড়, ঘুষি, লাথি···যা-খুসী···তারপর একটু আদর, দু'টা মিষ্ট কথা···আমার কোনো দুঃখ থাকিত না! সোনার সিংহাসনও চাহিতাম না!···কিন্তু এ ঔদাসীন্য, এ অবহেলা···

জানলার ধারে গিয়া সে বসিল। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। বুঝি, কোথায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে!···সে বাতাসে তপ্ত শির জুড়াইয়া গেল।

তারপর কখন যে দুই চোখ ঘুমে ভরিয়া আসিল···

সকালে ঘুম ভাঙ্গিল—বেলা হইয়া গিয়াছে।

অক্ষয় মুখ-হাত ধুইয়া ঘরে ঢুকিল। তার গায়ে জামা। ডিউটিতে যাইতেছে। অক্ষয় কহিল—ও বাড়ীতে বেধে গেছে গো···এই সকালেই। একবার বরং যাও···আজ বুঝি ··

অম্বুজা উঠিয়া কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। ও-বাড়ীতে খুব তীব্র স্বর ছুটিয়াছে। অনাদির কণ্ঠ।

অম্বুজা এক পা নড়িল না। ছুটুক স্বর আরো তীব্র হইয়া! ও-কথায় যত তাপ, যত দাগ লাগুক—পরক্ষণেই আদরের যে স্নিগ্ধ বর্ষণ পুঞ্জিত হইতেছে···

অক্ষয় কহিল—আমি বলচি···তুমি দেখে নিয়ো, একদিন একটা খুন-খারাপী করে বসবে এই অনাদি···!

অক্ষয় চলিয়া গেল। অম্বুজা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার দুই চোখে জল।···কিন্তু কার দুঃখে?···

পদ্মর? না, তার নিজের?

দক্ষিণ-ভারত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

কাঞ্চী

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

"মোক্ষপ্রদ তীর্থস্থান সাতটি,—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা এবং দ্বারকাপুরী।" দক্ষিণ-ভারতে কাঞ্চী অতি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। উত্তর-ভারতে কাশী যেরূপ, দক্ষিণে কাঞ্চী সেইরূপ। মাদ্রাজ হইতে কাঞ্চী ৪৭ মাইল। ভাল রাস্তা আছে, মোটরে যাওয়া যায়। আমরা বৈকালে ৩৷৷০টার সময় মোটরে মাদ্রাজের অন্তর্গত স্যানথোম পল্লী (San Thome) হইতে রওনা হইলাম। মাইলাপুর ছাড়িয়া মাউণ্টরোড ধরিলাম। সৈদাপেট উপনগরী অতিক্রম করিয়া আমরা St. Thomas Mount এর নিকট উপস্থিত হইলাম। ছোট পাহাড়, তাহার উপর দুই একটি বাড়ী, সুন্দর দেখাইতেছিল। এখান হইতে আমরা চিঙ্গলপতের রাস্তা ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে চলিলাম। দক্ষিণে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দুর্য্যোগ সূচনা করিতেছিল। এই জন্য আমরা শীঘ্র যাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু মোটর বিকল হওয়াতে বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে হইল। অল্পক্ষণ মধ্যে মোটরের কল সারান হইল, আমরা আবার অগ্রসর হইলাম; এবং শীঘ্রই মাদ্রাজ হইতে রাণীপেট যাইবার রাস্তা পাইলাম। এই রাস্তায় দুই এক মাইল যাইয়া আমরা পুনামালী গ্রামে উপস্থিত হইলাম। পুনামালী মাদ্রাজ

হইতে ১২ মাইল। রামানুজের গুরু তিরিকুচকুণ্ডরম এই গ্রামে বাস করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এ জন্য রামানুজের পত্নী ইঁহাকে ভক্তি করিতে পারেন নাই। পুষ্করিণীতে গুরুপত্নীর জল গায়ে লাগিয়াছিল বলিয়া রামানুজের পত্নী কলহ করিয়াছিলেন, এবং গৃহাগত গুরুর উচ্ছিষ্ট অবজ্ঞাভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পুনামালী ছাড়িয়া আমরা দ্রুতবেগে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। প্রান্তরের মধ্যে স্থানে স্থানে তালবৃক্ষ-শ্রেণী। দক্ষিণে আকাশের গায়ে দুই চারিটি ছোট পাহাড় দেখা যাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে আমরা দুই একটী গ্রাম অতিক্রম করিতেছিলাম। রাস্তার উপর Sign boardএ গ্রামের নাম ইংরাজিতে লেখা ছিল।

দূর হইতে শিব-কাঞ্চীর মন্দির

মাঠে শস্য ছিল না। পথের ধারে ছোট ছোট পুষ্করিণী, কখনও দূরে দুই একটী বিস্তীর্ণ জলাশয় দেখা যাইতেছিল। ৩০ মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা শ্রীপেরুমবুদুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এখানে রামানুজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য এখানে বৈষ্ণবদের একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। আমাদের উচিত ছিল কাঞ্চী যাইবার পথেই এই মন্দির দর্শন করা। কিন্তু পাছে কাঞ্চী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অন্ধকার হইয়া যায়, এই ভয়ে আমরা দর্শন না করিয়াই কাঞ্চী চলিলাম। ভাবিলাম ফিরিবার সময় দর্শন করিব। ইহার ফলে মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই; কারণ ফিরিবার সময় মন্দির খোলা পাই নাই। শ্রীপেরুমবুদুর অতিক্রম করিয়া আমাদের পথ ঈষৎ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চলিল। সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। পথিকগণ গোযানে বা পদব্রজে বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। গরুর দল ধূলি উড়াইয়া গ্রামে ফিরিতেছিল। দূরে আকাশের গায়ে শিব-কাঞ্চীর সমুন্নত গোপুরম শোভা পাইতেছিল; এবং তাহার নিকটেই বিষ্ণু-কাঞ্চীর অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দির দেখা যাইতেছিল। তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া আমাদের মোটর অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ বায়ু-পরিপ্লাবিত প্রান্তর অতিক্রম করিয়া নিম্নোন্নত পথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। অবশেষে কাঞ্চীর নিকটে আসিয়া একটি বাঁধের ধার দিয়া দক্ষিণ মুখে চলিল। তাহার পর রেল লাইন পার হইয়া কাঞ্চী নগরীতে প্রবেশ করিল।

শিব-কাঞ্চীর প্রধান মন্দিরের নিকট একটী সংস্কৃত বিদ্যালয়-গৃহে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম। এই বিদ্যালয়-গৃহ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরি মঠের সম্পত্তি। জিনিষ-পত্র রাখিয়া আমরা মন্দিরে চলিলাম। এই মন্দিরটী একাম্রনাথের মন্দির বলিয়া পরিচিত। মন্দিরের দক্ষিণের গোপুরমটি ১৮৮ ফিট উচ্চ। ইহার ভিত্তি চতুষ্কোণ—উপরের দিকে আয়তন ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। এই গোপুরম দশ তালায় বিভক্ত। প্রত্যেক তালায় দক্ষিণে একটি দ্বার, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া দ্বারপাল। ইহা ব্যতীত বহু দেবদেবী লতাপাতার ছবিতে গোপুরমটী আপাদমস্তক সমাবৃত। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় এই গোপুরমটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গোপুরমের মধ্যে কোন বিগ্রহ নাই, ইহা প্রবেশদ্বার মাত্র। গোপুরমের দরজা দুইটির আকার এত বৃহৎ যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শিব-কাঞ্চীর মন্দির বহুবিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত, চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। গোপুরম অতিক্রম করিলে ভিতরে আর একটি উচ্চ প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় প্রাচীরটির মধ্যে মূল মন্দির বিরাজিত। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ আছে। সারি সারি বহুসংখ্যক স্তম্ভের উপর উচ্চ ছাদ অবস্থিত। স্তম্ভগুলি নানাবিধ ভাস্করকার্য্যে সুশোভিত। ইহা অতি পুরাতন এবং স্থানে স্থানে সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ছাদের উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। দ্বিতীয় প্রাচীর দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য পূর্ব্বে বোধ হয় ইহার

গায়ে দরজা ছিল, এক্ষণে তাহা ভাঙ্গিয়া খালি জায়গা পড়িয়া আছে। এই পথে ভিতরে প্রবেশ করিয়া মূল মন্দিরের সম্মুখে সারি সারি স্তম্ভের দ্বারা শোভিত সুবিস্তৃত মণ্ডপ দেখিতে পাইলাম। স্তম্ভগুলি বিচিত্র কারুকার্য্য দ্বারা শোভিত। মণ্ডপের উত্তরে প্রাচীন পুষ্করিণী। মণ্ডপের মধ্য দিয়া পশ্চিম অভিমুখে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দরজার পার্শ্বে মহাদেবের বাহন বৃষভের বৃহৎ মূর্ত্তি। দ্বারের উপর বহুসংখ্যক দীপ জ্বালা হইয়াছিল। মন্দিরের চারি দিকে পরিক্রম করিবার সুদীর্ঘ পথ, পথের উপর ছাদ এবং পথের চারি দিকে বারাণ্ডায় অসংখ্য শিবলিঙ্গ এবং ভক্তদের মূর্ত্তি প্রভৃতি বিরাজিত। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে উচ্চ প্রস্তরবদ্ধ প্রাঙ্গণের উপর একটি প্রাচীন আম্রবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের চারিটি শাখায় চারি প্রকার ফল ধরে—ইহা কেবল পাণ্ডারা নহে, স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও বলিলেন। এই বৃক্ষটি খুব পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। স্থলপুরাণে (মন্দিরের ইতিবৃত্তযুক্ত পুরাণে) লিখিত আছে যে একদা ভগবতী কৌতূহলবশতঃ নিজ করপল্লব দ্বারা পশ্চাৎদিক হইতে মহাদেবের তিনটি চক্ষু আবৃত করিয়াছিলেন। ইহাতে জগৎ প্রলয়োন্মুখ হইল এবং জগতের যাবতীয় প্রাণী অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিল। মহাদেব ভগবতীকে বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার এই কার্য্যে যখন জগতের পীড়া হইয়াছে, তখন এই কার্য্যজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তোমার তপস্যা করা প্রয়োজন। পৃথিবীতে কাঞ্চী অতি পবিত্র স্থান। এখানে একাম্রনাথের মন্দিরে কম্পানদীর তীরে বেদময় আম্রবৃক্ষের তলে বসিয়া তপস্যা করিবে। তাহা হইলে এই দোষ হইতে মুক্ত হইবে।" এই বাক্য শুনিয়া ভগবতী নারীদেহ ধারণ করিয়া এই বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই তপস্যার চিত্র মন্দিরের নানা স্থানে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। কোথাও দেখা যায়; কামাক্ষী দেবী এক পদের উপর দাঁড়াইয়া পঞ্চাগ্নি

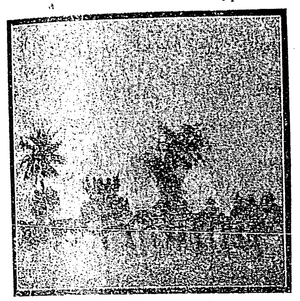

কৈলাস-নাথের মন্দির

জ্বালিয়া তপস্যা করিতেছেন; আবার কোথাও দেখা যায়, মানুষের উপর ভর করিয়া বক্ষঃ দ্বারা শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মন্দির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়কে কম্পার পরিত্যক্ত প্রবাহের স্থান বলিয়া পাণ্ডারা এখনও নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। ছয় মাস এইরূপ তপস্যার পর মহাদেব ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কামাক্ষীদেবীকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একটি উৎসব হয়। সে সময় কামাক্ষীদেবীর ভোগমূর্ত্তি এবং একাম্রনাথের ভোগমূর্ত্তি একত্র রাখা হয়।

মূল মন্দির বেষ্টনকারী বারাণ্ডায় এক স্থানে একটী সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। পূজারী আলো লইয়া দেখাইলেন—এই শিবলিঙ্গের গাত্রে সর্ব্বত্র ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গ উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন ১,০০৮ শিবলিঙ্গ দ্বারা এই শিবলিঙ্গ গঠিত হইয়াছে। একাম্রনাথের মন্দিরের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলাম—একটি গণেশের, একটি কার্ত্তিকের, একটী নর্ত্তনশীল নটরাজের—যাহার মূল বিগ্রহ চিদম্বরমে আছে। একাম্রনাথের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে আমরা এই সকল মন্দির দেখিতে লাগিলাম। মন্দিরের দ্বারদেশে সন্ধ্যারতির

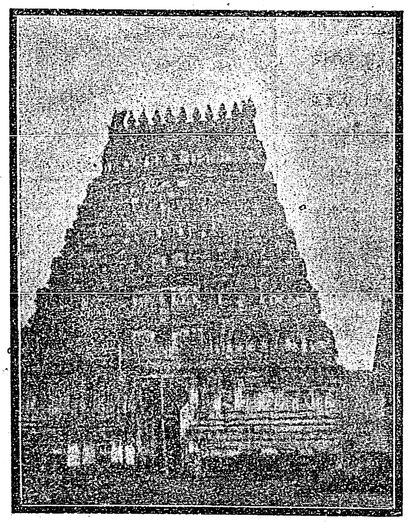

বিষ্ণু-কাঞ্চী

সানাই বাজিতেছিল, দূর হইতে তাহার মধুর শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। অতঃপর আমরা একাম্রনাথের মূল

মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। বেদীর উপর অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম আকারের কৃষ্ণবর্ণের উচ্চ শিবলিঙ্গ স্থাপিত। এই শিবলিঙ্গটি মৃত্তিকানির্ম্মিত। দক্ষিণ-ভারতে পাঁচটি স্থানে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতনির্ম্মিত পাঁচটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। একাম্বরনাথের লিঙ্গ ক্ষিতিময় বলিয়া ইহা জল বা দধি দুগ্ধ প্রভৃতির দ্বারা অভিষেক করা হয় না, অভিষেকের দ্রব্য লিঙ্গের নীচে বেদীর উপর ঢালা হয়। লিঙ্গের উপর তিলক রচিত হইয়াছে এবং স্বর্ণময় যজ্ঞোপবীত দ্বারা লিঙ্গটি বেষ্টিত। নারিকেল, কলা প্রভৃতির দ্বারা পূজারী পূজা দিলেন, কর্পূর জ্বালিয়া আরতি করিলেন। আমরা প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম।

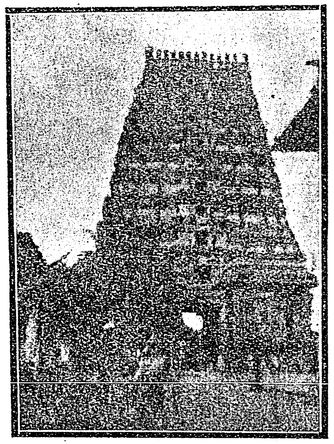

শিব-কাঞ্চী

পরদিন প্রাতে আমরা বিষ্ণুকাঞ্চী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। জানিলাম বেলা আটটার পূর্ব্বে দর্শন হইবে না। আমরা ততক্ষণ অন্য দুই একটি মন্দির দেখিব বলিয়া মোটরে বহির্গত হইলাম। কাঞ্চীর পথগুলি অতিশয় প্রশস্ত এবং সরল। পথের দুই পার্শ্বে পয়ঃপ্রণালী, তাহার পর নারিকেল বা অপর বৃক্ষের শ্রেণী, তাহার পর গৃহ। এজন্য পথগুলি দেখিতে খুব সুন্দর এবং গৃহগুলিও স্বাস্থ্যকর। কাঞ্চীনগরী পল্লবরাজগণের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান সুগঠিত রাজপথ এবং বহুসংখ্যক মন্দির কাঞ্চীর সেই প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। শুনিলাম, নগরী-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত প্যাট্রিক গেডেস কাঞ্চী নগরীর নির্ম্মাণ-কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন নগরী কাঞ্চী এবং উত্তর-ভারতের প্রাচীন নগর লাহোর—উভয়ের পার্থক্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। উত্তর-ভারতের নগরের পথগুলি অতিশয় অপ্রশস্ত। দুই ধারে তিন-চারি তালা বাড়ী। পথের উপর লোকের চলিবার এবং গাড়ি যাইবার স্থান নাই, গৃহে আলোক ও বাতাস আসিতে পারে না। আমরা কিছুদূর গিয়া বৈকুণ্ঠ পেরুমল নামক বিষ্ণুমন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই মন্দিরটি অতিশয় প্রাচীন। ইহার বিশেষত্ব এই যে মন্দিরবেষ্টনকারী বারণ্ডায় সমস্ত গাত্র ভরিয়া নানাবিধ ঘটনাব্যঞ্জক অসংখ্য মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, পল্লব-রাজবংশের ইতিহাস এই সকল মূর্ত্তি দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এখান হইতে আমরা কৈলাসেশ্বরের মন্দিরে চলিলাম। নগরের বাহিরে মাঠের মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে কিছুদূরে বৃষভমূর্ত্তি। তাহার উত্তরে ক্ষুদ্র জলাশয়। মন্দিরের দ্বার বন্ধ ছিল, পূজারী তখনও আসেন নাই। আমরা বাহির হইতে মন্দিরের গঠননৈপুণ্য দেখিয়া জলের কল দেখিতে গেলাম। বেগবতী নদীর প্রবাহের তীরে জলের কল স্থাপিত। বেগবতী পালার নদীর একটি শাখা, শীতকালে জল থাকে, * এখন বিস্তৃত বালুকাময়-সৈকতমাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। নদীর প্রবাহের পার্শ্বে কূপ খনন করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া নগরে সরবরাহ করা হয়। এই জলের কলের পাশেই ডাকবাঙ্গলো। এইবার আমরা বিষ্ণুকাঞ্চী দেখিতে চলিলাম। শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী হইতে তিন মাইল দূরে। সমস্ত পথটির দুই ধারে ঘন সন্নিবিষ্ট-গৃহশ্রেণী, দোকান প্রভৃতি বিরাজমান। ইংরাজিতে শিবকাঞ্চীকে Big conjeevaram এবং বিষ্ণুকাঞ্চীকে Little conjeevaram বলে।

বিষ্ণুকাঞ্চীর গোপুরম শিবকাঞ্চীর গোপুরম অপেক্ষা ছোট। এই গোপুরম দ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বাম দিকে বিখ্যাত শতস্তম্ভ মণ্ডপ দেখিতে পাইলাম। উচ্চ মেজের উপর ১০০টী করিয়া স্তম্ভ সারি সারি সাজাইয়া এই মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভগুলি চিক্কণ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভের উপর উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য বিদ্যমান। অশ্ব সম্মুখের দুইটি পা তুলিয়া আছে, তাহার উপরে যোদ্ধা

* মান্দ্রাজ অঞ্চলে শীতঋতুতে বর্ষা হয়।

উপবিষ্ট—এই চিত্র বহু স্তম্ভের উপর দেখিলাম। একটি যোদ্ধার হাতে বন্দুক দেখিলাম। মূর্ত্তিগুলি সজীব বলিয়া বোধ হয়; বিন্দুমাত্র পুরাতন হয় নাই।

মণ্ডপটি দেখিয়া আমরা নরসিংহদেবের মূর্ত্তি দেখিলাম।

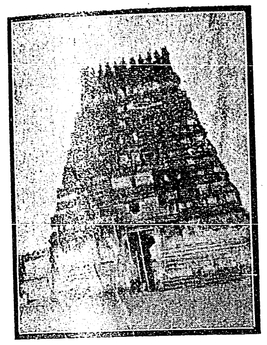

বিষ্ণু-কাঞ্চী

তাহার পর কয়েকটি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে অনেক ঘুরিয়া মূল মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মূল মন্দিরের মেঝে খুব উচ্চ। বোধ হইল, মূল মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। তাহার পর নানা সময়ে বিভিন্ন অংশ ইহাতে যুক্ত হইয়াছে। এখানে বিষ্ণুর বিগ্রহের নাম বরদরাজস্বামী। সুবৃহৎ চতুর্ভুজ দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। বক্ষে সুবর্ণ ও মরকত গঠিত ক্ষুদ্রলক্ষ্মীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে নানা আভরণ শোভা পাইতেছে। কপালে হীরা, চুণি, পান্নার দ্বারা সুন্দর তিলক রচিত হইয়াছে। পুরোহিত পূজা করিয়া যখন কর্পূর জ্বালিয়া আরতি করিলেন, তখন বিগ্রহের সর্ব্বাঙ্গে হীরক ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল।

রামানুজ গার্হস্থ্য জীবন এবং সন্ন্যাসের পরও অনেক দিন বিষ্ণু-কাঞ্চীতে বাস করিয়াছিলেন এবং বরদরাজস্বামীকে পূজা করিতেন। প্রবাদ এই যে অদ্বৈতবাদী কয়েকজন পণ্ডিত চক্রান্ত করিয়া বনের মধ্যে তাঁহাকে হত্যা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই সময় বিষ্ণু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া এক রাত্রির মধ্যে বন হইতে দূরে বিষ্ণু-কাঞ্চীর নিকট তুলিয়া আনেন এবং রাত্রে বরদরাজস্বামীর রূপ ধরিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলেন—তুমি বিষ্ণু-কাঞ্চীতে থাকিবে এবং আমার পূজা করিবে।

শ্রীচৈতন্যদেব শিব-কাঞ্চী ও বিষ্ণু-কাঞ্চী, দুই তীর্থই দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে :—

শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিবদরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন।
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥

মধ্যলীলা—৯ম পরিচ্ছেদ।

বরদরাজস্বামীর মন্দিরের বাহিরে বারাণ্ডার ছাদে দুইটি সুবর্ণময় গৃহগোধিকার (টিক্‌টিকি) মূর্ত্তি আছে। যাত্রিগণ কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া এগুলি স্পর্শ করে। পাণ্ডা ভাঙ্গা হিন্দীতে ইহাদের ইতিহাস দ্রুতভাবে যাহা বলিয়া গেলেন ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কে একজন অত্যাচারী রাজা মুনির শাপে টিক্‌টিকি হইয়াছিলেন, পরে এখানে তীর্থের মহিমায় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন—মোটামুটি এই কথা বুঝিতে পারিলাম।

বরদরাজস্বামীর মন্দির দেখিয়া আমরা বামনদেবের মন্দির দেখিতে গেলাম। এখানে বিষ্ণুর বিগ্রহ অতিশয় প্রকাণ্ড আকারের, উচ্চতায় ২৫ ফিট হইবে। কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি,—এক পদ ভূমির উপর, এক পদ ঊর্দ্ধে

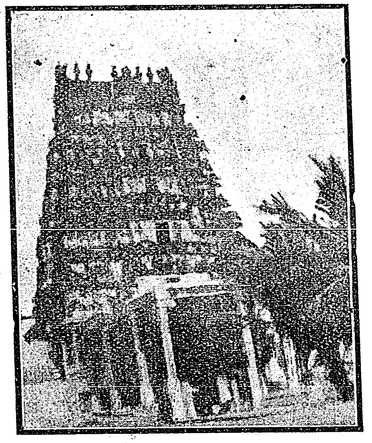

শ্রীপেরুম বুদুর

উৎক্ষিপ্ত,—নীচে বিস্ময়-অভিভূত বলি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে অন্ধকারে মূর্ত্তি তত ভালরূপে দেখা যাইতেছিল না। পুরোহিত দীর্ঘ বংশদণ্ডের অগ্রভাগে মশাল জ্বালিয়া ভগবানের মুখ এবং অঙ্গাবয়ব দেখাইয়া দিলেন।

এখান হইতে আমরা কামাক্ষীদেবীর মন্দির দেখিতে গেলাম। ইহা একটি প্রাচীন এবং বৃহৎ মন্দির। গোপুরম পার হইয়া আমরা মন্দিরমধ্যে উপস্থিত হইলাম। একপার্শ্বে বারাণ্ডায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি। কেহ কেহ বলেন, তিনি এখানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তাহা নহে। মূল মন্দিরে কামাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, সম্মুখে একটি যন্ত্র। প্রবাদ এই যে শঙ্করাচার্য্য এই যন্ত্রের মধ্যে কামাক্ষীদেবীকে অবতরণ করিতে বলিয়াছিলেন এবং শান্তমূর্ত্তিতে এখানে থাকিতে বলিয়াছিলেন। পার্শ্বে অপর একটি মন্দিরে দেবীর সুবর্ণময় ভোগমূর্ত্তি। নিকটে একটি পিত্তলের স্তম্ভের নিম্নভাগে একটি গর্ত্ত আছে। ইহাকে দেবীর নাভি বলা হয় এবং যাত্রিরা পাণ্ডার কথামত ইহা স্পর্শ করে।

বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির

শিবকাঞ্চীর সম্মুখে দুইটি উচ্চ মণ্ডপ আছে। চারি-পাঁচ সারি স্তম্ভের উপর ছাদ,—চারি দিক খোলা। প্রত্যেক স্তম্ভের উপর বিবিধ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে বিষ্ণু প্রায় দশ অবতারেই মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন শিবের মহিমাজ্ঞাপক এই সকল চিত্র নানা স্থানে দেখিতে পাইলাম। আমরা প্রথমে ভাল বুঝিতে পারি নাই। পরে একজন পূজারী আসিয়া প্রত্যেক মূর্ত্তির পৌরাণিক কাহিনী বুঝাইয়া দিলেন। পূজারী হিন্দীভাষায় বলিতেছিলেন। দক্ষিণে কেবল পাণ্ডারা এবং মুসলমানেরা হিন্দী জানে,—আর কেহ জানে না।

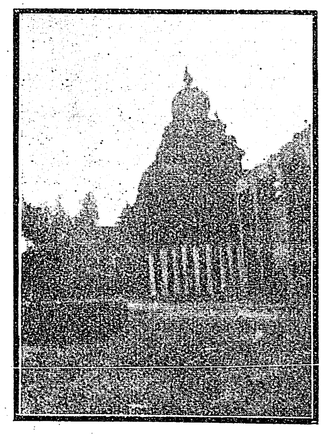

শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী উভয় স্থলেই বিগ্রহের বহুমূল্য রত্নালঙ্কার আছে। সাধারণতঃ এগুলি বাক্স বন্ধ করিয়া রাখা হয়, উৎসবের সময় বাহির করিয় বিগ্রহ শোভিত করা হয়। হীরা, চুণি, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কারগুলি সমাবিষ্ট। কতকগুলি পাথর আকারে খুব বড় এবং খুব মূল্যবান্। শুনিলাম বরদরাজস্বামীর অলঙ্কারগুলির মোট দাম ১০ লক্ষ টাকা হইবে। অলঙ্কারগুলির মধ্যে লর্ড ক্লাইভ এবং দুই একজন ইংরাজের দেওয়া অলঙ্কার দেখিলাম। একাম্রনাথের (শিবকাঞ্চীর) অলঙ্কারগুলির মোট মূল্য এক লক্ষ টাকা মাত্র। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে চোর একাম্রনাথের অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়াছিল। তাহার মধ্যে মাত্র দুই একটী গহনা পাওয়া গিয়াছিল। একাম্রনাথের "বাহন"-গুলিও বেশ সুন্দর। প্রকাণ্ড রৌপ্যমণ্ডিত [illegible] মূর্ত্তি, একটি স্বর্ণমণ্ডিত ও একটি রৌপ্যমণ্ডিত বৃষমূর্ত্তি, এবং আরও কয়েকটী "বাহন" দেখিলাম। শোভাযাত্রার সময় ভোগমূর্ত্তি এগুলিতে আরোহণ করিয়া নগর পরিভ্রমণ করেন, এইজন্য ইহাদিগকে বাহন বলা হয়। অলঙ্কার এবং বাহনগুলি দেখিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত না করিলে যাত্রীরা দেখিতে পান না।

কাঞ্চীতে সর্ব্বতীর্থ নামক একটি সরোবর আছে। ইহার চারি দিকে বাঁধান ঘাট। ঘাটের ধারে বহুসংখ্যক মন্দির। সরোবরের জল বেশ ভাল।

সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই গোপুরমের প্রতি কক্ষে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হয়। দ্বারপ্রান্তে সানাই বাজিতে থাকে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গোপুরমের দীপালোক জ্বলিতে থাকে। আমরা গ্রীষ্মের জন্য গৃহের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রে ক্রমশঃ নগরী নিস্তব্ধ হইয়া গেল, রাজপথগুলি জনহীন হইল, নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের গায়ে গোপুরমের সমুন্নত দেহ আপাদমস্তক আলোকমণ্ডিত হইয়া অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল। আমরা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

—

পক্ষীতীর্থ

সকালে ৭টার সময় আমরা মান্দ্রাজ হইতে মোটরে রওনা হইলাম। সান্থোম ও মাইলাপুর অতিক্রম করিয়া সুপ্রশস্ত মাউণ্ট রোড ধরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে চলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সেণ্ট টমাস মাউণ্ট দৃষ্টিগোচর হইল। মাইলাপুরের রাজপুত্রকে খৃষ্টান ধর্ম্মে

দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজার অনুচরগণ এইখানে সেণ্ট লিউকের শিষ্য সেণ্ট টমাসকে হত্যা করিয়াছিল। তাহারা প্রথমে ছোট পাহাড়টি ঘেরিয়াছিল। সেণ্ট টমাস তখন গির্জার মধ্যে ছিলেন। আততায়ীদের আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি গির্জার মধ্যস্থিত সুড়ঙ্গ দিয়া বড় পাহাড়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও রক্ষা পান নাই। সে আজ সহস্র বৎসরেরও অধিক হইল। তখন ইংরাজগণ ধর্ম প্রচারকরূপে এ দেশে দেখা দিয়াছিলেন মাত্র, রাজবেশ পরিধান করেন নাই। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত বিমান কোম্পানীর বিস্তীর্ণ মাঠ দেখিতে পাইলাম। দুই তিনটি ছোট ছোট বিমান এখানে বিশ্রাম করিতেছিল। আমরা দেখিতে দেখিতে একটি বিমান মাঠের উপর দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। ক্রমশঃ লোকালয় বিরল হইয়া আসিল। বামে ও দক্ষিণে, নিকটে ও দূরে পাহাড়ের শ্রেণী। কোথাও বা ঘনসন্নিবিষ্ট অনুচ্চ বৃক্ষাবৃত বনভূমি। ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মধ্য দিয়া রৌদ্রের তেজ বেশী প্রকটিত হইতে পারে নাই। সেই স্নিগ্ধ প্রভাতে নির্জ্জন অরণ্য ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে যাইতে যাইতে পথটি পরম রমণীয় বোধ হইল। রেল লাইন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল। আমরা লাইনের উপর দিয়া পার হইয়া কখনও রেল লাইনের পূর্ব্ব, কখনও পশ্চিম দিক দিয়া যাইতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে দুই একটি রেল দেখিতে পাইলাম—যাত্রিগণ আমাদের দিকে এবং আমরা যাত্রীদের দিকে কৌতূহলপরবশ হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। ৩০ মাইল এইভাবে গিয়া একটি পর্ব্বতবেষ্টিত বিশাল জলাশয় বামে রাখিয়া আমরা চিঙ্গলপৎ সহরে প্রবেশ করিলাম। ইহা চিঙ্গলপৎ জেলার প্রধান নগর। এখান হইতে আমরা পূর্ব্বমুখে তিরুকালুকুণ্ডরমের পথ ধরিলাম। চিঙ্গলপৎ হইতে তিরুকালুকুণ্ডরম ৯ মাইল। এখানে একটি পাহাড়ের উপর বেদগিরীশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। মন্দিরের একটু নীচে একটি বড় পাহাড়ের উপর প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে দুইটি চীলের ন্যায় শ্বেত পক্ষীকে ভোগ দেওয়া হয়। প্রবাদ এই যে, ইহারা শাপগ্রস্ত মুনি। এই পক্ষী দুইটির জন্য তীর্থ টি পক্ষীতীর্থ নামে পরিচিত। আমরা যখন পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় ১০টা। পক্ষীদের ভোগের

পক্ষিতীর্থ—পাহাড়ের উপর হইতে দৃশ্য

বিলম্ব আছে বলিয়া, আমরা প্রথমে পাহাড়ের নীচে একটি শিবালয় দেখিতে গেলাম। এখানে বিগ্রহের নাম ভক্তবৎসল। মন্দিরটি প্রাচীন ও বৃহৎ। কারুকার্য্যও যথেষ্ট

পক্ষিতীর্থ—পাহাড়ের উপর হইতে দৃশ্য

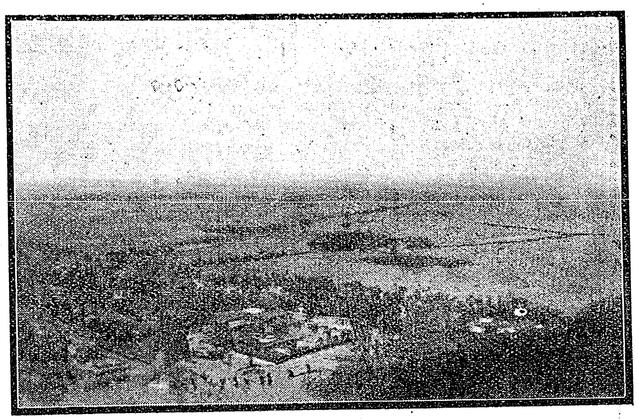

আছে। কিন্তু পূজারিগণ মন্দিরটি বেশ পরিষ্কার করিয়া রাখিতে পারেন নাই। মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরের পাশে

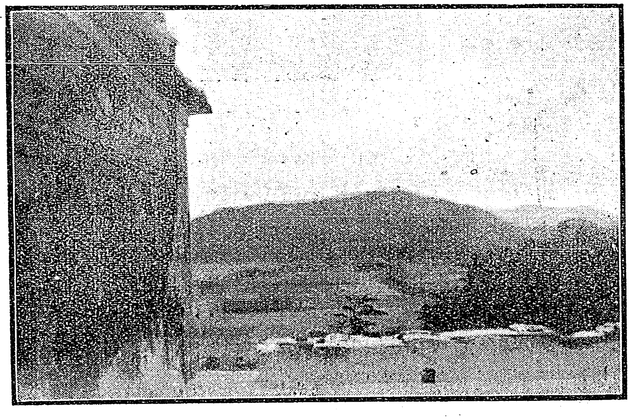

ত্রিপুরাসুন্দরী নাম্নী দুর্গাদেবীর মন্দির,—ইহার সম্মুখের মণ্ডপটি নবনির্ম্মিত বলিয়া মনে হইল। মন্দিরের পৌরাণিক ইতিবৃত্তে লিখিত আছে যে, সুরগুরু নামক পল্লব-বংশীয় নরপতি মহাবল্লীপুরে রাজত্ব করিতেন। তিনিই ভক্ত-বৎসলের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই পুরাণে বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার চিত্র মন্দিরের মধ্যে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—রাজা শিকার করিতে গিয়া একটি সজারুকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই সজারুর দেহ হইতে একটি রাক্ষস বহির্গত হইয়া বলিল, মার্কণ্ডেয় ঋষির শাপে সে এত দিন সজারু হইয়া ছিল, এক্ষণে মুক্তি পাইল। আর একটি গল্প এই যে সুরগুরু ভ্রমক্রমে গোহত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রথের চাকায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু গাভীর দেহ হইতে একটি রমণী বাহির হইয়া বলিল যে সে তিলোত্তমা, নন্দীকে গাভীরূপ ধারণ করিয়া প্রলোভিত করিতে গিয়াছিল বলিয়া নন্দীর শাপে গাভী হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে মুক্ত হইল। অতএব রাজা কোন পাপ করেন নাই। মন্দির মধ্যে কয়েকটি শিলা-লিপি পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে একটি গোপুরম আছে, নাম ঋষি গোপুরম। মন্দির মধ্যে গণেশ, কার্ত্তিক, বীরভদ্র প্রভৃতির কয়েকটি ছোট মন্দির আছে। মন্দিরের চারি দিকে বারাণ্ডায় ৬৩ জন শৈব ভক্তের মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ যে, তিনজন বিখ্যাত সাধু এই তীর্থে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পাহাড়টি পবিত্র বলিয়া তাহার উপর পদক্ষেপ করিয়া উপরের মহাদেবকে দর্শন করিতে যান নাই, পাহাড়ের নীচে থাকিয়া মহাদেবের স্তব করিয়াছিলেন। যে স্থানে তাঁহারা স্তব করিয়াছিলেন সেইখানে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

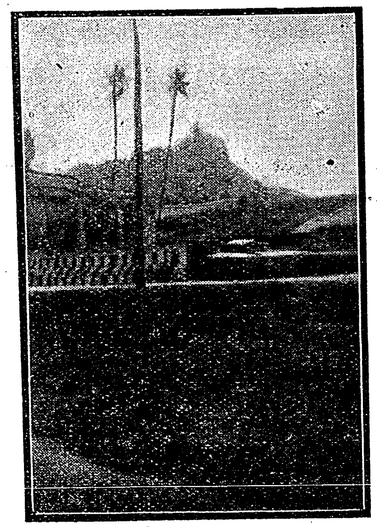

দূরে—পক্ষিতীর্থের পাহাড় ও মন্দির

ইহা ব্যতীত পাহাড়ের নীচে শঙ্খতীর্থ, বিশ্বামিত্র তীর্থ প্রভৃতি কয়েকটি সরোবর এবং রুদ্রন কোইল প্রভৃতি কয়েকটি মন্দির আছে।

এইবার আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এই পাহাড়ের নাম বেদগিরি। প্রবাদ এই যে, ইহা কৈলাস পর্ব্বতের একটি শৃঙ্গ। মহাদেব না কি বেদকে এই পর্ব্বতে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বেদগিরি। চারি বেদ অনুসারে এই পাহাড়ের চারিটি শৃঙ্গ আছে। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উপর বেদগিরীশ্বর মহাদেবের স্বয়ম্ভূলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পাহাড়টি ৫।৬ শত ফিট উচ্চ হইবে। পাহাড়ে উঠিবার পাথরে বাঁধান সিঁড়ি আছে। মেয়েছেলেদের জন্য ডুলি পাওয়া যায়। সিড়ির দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী। কিছুদূর উঠিয়া নীচে মন্দির, সরোবর, গৃহ, মাঠ প্রভৃতি ছবির ন্যায় দেখাইতে লাগিল। আরও কিছুদূর উঠিয়া আমরা দুইটি পথ দেখিতে পাইলাম—একটি উঠিবার ও একটি নামিবার। এখান হইতে কিছুদূর উঠিয়া পর্ব্বতশিখরস্থ মন্দিরের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। এখানে দাঁড়াইলে চারি দিকের দৃশ্য যেরূপ নয়নানন্দকর মনে হয়, বাতাসও তেমনি মধুর লাগে। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আমাদের সকল শ্রম সার্থক বোধ হইল। নীচে গোপুরম গৃহ—সরোবরখচিত গ্রাম,—চারি দিকে পাশার ছকের ন্যায় মাঠ, দূরে তরঙ্গায়িত পর্ব্বতশ্রেণী। স্নিগ্ধ বায়ু ঈষৎ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া দিতেছিল। এখানে আসিলে মনে হয় সংসারের দ্বন্দ্ব কলহ, দুঃখ কষ্ট সব নীচে ফেলিয়া সত্যই ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। নীচের গৃহ ও মাঠ যেরূপ ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল, ভগবানের নিকট আসিলে সংসারের সুখ দুঃখও সেইরূপ ক্ষুদ্র দেখায়। এখানে আসিলে মনের যে আনন্দ হয়, ভগবানের নিকট যাইতে পারিলে বুঝি আত্মা সেইরূপ অনন্ত আনন্দে নিমগ্ন হয়। এখানে উঠিতে যেরূপ কষ্ট, এবং পদে পদে নীচে পড়িয়া যাইবার যেরূপ আশঙ্কা, ধর্ম্মপথে আরোহণ করাও সেইরূপ কঠিন এবং পথ হইতে স্খলিত হইবার সম্ভাবনাও সেইরূপ বেশী।

বেদগিরীশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি খুব বড়।" একটী প্রায়ান্ধকার পথ দিয়া, মূল মন্দির বেষ্টন করিয়া, পূর্ব্বদ্বার দিয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বেশ বড় একটি শিবলিঙ্গ আছে। পুরোহিত পূজা করিয়া কর্পূর জ্বালিয়া বিগ্রহ দর্শন করাইলেন। তখন দেখিলাম শিবলিঙ্গের পশ্চাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া বসিলাম। পক্ষীদের আসিবার দেরী ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। কিন্তু এমন সুন্দর বাতাস দিতেছিল যে বসিয়া থাকিতে বিরক্তি বোধ হয় নাই। অবশেষে পক্ষী-তীর্থের পাণ্ডা আসিলেন। আমরা এখান হইতে কিছুদূর নামিয়া একটি নাতিপ্রশস্ত সমতলভূমি পাইলাম।

পক্ষিতীর্থের পাণ্ডা ও একটি পক্ষী

চালার নীচে অনেক যাত্রি দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহার মধ্যে তিন চারিজন বাঙ্গালী ছিলেন। একটী পুরুষ এবং তিন চারিটী বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক,—ইঁহাদের বাড়ী রাণাঘাট,—ইঁহারা সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন। একটি পক্ষী আমাদের কাছেই অপেক্ষা করিতেছিলেন, আর একটি পক্ষী দূরে একটি পাহাড়ের উপর বসিয়া ছিলেন, অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। পাণ্ডা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তাহার পর হাততালি দিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল দূরে পাহাড়ের উপর হইতে পক্ষী উড়িলেন এবং উড়িতে উড়িতে পাণ্ডার নিকটে আসিয়া বসিলেন। ততক্ষণ অপর পক্ষীও উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেখিলাম উভয়েই খুব ভীত ও সন্দিগ্ধ স্বভাবের। পাণ্ডা দুইজনকে দুইটি বাটিতে পায়সান্ন নিবেদন করিলেন। পক্ষিদ্বয় অল্পই আহার করিলেন। উভয়ের গায়ের পালক ভিজা ভিজা—যেন সম্প্রতি জল মাখিয়া আসিয়াছেন। ইহা একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল। পক্ষিদ্বয়ের মুখের ভাব একটু শান্ত। একটি পক্ষী অপর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় বোধ হইল। সাদা পালক, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের সরু ঠোঁট। ইঁহারা অল্পই ভোজন করিলেন। তাহার পর পাহাড়ের অপর পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। খাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ বা আসক্তি লক্ষিত হইল না। নেহাৎ খাইতে হয় বলিয়া যেন অল্প কিছু আহার করিলেন। পাণ্ডা পক্ষীর উচ্ছিষ্ট পায়স একথালা পায়সের সহিত ভাল করিয়া মিশ্রিত করিলেন এবং আমাদিগকে প্রায় পরিপূর্ণ একথালা ভোগ ধরিয়া দিয়া যাত্রিগণের নিকট অবশিষ্ট পায়স বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। পায়স এখনও অতিরিক্ত গরম ছিল। যথেষ্ট ঘৃত ও শর্করা সহযোগে খাইতে খুব মিষ্ট হইয়াছিল তথাপি আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মনে পক্ষীর উচ্ছিষ্ট বলিয়া খাইতে একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল।

লাইট-হাউস ও যমপুরীমণ্ডপম্
—মহাবল্লীপুরম

পাণ্ডা বলিতে লাগিলেন, কাশ্যপ ঋষির দুই পুত্র এখানে সারূপ্য মুক্তির জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। কিন্তু ভগবান যখন দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি চাহ, তখন তাঁহারা বলিলেন—আমরা সাযুজ্য মুক্তি চাহি। তাঁহাদের এই মিথ্যা কথার জন্য ভগবান তাঁহাদিগকে পক্ষী রূপে রূপান্তরিত করিলেন। ইহাদের নাম পূষা ও বিধাতা। ইহা কলিযুগের কথা। কিন্তু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরেও দুইটি করিয়া পক্ষী এখানে আসিতেন, তাঁহাদের ছয়জনের মোক্ষ হইয়াছে। সত্যযুগের পক্ষী দুইটির নাম চণ্ড ও প্রচণ্ড। ত্রেতাযুগের পক্ষী দুইটি রামায়ণ-বর্ণিত জটায়ু ও সম্পাতি। দ্বাপরযুগের পক্ষীদের নাম শম্ভুগুপ্ত ও মহাগুপ্ত। এই সকল পক্ষীর

কাহিনী স্থানীয় পৌরাণিক ইতিবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক দিন হইতে যে এই ঘটনা হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখনও ইহা পক্ষীতীর্থ নামে বিখ্যাত ছিল। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে,

পক্ষতীর্থে আসি কৈল শিবদরশন।

এই 'পক্ষীতীর্থ' যে 'পক্ষীতীর্থ' তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ কাঞ্চী এবং কালহস্তীর পরই ইহার উল্লেখ আছে। উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইবার পথে কাঞ্চী এবং কালহস্তীর পরই পক্ষীতীর্থ পড়ে। 'শিব দরশন'এর উল্লেখ থাকাতেও বুঝিতে পারা যায় যে উহা পক্ষীতীর্থ এবং এই শিব হয় বেদগিরীশ্বর নাহয় ভক্তবৎসল।

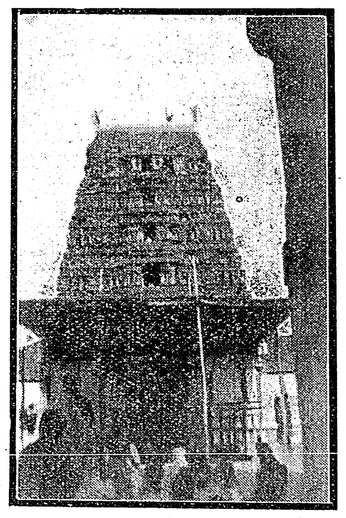

ভক্তবৎসল মহাদেবের মন্দির

আহার সমাধা করিয়া পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া আমরা নামিতে আরম্ভ করিলাম। রৌদ্রে পাথরের সিঁড়ি এত গরম হইয়াছিল যে পা ফেলা কষ্টকর হইয়াছিল। আমরা দ্রুতগতিতে নামিতে লাগিলাম এবং গাছের ছায়া পাইলে পা শীতল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিছুদূর নামিয়া একটি সুন্দর গুহা দেখিতে পাইলাম। ইহার নাম ওরুকল মণ্ডপম। মাত্র একখণ্ড প্রস্তর কাটিয়া গুহাটি নির্ম্মিত হইয়াছে। দুই সারিতে চারিটি করিয়া আটটি স্তম্ভের উপর ইহার ছাদ অবস্থান করিতেছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি ও একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে কয়েকটি শিলালিপি আছে। এই শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে মহাবল্লীপুরের মন্দির-নির্ম্মাতা পল্লব বংশীয় বিখ্যাত রাজা প্রথম নরসিংহ-বর্ম্মা কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার সময় খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী।

ওরুকল মণ্ডপ দেখিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম এবং মোটরে উঠিয়া মহাবল্লীপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। মহাবল্লীপুরকে ইংরাজেরা সাধারণতঃ Seven pagodas বা সপ্তদেউল নামে অভিহিত করেন। পথের ধারে Sign post এই নামেই পথ-নির্দ্দেশ করিতেছিল। বেদগিরি হইতে মহাবল্লীপুর প্রায় ৯ মাইল। এখানে একটি Inspection Bungalow আছে, আমরা সেখানে থাকিব স্থির ছিল। ভাবিয়াছিলাম মোটর বরাবর Inspection Bungalow পর্য্যন্ত যাইবে। কিন্তু বেলা দুইটার সময় আমাদের তপ্ত, ক্লান্ত দেহ বহন করিয়া মোটর যখন একটি নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটি লোক যখন দুর্বোধ্য ভাষায় আমাদিগকে বুঝাইল যে মোটর আর যাইবে না, নৌকা করিয়া নদী পার হইতে হইবে, এই বলিয়া অপর পারের Inspection Bungalow দেখাইয়া দিল, তখন আমাদের চিত্ত বেশ প্রফুল্ল হইতে পারিল না। আমাদের ঠিক আগেই একটি ইংরাজ পুরুষ ও রমণী আসিতেছিলেন। তাঁহারা এখানে মোটর রাখিয়া নৌকায় উঠিয়া পার হইতেছেন দেখিতে পাইলাম। খেয়া নৌকা ফিরিয়া আসিলে আমরাও জিনিষপত্র লইয়া নৌকাতে উঠিলাম। ধীর, মন্থর গতিতে নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইল। সেখান হইতে অল্প পথ বালির উপর হাঁটিয়া আমরা Inspection Bungalow পৌঁছিলাম। এইটুকু আসিতে বড় কষ্ট বোধ হইয়াছিল।

Inspection Bungalowতে দুইটি শয়নকক্ষ এবং দুই চারিটি ছোট কক্ষ আছে। এখানে মহাবল্লীপুরের চিত্র ও বিবরণ সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক আছে। এই সব পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া আমরা কিছুক্ষণ কাটাইলাম। বাংলোর পাশে একটি পুকুর ছিল। গ্রামের স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকারা কোলাহল করিতে করিতে এই পুকুরে নামিয়া মাছ ধরিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই জল পঙ্কিল করিয়া তুলিল। বাংলোর নিকটেই পূর্ব্ব দিকে শিলাময়, অনুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী,—তাহার শিখরে একটি সুগঠিত কিন্তু অসমাপ্ত মন্দির দেখা যাইতেছিল। নিকটেই Light Houseএর শুন্ড উচ্চ শির আকাশে তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পশ্চিমে আমরা যাহা নদী মনে করিয়াছিলাম তাহা Buckingham canal। এই খাল

পথে মাদ্রাজ হইতে মহাবল্লীপুরে আসা যায়। নৌকায় প্রায় ১৪ ঘণ্টা লাগে। পশ্চিম ও দক্ষিণে দুই একটি পাহাড় দেখা যাইতেছিল। তপ্ত ও শুষ্ক বায়ু পশ্চিম দিক হইতে বহিতেছিল। পূর্ব্ব দিকে পাহাড়ের অপরপার্শ্ব হইতে নিকটস্থ সমুদ্রের গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। সমুদ্র হইতে স্নিগ্ধ পবন প্রবাহিত হইল। আমরা একটি স্থানীয় লোককে পথ প্রদর্শক করিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিতে বাহির হইলাম। লাল কাঁকরের রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট সাদা পাথর বসান হইয়াছিল এবং দুই পাশে দুই সারি

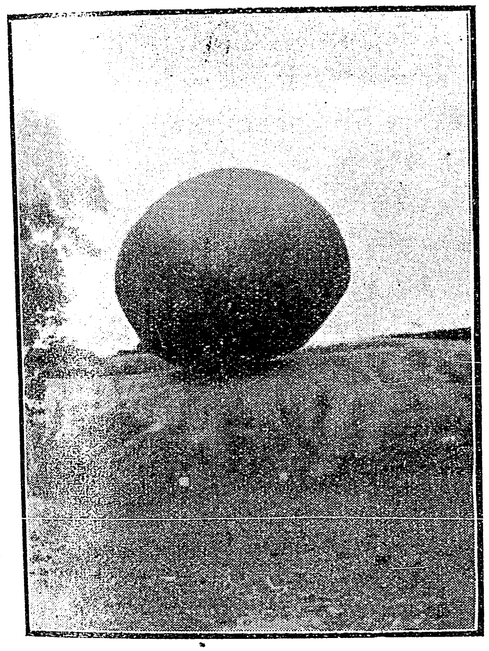

মাখনের গোলা

ঝাউ গাছ লাগান হইয়াছিল। বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। একটি পথ পাহাড়ের উপর দিয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। Sign post দেখিয়া বুঝিলাম এই পথে Shore Temple বা সৈকতমন্দিরে যাইতে হয়। অপর পথ পাহাড়ের নীচে দিয়া দক্ষিণমুখে গিয়াছে। এই পথের Sign postএ five Rathas বা পঞ্চদেউল লেখা ছিল। আমরা দক্ষিণের পথ ধরিলাম। ঝাউবন-সমাবৃত সমুদ্র-সৈকতের উপর দিয়া অর্দ্ধ মাইল যাইবার পর আমরা একটি পরিষ্কার ভূখণ্ডের উপর পাঁচটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরগুলি বেশী বড় নয়—সব চেয়ে ছোটটি একতালা গৃহের ন্যায় উচ্চ হইবে, এবং সব চেয়ে বড়টি প্রায় দুইতালা উচ্চ হইবে। ছোট হইলেও ইহাদের গঠন-নৈপুণ্য এত সুন্দর যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। চারিটি মন্দির এক সারিতে; তাহার পশ্চিমে পঞ্চম মন্দির। এই স্বতন্ত্র মন্দিরটি নকুল-সহদেবের রথ এবং অপর চারিটি দ্রৌপদী, অর্জ্জুন, ভীম ও ধর্ম্মরাজের রথ বলিয়া পরিচিত। উত্তর-দিকে দাঁড়াইলে মন্দিরগুলি একটির পর একটি ক্রমশঃ উচ্চ হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ বা যুধিষ্ঠিরের রথটি সর্ব্বোচ্চ। এই মন্দিরগুলি পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া নির্ম্মাণ করা হয় নাই,—এক একটি পাথর

নকুল সহদেবের রথ ও অতিকায় হস্তী

ক্ষুদিয়া মন্দির বাহির করা হইয়াছে। মন্দিরগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্রৌপদীর মন্দিরের শিরোভাগ চারি দিকে চারি বক্র অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরের গর্ভগৃহগুলি এই প্রথায় নির্ম্মিত হয়। অর্জ্জুনের রথের চতুষ্কোণ ছাদ উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া শিখরে সমাপ্ত হইয়াছে। ভীমের রথটি দীর্ঘাকার, hallএর ন্যায়, শীর্ষদেশে একটি সরলরেখা মাত্র। দুই পার্শ্বে বক্র ছাদ নামিয়া আসিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের দেওয়ালের ঊর্দ্ধভাগ সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত। ইহা

না কি বৌদ্ধ বিহারের প্রথায় নির্ম্মিত। ধর্ম্মরাজের মন্দিরটি দুইতালা উচ্চ। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া মন্দিরের চারি দিকে ঘুরিয়া দেখিতে পারা যায়। নকুল-সহদেবের মন্দিরের গঠন-প্রণালী কতকটা অর্জ্জুনের মন্দিরের ন্যায়। মন্দিরগুলির মধ্যে এবং চারি দিকে নানাবিধ মূর্ত্তি আছে—কোথাও হরগৌরী বসিয়া আছেন, গৌরীর কোলে শিশু গণেশ; কোনটি গজলক্ষ্মী, কোনটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। মন্দিরগুলির সম্মুখে একটি সুবৃহৎ হস্তী এবং সিংহের মূর্ত্তি। হস্তীটি প্রায় ১২ ফিট উচ্চ। মন্দিরের পশ্চাতে একটি বৃহৎকায় পাথরের ষণ্ড বসিয়া আছেন। ইনি বোধ হয় মহাদেবের বাহন। মন্দিরগুলি স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পরম যত্নে স্থানগুলির সংস্কার করিয়া মন্দিরগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির মধ্যে রথ পাঁচটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—এগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পল্লববংশীয় নরপতি প্রথম নরসিংহবর্ম্মণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। রথগুলি দেখিয়া আমরা উত্তর মুখে ফিরিয়া পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণের শিলারাশি দ্বারা এই পর্ব্বত গঠিত হইয়াছে। তাহারই মধ্যে নানাজাতীয় বৃক্ষ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। পর্ব্বতের শিখরে একটি অসমাপ্ত মন্দির। ইহার নাম যমপুরী মণ্ডপম। এক কালে ইহা Light house রূপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে একটি স্বতন্ত্র সুন্দর Light house নিকটেই নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের নীচে একটি দীর্ঘাকার গুহা পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত হইয়াছে। তাহার এক প্রান্তে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে, অপর প্রান্তে নারায়ণের অনন্ত-শয্যা। সিংহের উপর দাঁড়াইয়া বিবিধায়ুধভূষিতা দশভূজা দেবীর মূর্ত্তি। সম্মুখে মহিষাসুর (মানুষের মত শরীর, মহিষের মত মুখ), আরও অনেক অসুর-মূর্ত্তি। ইংরাজ পণ্ডিতেরা এই চিত্রের খুব প্রশংসা করেন,—বলেন, দেবীর গতি ও বিক্রমসূচক ভঙ্গী খুব সুন্দর হইয়াছে। গুহার দক্ষিণ প্রান্তে নারায়ণের অনন্ত-শয্যা। অনন্তের দেহের উপর বিষ্ণুর প্রকাণ্ড শয়ান মূর্ত্তি—মাথার উপর অনন্ত অজস্র ফণা ধারণ করিয়া আছে। একটি কৃষকদম্পতী নারায়ণের নিকট অসুরদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিয়াছে। কৃষকের এই স্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য একটা অসুর আস্ফালন করিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুর সেবক অসুরকে নিবৃত্ত করিতেছে *। বিষ্ণুর পদপ্রান্তে দুইটি বিবদমান মূর্ত্তির চিত্রও বেশ ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। এই মূর্ত্তিতে কিন্তু বিষ্ণুর পদপ্রান্তে লক্ষ্মীদেবীকে অথবা নাভিকমলের উপর ব্রহ্মাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। গুহার সম্মুখে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত শয্যা, কে যেন কোমল বিছানার উপর সযত্নে তাকিয়া দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। এখান হইতে Light houseএর পাশের রাস্তা দিয়া পাহাড় হইতে নামিলাম। স্থানীয় জমিদারের বাটীর পাশ দিয়া পথ। বাড়ীর সংলগ্ন ভূমিতে অনেকগুলি ভগ্ন মূর্ত্তি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আর একটু গিয়া বাম দিকে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা। ইহার নাম কৃষ্ণমণ্ডপ। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছেন। নীচে অনেক নরনারী, বালকবালিকা, গরুবাছুর দাঁড়াইয়া আছে। অপর সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি খুব বড়। আর একটু আগে গিয়া বাম দিকে একটি পাহাড়ের গায়ে খুব বড় একটা পাথরের উপর বহুসংখ্যক মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি কোন গুহার মধ্যে অবস্থিত নহে। উপরে কোনরূপ আবরণ নাই। রৌদ্র-বায়ু-জল অবাধে তাহাদের গায়ে লাগিতেছে। এজন্য মূর্ত্তিগুলি কিছু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি অর্জ্জুনের তপস্যা (Arjun's Penance) নামে পরিচিত। অর্জ্জুন দুই হাত তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছেন। অনেক দিন তপস্যা করিতেছেন বলিয়া তাঁহার মুখ শ্মশ্রুসমাবৃত হইয়াছে। সম্মুখে চতুর্ভুজ মহাদেবের মূর্ত্তি। তিনি অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দিতেছেন। চারি পার্শ্বে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রোণ, ভীষ্ম প্রভৃতির মূর্ত্তি। নীচে একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুর বিগ্রহ। তাহার নিকটে বসিয়া ঋষিমুনিরা তপস্যা করিতেছেন। দুইটি পাথরের সঙ্গমস্থলে অনেকগুলি নাগমূর্ত্তি। কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—ইহা অর্জ্জুনের তপস্যা নহে, ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়নের চিত্র। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কল্পনাই বেশী স্বাভাবিক বোধ হইল। এই মূর্ত্তিগুলির পরে একটি বানরদম্পতীর মূর্ত্তি,—একটি অপরটির গাত্র হইতে নিবিষ্টচিত্তে উকুন বাছিতেছে। মূর্ত্তিগুলি পার হইয়া একটি কৌতূহলপ্রদ বস্তু দেখা যায়। পাহাড়ের ঢালু পাথরের উপরে একটি প্রকাণ্ডকায়—প্রায় দশ হাত উচ্চ—পাথরের গোলা। মনে হয় গোলাটি এখনই গড়াইয়া পড়িয়া যাইবে, কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া সমুদ্রতটের কত প্রবল ঝড় উপেক্ষা করিয়া গোলাটি স্বস্থানে দাঁড়াইয়া আছে তাহা কে বলিবে? বস্তুতঃ ইহা Staticsএর গূঢ় নিয়মের একটি উত্তম উদাহরণ। গোলাটির ভারকেন্দ্রের ঠিক নীচেই (Vertically down) গোলাটি নীচের পাথরকে স্পর্শ করিয়া আছে। গোলাটিকে নীচের দিকে গড়াইলে ভারকেন্দ্র উপরে উঠিবে, উপরের দিকে গড়াইলেও ভারকেন্দ্র উপরে উঠিবে। এজন্য গোলাটিকে গড়াইয়া দিলেও বর্ত্তমান স্থানে ফিরিয়া আসিবে। ইহাকে বলে Stable equilibrium। খুব কৌশলের সহিত এই গোলাটি প্রস্তুত হইয়াছে। প্রবাদ এই যে—দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের জন্য মাখনের গোলা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। একটি মার্জ্জার মাখনের কিয়দংশ চুরি করিয়া খাইয়াছিল, এইজন্য মার্জ্জারও প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে এবং গোলার কিয়দংশ ভগ্ন। বস্তুতঃ ভারকেন্দ্রের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একধার হইতে কিছু পাথর কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ইংরাজেরা এই গোলাটিকে Butter ball বলে।

Butter ball পার হইয়া পাহাড়ের উপর আরও দুইটি মন্দির দেখা যায়। একটিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ও কালীর মূর্ত্তি আছে। আর একটিতে বরাহ অবতার, বামন অবতার প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। বরাহ অবতারের দেহ নরাকার, মুখ বরাহের ন্যায়,—ভগবান রসাতল হইতে পৃথিবী দেবীকে উদ্ধার করিয়া হাতে করিয়া বুকের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন, নিকটে দেবতা ঋষি মুনিরা স্তব করিতেছেন। বামন অবতারে ভগবানের এক পাদ ভূমির উপরে এক পাদ বলির মস্তকে।

অর্জ্জুনের তপস্যার পূর্ব্ব দিকে একটি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অভগ্ন মন্দির আছে, ইহাকে স্থলশয়নম্ মন্দির বলে। এখানে বিষ্ণুর এখনও নিয়মিত পূজা হয়। ইহার সম্মুখে দুইটি পাথরের কারুকার্য্যবিশিষ্ট মণ্ডপ। পাশ দিয়া পূর্ব্বদিকে সৈকতের মন্দিরে যাইবার পথ। রাস্তার Sign postএ Shore temple লেখা ছিল। একটি প্রাচীন প্রস্তরবদ্ধ পুষ্করিণী পার হইয়া ঝাউবনের মধ্য দিয়া কিছুদূর গিয়া এই মন্দির দেখিতে পাইলাম। এক কালে মন্দির নিশ্চয় সমুদ্র হইতে কিছু দূরে ছিল। এক্ষণে সমুদ্র তট ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে একেবারে মূল মন্দিরের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। মন্দিরে দেখিবার কিছু নাই। অনবরত সমুদ্রের নোনা জল লাগিয়া মূর্ত্তি সকল অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গণের চারি দিকের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বহু সংখ্যক পাথরের ষাঁড় এই দেওয়ালের উপর কত দিন ধরিয়া বসিয়া আছে কে বলিতে পারে? কিন্তু দেখিবার মত উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য না থাকিলেও মন্দিরটির অবস্থান অতিশয় চিত্তগ্রাহী। ভগ্ন দ্বার দিয়া চাহিয়া দেখিলে সম্মুখে অনন্ত নীলোর্ম্মিমালা দেখিতে পাওয়া যায়। ঢেউগুলি সূর্য্যকিরণে হাসিতেছে, নাচিতেছে। মন্দিরের ধ্বজ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়াও কিয়দংশ জলের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্তম্ভের এই স্পর্দ্ধা সমুদ্র যেন সহিতে পারিতেছে না, তাই বারবার ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্তম্ভের গাত্রে আঘাত করিতেছে, পর মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া চারিদিকে লাফাইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে, আবার ছুটিয়া আসিয়া আঘাত করিতেছে। স্তম্ভটি যেন বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের সহিত সকল আঘাত সহ্য করিতেছে। সে দেখিয়াছে মন্দিরের সকল অংশ সমুদ্রের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিছু দিন পরে তাহাকেও পড়িতে হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার মনে আর একটি চিত্রের

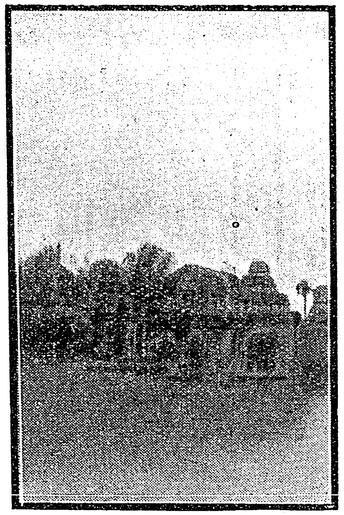

পঞ্চরথ—মহাবল্লীপুরম

* চিত্রের এই ব্যাখ্যা একটি ইংরাজি গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম। ইহা চিত্রের অনুরূপ বটে, কিন্তু যথার্থ কি না জানি না।

উদয় হইল। আমি যেন মানসচক্ষে দেখিতে পাইলাম আকবরের অসংখ্য সৈন্য চিতোর অবরোধ করিয়াছে। দীর্ঘকাল অবরোধের পর চিতোর রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক রাজপুতসৈন্য দুর্গদ্বার খুলিয়া শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, রাজপুত সৈনিক অতুল শৌর্য্যে যুদ্ধ করিয়া একে একে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিতেছে। রাজপুতদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বীর যেন দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ মোগলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে।

প্রভাতের সূর্য্যালোকে বহুক্ষণ আমি সে দৃশ্য দেখিলাম। সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদ্রের চঞ্চল জলরাশি ঝল্‌মল্ করিতেছে। তীরভূমির উপর ঝাউ-বৃক্ষ-শ্রেণী প্রায় সমুদ্রের জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে এবং ঢেউগুলি শুভ্র ফেনরাশিতে পরিণত হইয়া তীরের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। প্রবাদ এই যে, এইরূপ সাতটি মন্দির ছিল—ছয়টী সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে—মাত্র একটি বাকী আছে। সাতটি মন্দির ছিল বলিয়া পুরাকালে ইহা seven pagodas নামে অভিহিত হইত।

মহাবল্লীপুরের অপর দুই নাম মাসুলীপুর ও মল্লপুরী। মহাবল্লীপুরের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এই যে, ইহা প্রহ্লাদের পৌত্র বলি রাজার রাজধানী ছিল; এবং ভগবান বামন অবতারে এখানে বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন। বলির পুত্র বাণের* কন্যা ঊষাকে অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিল। বাণ অনিরুদ্ধের কারাদণ্ড করিয়াছিল। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসিয়া বাণের পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে মহাবল্লীপুর বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রতি বৎসর মিশর ও আরবদেশ হইতে বহুসংখ্যক তরণী স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বিবিধ পণ্য দ্রব্যে সজ্জিত হইয়া এখানে আসিত এবং সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের কার্পাস বস্ত্র এবং বিবিধ শিল্পদ্রব্য লইয়া যাইত। বৈশাখ মাসে যখন বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হইত, তখন তরণীগুলি আসিত, শীতকালে যখন বায়ু উত্তর-পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত হইত তখন তাহারা ফিরিয়া যাইত। Ptolemy যে মল্লারফা (Mollarpha) নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় সেই নগর। এখানে মাটির নীচে রোম, গ্রীস, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পূর্ব্বে ইহা বড় নগরী ছিল এবং দেশ-বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিত। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এখানকার রথ, গুহা, মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রথ ও গুহাগুলি বোধ হয় নরসিংহবর্ম্মা ও পরমেশ্বর বর্ম্মার রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইঁহারা পল্লব বংশের রাজা, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাঞ্চীনগরে রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ মনে করেন, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট লোকদের সাহায্যের জন্য এই সকল শিল্পকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। মহিষাসুরমর্দ্দিনী এবং অনন্তশয্যার চিত্র এবং তটের মন্দির বোধ হয় খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল—এইরূপ অনুমান করা হয়। চণ্ডী ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। অর্জ্জুনের তপস্যার চিত্র ও অন্যান্য মন্দির খৃঃ ১১শ হইতে ১৭শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

* এ বিষয়ে অপর প্রবাদ—উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর বাণরাজার রাজধানী ছিল এবং সেখানে ঊষা হরণ হইয়াছিল।

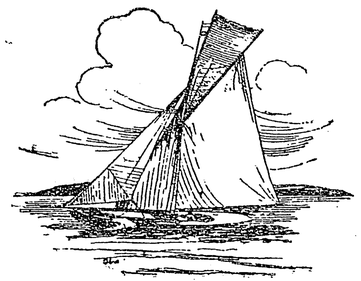

শুক্রতারা

শ্রীরাধারাণী দেবী

এসো-এসো-ওগো! এই পথ বেয়ে—ভয় কি পথিক? জেগে আছি আমি—
শুক্রতারা,—
সারাটি রজনী ঘুম নেই চোখে, হেরি কোন্ লোকে—দূরপথগামী
চলেছে কা'রা?—
কে গো দিক্‌ভোলা? দিক্ খুঁজে খুঁজে সারাটি জীবনে হ'তেছ সারা?
দেখাবারে দিক্ আমি অনিমিখ চেয়ে আছি পথে উতল-পারা;
দিক্ খুঁজে খুঁজে সারাটি জীবনে কে গো দিক্‌ভোলা হতেছ' সারা?
নীল-গগনের বাতায়নে আমি দীপ জেলে জাগি শুক্রতারা!

*

কে গো পথহারা তরণীর নেয়ে! শোনো-শোনো-শোনো—মুখ তুলে চাও
আমার পানে!—
হারাপথ খানি খুঁজে দেব ঠিক, যদি হে পথিক, তরী তব বাও
তারার গানে!
ভুলোনা ভুলোনা কপট কুটিল অজানা-তারার হাত-ছানিতে,
ওদের আঁখির অলস-ইসারা দেবেনা দেবেনা দিক্ জানিতে!
ভুলোনা ভুলোনা অবোধ অচেনা তারার তরল-হাত'-ছানিতে,
পথ পাবে শুধু আঁধার-বিপথে আমারি এ ধ্রুব-দীপ খানিতে।

*

মোর বাতায়নে প্রেম-রসায়ণে জ্বলে যে আলোক, চির-অম্লান
কিরণে তার,
অথই-সাগরে পথ খুঁজে পেয়ে পথহারা নেয়ে করে জয়গান
বারম্বার!
আর তারা যত ঘুমে ঢুলে পড়ে একে একে একে রাতের শেষে;
আমি কাণ্ডারী পার করি তরী একাকী জাগিয়া উজল বেশে!
ঘুমে ঢলে পড়ে আর যত তারা মুদে আসে আঁখি রাতের শেষে,
চাঁদের গর্ব্ব চুর করে দিই আমিই একাকী প্রভাতে হেসে!

*

এসো-এসো-ওগো! এই পথ বেয়ে,—কূলহারা নেয়ে! আমি আছি জেগে
শুক্রতারা।
দোলে উত্তাল ঢেউ যদি লেগে—তবু তরী তব বেয়ে চল বেগে
ভাবনা-হারা!
হোক্ পারাবার অসীম অপার নাই বা থাকুক আকাশে আলো,—
মোর মুখ পানে মুখ তুলে চাও,—নিমেষে মিলাবে সকল কালো!
হোক্‌না তোমার কূলহারা-তরী, নাই বা থাকুক্ কোথাও আলো,—
আমি যে মিলাই অকূলের কূল, আমি তোমাদের বাসি যে ভালো!

দিনের পর দিন

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এম-এ. বি-এল.

সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নামবার আগে ডাক্তার একটু-খানি থাম্‌লেন।

"এই যে।" বিমল তাড়াতাড়ি তাঁর কুণ্ঠিত হাতের মধ্যে ভিজিটের টাকা কয়টা গুঁজে দিলো। তারপর অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত প্রশ্ন করলো: "সত্যিই কেমন দেখ্‌লেন?"

বিমলের ধারালো চোখের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন আর উড়িয়ে দেওয়া গেলো না; ডাক্তার শুধু একটু হাসলেন।

বিমল গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লো,—"মিথ্যে আশা দেওয়াই আপনাদের ব্যবসা। রোগী মরবে—সরাসরি এমন রায় দিলে আপনাদের কে আর ডাক্‌তো বলুন। সব জানি। তবু বলুন,—একটুও লুকোবেন না—কদ্দিন আর ও আছে। বেশ স্পষ্ট করে' বলুন, আমি তৈরি হই।"

কথা শুনে ডাক্তার থম্‌কে দাঁড়ালেন। বল্লেন,—"আরো দু' সপ্তাহ না গেলে কিছুই বোঝা যাবে না।"

—"দু' সপ্তাহ!"

কাতর, অসহায় কণ্ঠস্বর! কিন্তু হয় তো তার মাঝে বিশ্রী একটা বিস্ময়ের সুরও প্রচ্ছন্ন ছিলো: "দু'-সপ্তাহের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হবে তো? না, তারপরেও—"

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হবার আগেই ডাক্তার বল্লেন—"আর দু'-সপ্তাহ টিক্‌লে এ-যাত্রা রক্ষা পেলেন। তবে ভয় নেই আর!"

—"ও!"

ডাক্তার চলে' গেলে বিমল নীচের ঘরে একটা চেয়ারে চুপ করে' অনেকক্ষণ বসে' রইলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আলো জ্বালা হয় নি। কাল থেকে ঠিকে-ঝি'র জ্বর, ঠাকুরটাও পলাতক। বাড়ি থেকে সনাতনের আজ আসবার কথা—এখনো ফেরেনি। একটা লোক ধরে' না আনলে উনুন পর্য্যন্ত ধরানো হবে না। রাত্রে উপোস করতে হবে।

বেশিক্ষণ একমনে নিজের দৈন্য-দুর্দ্দশার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিমল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এত দুঃখ তাকে সইতে হবে কেন? এত বড়ো সৃষ্টির পক্ষে তার কি প্রয়োজন ছিলো? প্রার্থনা একটা মনের মধ্যে পুঞ্জিত হ'য়ে ওঠে হয় তো, কিন্তু তা উচ্চারণ করবার আগেই সে দু' হাত দিয়ে অন্ধকার অনুভব করতে করতে উপরে চলে' আসে।

বিভা এরি মধ্যে মোমবাতিটা জেলেছে। স্বামীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে বিভা খেঁকিয়ে উঠ্‌লো: "কী করছিলে এতক্ষণ? ডাক্তারের গাড়ি করে' হাওয়া খেয়ে এলে বুঝি? ওষুধটা নিয়ে আস্‌তে হবে না?"

—"এই এবার যাই।" বিমল ঘরে এলো।

—"তোমার কি,—বেরুতে পারলেই হ'ল। ওষুধ আনতে গিয়ে পাঁচটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়ে আস আর-কি! আজ ক্লাবে ব্রিজ খেলতে গেলে না? যাও না, আমি তোমার কে?"

এ-সব আর সয় না। বিমল রুক্ষস্বরে বল্‌ল,—"কি করতে হবে বাপু স্পষ্ট করে' বল। ওষুধ আনতে যাব, না এখানে বসে' তোমার সঙ্গে আড্ডা দেব?"

—"আমাকে বলতে হবে? তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? ভিজিট দিয়ে ডাক্তার ডাক্‌লে তার মুখ দেখতে নাকি? ওই কাগজটায় সে আমার কুষ্টি লিখে গেছে?"

কাগজটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিমল বল্‌ল,—"তা বল্‌লেই হয়। যাচ্ছি ডিস্‌পেন্‌সারিতে।"

ঠোঁট ফুলিয়ে বিভা বল্‌ল,—"তাই যাও। আর তোমাকে পায় কে? ধর্ম্মের ষাঁড় হ'য়ে এই ছুতোয় বেরিয়ে পড় আর-কি! কিন্তু কুঁজোটা যে বিকেল থেকে ঠন্‌ঠন করছে সে-খেয়াল আছে? তেষ্টায় গলা যে কাঠ হ'য়ে গেল। ঝি আসে নি বলে' কুঁজোটায় জল ভরলে তোমার হাতে ফোস্কা পড়তো নাকি? শোন, জল না পেলে জিভ বের করে' আমি মরে' যাবো দেখো। ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না।"

কথায় কান না পেতে প্রেসক্রপ্‌সান্‌টা হাতে করে' বিমল নীচে নেমে এলো। ঘর দোর এলো, জান্‌লাগুলি হাওয়ায় হাহাকার করছে,—নোনা-পড়া দেয়ালে রাস্তার গ্যাসের আলোয় একটা জাম-গাছের শীর্ণ ছায়া কিল্‌বিল্ করছে—দেখে বিমলের গা কেমন ছম্‌ছম্ করে' উঠ্‌লো। গ্যাসের আলো পড়ে' নীচের অন্ধকারটা যেখানে একটু ফিকে হয়েছে,হঠাৎ বিমল দেখতে পেলো—সেখানে নিরালায় বসে' কে-একটি মেয়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে! কিন্তু একটু ভালো করে' ঠাহর করতেই চোখে পড়্‌লো মেয়েটিও বসে' নেই, প্রসাধন-সাধনাও তার শেষ হয়েছে। শূন্য মেয়েটা বিধবার সিন্দূরহীন কপালের মতো বিধুর হ'য়ে উঠ্‌লো। বিমল থম্‌কে গেল। এই নিরাত্মীয় সংসারে কে এই মেয়েটি—কা'র মানসস্বর্গস্খলিতা কবিতা না-জানি! হঠাৎ পাশে কার পায়ের শব্দ শুনে বিমল চমকে চেয়ে দেখলো সেই মেয়েটিই দ্রুত-পদে রান্নাঘরে ঢুকেছে—হাঁড়িকুঁড়ি খুন্তি-হাতার স্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রসাধন ছেড়ে মেয়েটি এবার রন্ধনে মনোনিবেশ করেছে। কড়া-য়ে খুন্তি নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়ির বাজ্‌নাটি হাল্কা কবিতার মিলের মতোই মিঠে। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করে' বিমল রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে ফস্ করে' কাঠি ধরালো। কোথায় বা উনুন, কোথায় বা কে! স্তূপীকৃত ঘুঁটের ওপর দাঁড়িয়ে একটা বেড়াল থাবা বাড়িয়ে পোকা ধরবার কসরৎ করছে। কাঠিটা আধখানা না পুড়তেই কে যেন পেছন থেকে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলে। হাতের স্পর্শের চাইতে সে-নিশ্বাস ঢের বেশি স্পষ্ট, ঢের বেশি স্থূল! বিমল আরেকটা কাঠি জ্বালালো। খানিকটা অন্ধকার বিপন্ন হ'য়ে পথ ছেড়ে দিলো—দু' পা অগ্রসর হ'য়ে এ দিক ও-দিক চাইতেই কানে এলো খাবার-ঘরে বসে' কে যেন কাঁসার বাটির গায়ে ঝিনুকের আওয়াজ করছে। দুধ খাওয়ানোর বেলায় কাঁদুনে ছেলেকে মা'র প্রবোধ-প্রয়াসের মতো। কিন্তু ঘরে নয়, বাইরের এই বারান্দাতেই—একেবারে বিমলের পায়ের কাছটিতে। সে-মুখে অথচ ভাববিহ্বল মাতৃত্বের এক বিন্দু সুষমা নেই, কঠিন শীর্ণ মুখে কেমনতরো একটা রুক্ষ বীভৎসতা। সে-বীভৎসতা স্বাভাবিক শ্রীহীনতার নয়, অচরিতার্থ কামনার। তবু মুখটি যেন বিমলের কেমন চেনা-চেনা লাগলো। অথচ আশ্চর্য্য এই, প্রসাধনরতা লাবণ্যললিতা সেই মেয়েটি হঠাৎ কেমন করে' বেশ-বাস পরিবর্ত্তন করে' এমন কুৎসিত হ'য়ে গেল! ভয়ে বিমল পড়্‌লো পিছিয়ে। মেয়েটিও সলজ্জ অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথায় ঘোম্‌টা টান্‌লে। সে-মুখ অদৃশ্য হ'ল বটে, কিন্তু কোলের তার শিশুটি যে মরা, অসাড়! এই না সেই ছেলেটি দুধের ঝিনুক ছুঁড়ে ফেলে তুলতুলোতে মা'র বক্ষবিস্তীর্ণ রাশীকৃত আঁচলের তলায় বারে-বারে মুখ গুঁজ্‌ছিল। দৃঢ়কায়, পূর্ণাবয়ব, সুস্থ ছেলে। বিমল গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌তো হয় তো, কিন্তু এতক্ষণে কুপিটা সে জ্বালতে পেরেছে। পুঞ্জিত অন্ধকার তরল হ'ল। তাতে বিমল স্পষ্ট দেখতে পেল মরা ছেলেকে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে উপর-তলায় ছুটে পালাচ্ছে। স্পষ্ট বিভা—বিমলের আর সন্দেহ নেই। যে-ছেলে তার পেটে মরেছে তারই এ বিফল-স্বপ্ন! মেঝের উপর চূণ-খসা দেয়ালের খানিকটা চল্‌টা পড়ে' আছে মাত্র—কখন পড়ে' থাকবে কে জানে!

বিমলের সমস্ত শরীর শির্-শির্ করে' উঠ্‌লো—খোলা জান্‌লা-দরজাগুলি অন্ধকারে এমন একটা বিপুল বহির্জগতের দিকে সঙ্কেত করছে যে বিমল না পারলো চেঁচাতে, না বা সেই অপস্রিয়মানা প্রেতিনীর পশ্চাদ্ধাবন করতে। ঘরের বাইরে কল্‌কাতা, যেখানে কোলাহল-হলাহলে ফেনিল হ'য়ে উঠেছে, সেখানে নেমেছে মৃত্যুর সূচির স্তব্ধতা—শুধু পারহীন পরিধিহীন প্রান্তর; না আশা, না আশ্রয়!

ধীরে-ধীরে একটু একটু করে' বিমলের মুহ্যমান অবস্থাটা সহজ হ'য়ে এলো। তার আর সন্দেহ রইলো না যে দীর্ঘ দিন-রাত্রির অক্লান্ত প্রতীক্ষার পর বিভার আজ এত দিনে উড়ে' পালানো! তাই অন্ধকার সাঁতরে নব-নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা করবার আগে নীচে নেমে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। মা যখন দেশের বাড়িতে মরেন, তখন বিমল জব্বলপুরে—প্লেগের ভয়ে দেহাতে গিয়ে তাঁবু গেড়ে পেণ্টালুন পরে' সাহেব সেজেছে। মারা যাবার রাতে মা বিমলের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে মশারি তুলে বল্লেন: চললুম; বিয়ে করে' সংসারী হোস্, বিমল। আমার এই শেষ ইচ্ছাটি রাখিস্ বাবা। আশ্চর্য্য, বিকেলেই এলো টেলি; মা নেই। বিভাও তেমনি যাবার আগে

তার অতৃপ্ত সংসার-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বহন করে' নীচে নেমে এসেছিলো—রান্নাঘরে সেবা-সুধায় ; মুকুর-সন্নিধানে, লাবণ্য-চর্চ্চায় ; শিশুপালনে, গর্ভধারণের গর্ব্বিত ঐশ্বর্য্যে ! আবার সে উপরে চলে' গেছে—কত উপরে, কত মেঘস্তর পেরিয়ে, আবিষ্কৃত ও অনির্ণীত কত তারায় বিশ্রাম নিয়ে-নিয়ে—নীল, সবুজ, হল্‌দে তারা ! উপরে উঠ্‌লেই ঠিক বিমল দেখতে পাবে সেই ম্লান শয্যার উপর বিভা মধ্যগগনে কৃষ্ণপক্ষের অন্তিম চাঁদের মত বিবর্ণ—দেহ ত' নয়, দড়ি ! হার্ট যে এত দুর্ব্বল এ-কথা অথচ ডাক্তার বলে' গেলেন না। বেচারি স্বামীর কাছে জল খেতে চেয়েছিল, সে-অতৃপ্ত পিপাসা নিয়েই সে বিদায় নিয়েছে।

নিমেষে বিমলের গলা কাঠ হ'য়ে এলো। চীৎকার করতে পারলে হয় ত' সে বাঁচ্‌তো, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু সম্বন্ধে এমন একটা অটুট সন্দেহ পোষণ করে'ও সে সামান্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেল্‌লো না। মৃতদেহ সৎকার করে' সে তা হ'লে আর এ-বাড়িতে ফিরবে না—এই ফাঁকা বাড়িতে কিসের বা তার আকর্ষণ—সে সোজা সুধীরদের মেস্‌এ চলে' যাবে। আজ রাত্রে আর ব্রিজ্‌ নয়, হাত পা ছাড়িয়ে লম্বা চৌকস একটি ঘুম।

কুপিটা হাতে করে' বিমল উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। ভয়ে সমস্ত হাত-পা কালিয়ে আস্‌ছে ; কবে কোন্‌দিন বিভার প্রতি অন্যায় করেছিলো সে-ভাবনায় প্রতি মুহূর্ত্তে সে তার টুঁটির উপর দুটো জিঘাংসু খরনখর হাতের মুঠো কল্পনা করছে—নবযুগের নতুন কানুনে তাকেই বুঝি এবার সহমরণে যেতে হ'ল। স্ত্রী-জাতীয়া এবং জৈব জগতে প্রিয়তমা হ'লেও অদেহা বিভার সঙ্গে নিশ্চয়ই সে এঁটে উঠ্‌বে না। সেই ভেবেই তার ভয়। তবু কালসমুদ্রে তরঙ্গ-চাপল্য আছে, মুহূর্ত্তের আছে পাখা। মানুষের সম্বল আছে বিস্মৃতি, এবং মুক্তি তার বিস্মৃতিতেই !

ঘর স্তব্ধ—মোমবাতিটা নিবে গেছে। জানলার সার্সিতে একটা পোকার অনবরত মাথা ঠোকার আওয়াজকে বিমল আরেকটু হ'লে বিভার নিশ্বাস ফেলবার শব্দ ভেবেছিলো ! পোকাটা পালিয়েছে—ঘরে জীবন-চাঞ্চল্যের আর এতটুকু আভাস নেই। মৃত্যুর সঙ্গে এই স্তূপীকৃত অন্ধকারের একটা চমৎকার সঙ্গতি আছে। ফুলশয্যার দিনে (রাতে নয়) বিমল যেমন চোখে একটি দোদুল্যমান কৌতূহল নিয়ে বিভার অবগুণ্ঠিত মুখশ্রী দেখবার জন্যে উঁকি মেরেছে, আজো তার মৃত্যু-কলঙ্কিত চিরসুষুপ্ত মুখখানি দেখবার জন্যে লালসার আর তার শেষ নেই। আজকের ঘর জনাকীর্ণ নয়, ধরা পড়বার আর লজ্জা কোথায়—তবু চোরের মতো নিতান্ত নিঃশব্দে, টিপে-টিপে পা ফেলে' বিমল একটু-একটু করে' এগোতে লাগ্‌লো। পাছে বিভা তার ঘুম থেকে জেগে ওঠে, পাছে বিমলের সকল সন্দেহ একটি কদর্য্য কৃশ করুণ দেহ দেখে মিথ্যা হয়! বিমলের চোখে মৃত দেহের মত সুন্দর আজ আর আছে কী !

দরজার ওপার থেকে বিমল ডাক্‌লো : বিভা !

এক মুহূর্ত্ত কোনো সাড়া নেই। সৃষ্টিব্যাপিনী সেই নিঃশব্দতা বিমলের চিত্তকে অভিভূত করলে।

এবার বিমল সাহস করে' ঘরে ঢুকেছে। বিছানার উপর বিভা উপুড় হ'য়ে শুয়ে—ভঙ্গিটা কঠিন, চুলগুলি বিস্রস্ত। ডাকবার কি আর প্রয়োজন আছে ? সে-ডাক তারায়-তারায় প্রতিধ্বনিত হ'বে, মর্ত্ত্যতলে তার আর উত্তর কৈ ? রোগী যেমন আপন ক্ষতস্থানে হাত রাখে, তেম্‌নি সন্তর্পণে বিমল বিভার খোলা পিঠের উপর হাত রাখ্‌লো। নিবিড় শীতল স্পর্শে তার হাত এবার স্নান করুক !

—"এ কি ! তুমি যাওনি এখনো ওষুধ আনতে ?"—বিভা খেঁকিয়ে উঠেছে : "ওষুধ বিষুধ যদি না-ই খাওয়াবে, তবে পা দিয়ে গলাটা চেপ্‌টে' দাও না শেষ করে'।"

আচম্‌কা হাত থেকে কুপিটা ছিট্‌কে পড়ে' গিয়েছিলো, সেটাকে লক্ষ্য না করে' বিমল পকেট থেকে দেশ্‌লাই বের করে' মোমবাতিটা জ্বালালো। তার হাত কাঁপছে। বাতিটা তুলে বিভার মুখের কাছে আনতেই বিভা ধমকে উঠ্‌লো : "কী দেখ্‌ছ ইদিকে ? ঐ তো কুপিটা পড়ে' আছে। কী যে কর !"

আলোটা বাঁচিয়ে রেখে বিমল বল্লে,—"তোমার জল তেষ্টা পেয়েছিলো না ? কাঁচের গ্লাশটা কৈ ? কলে এখনো হয় ত' ফোঁটা-ফোঁটা জল গড়াচ্ছে, ধরে' নিয়ে আসি খানিকটা। সুধীর আসুক, সে তোমার কাছে বস্‌লে আমি গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসবো।"

গ্লাশ নিয়ে বিমল আবার নীচে নেমেছে। কোথায় সেই ছায়ামূর্ত্তি ? রাতের পর রাত অনিদ্রায় মস্তিষ্ক তার

ক্লান্ত হ'য়ে গেছে বুঝি—এই ছায়া তার রাশি রাশি নৈরাশ্যের ছায়া ! কিম্বা তার জীবনে যে প্রেতিনী দিনের পর দিন পদচারণা করছে এ হয় তো তারই অশরীরী প্রতিচ্ছবি !

জল নিয়ে বিমল উপরে এলো। তার কাঁধের উপর ভর দিয়ে বিভা সেই জলটুকু অতি কষ্টে পান করলে ; ঠোঁটের প্রান্তের জলটুকু বিমলই দিলো মুছিয়ে !

স্নিগ্ধ আলো, একটুখানি পিপাসা, একটুখানি স্পর্শ, —ঘরের হাওয়া ক্ষণতরে আবার মিঠে হ'য়ে ওঠে। বিছানায় গা এলিয়ে বিভা বলে : "ডাক্তার কী বলে' গেল ? বাঁচবো না ?"

মাথার চুল প্রায় সব উঠে গেছে, তারই মধ্যে আঙুল বুলতে বুলতে বিমল বলে : "ডাক্তারের সাধ্য কি ও-কথা বলে ? আমারই প্রার্থনার কি আর জোর নেই ? ডাক্তার বল্‌লে, দু' সপ্তাহের মধ্যেই তুমি সেরে উঠ্‌বে। কাল থেকে জ্বর ত' তোমার আজ অনেক কমেছে।"

—"কমেছে নাকি ?" বিভার শুক্‌নো ঠোঁটের ধারে ম্লান একটি হাসি ভেসে উঠ্‌লো : "কৈ, আমাকে ত' বলনি। আমাকে কিন্তু উনি বললেন এই নতুন ওষুধটা খেলেই পেটের যন্ত্রণা অনেকটা আরাম হ'বে।"

—"নিশ্চয়। আমি যাই, নিয়ে আসি গে।"

—"না, তুমি আরেকটু বোস আমার কাছে। রাত্রে কি খাবে ?"

বিমল নীচু হ'য়ে স্ত্রীর কপালে ধীরে একটি চুম্বন দিলে।

সিঁড়িতে কা'র জুতোর আওয়াজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। বিমল তাড়াতাড়ি মুখ তুলে বল্লে,—"সুধীর এতক্ষণে এলো বোধ হয়।"

ঘরে ঢুকেই সুধীর প্রশ্ন করলো : "আজ কেমন আছ বৌদি ?" বলে' জামার সবগুলি পকেট উজাড় করে' সে নানাজাতীয় ফল বের করতে লাগ্‌লো—বেদানা আপেল আর কমলালেবু।—"এই সব সওদা করে' আস্‌তে দেরি হ'য়ে গেল। কেমন আছ আজ ?"

বিভার মুখ সুখে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে : "আজ অনেক ভালো মনে হচ্ছে। জানো, জ্বর আজকে নেই বল্‌লেই হয়। নতুন ডাক্তার আজ যিনি এসেছিলেন তাঁকে দেখ্‌লেই কেমন ভরসা হয় ভালো হ'য়ে উঠ্‌বো। (বিমলকে) তুমি এবার যাও, ঠাকুরপোই ত' এখন বস্‌তে পারবে।"

—"হ্যাঁ, আর কি—।" সুধীর কোটটা খুলে ব্র্যাকেটের হুকে টাঙিয়ে রেখে বিভার শিয়রে বসে' রুমাল বের করে' ঘাড় মুছ্‌তে লাগ্‌লো : "নীচেটা একেবারে অন্ধকার। ঝি-চাকর কেউ আসেনি বুঝি ?"

স্বামীর নীরবতা লক্ষ্য করে' বিভা অন্যমনে কখন জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলো—আকাশ, না তারা, না তার বর্ণহীন ভবিষ্যৎ—কী যে সে নির্ণয় করছিলো বলা কঠিন ; হঠাৎ স্বামীকে সম্বোধন করে' কি-একটা কথা বলতে গিয়ে টের পেলো ঘরে বিমল নেই।

—"উনি চলে' গেলেন ?"

বিভার একখানা হাত মুঠির মধ্যে টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে-করতে সুধীর বল্‌লো,—"হ্যাঁ, এইমাত্র।" তার পর একটু থেমে : "তোমার জ্বর কিছু কমেছে বলে' ত' মনে হচ্ছে না।"

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বিভা ফিকে একটু হেসে বল্লে,— "তুমি ছাই ডাক্তার হ'বে। ছাই তুমি অমন মোটা-মোটা বই পড়। রোগীর সামনে সত্য কথা বলতে নেই।" বলে'ই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল : "কোনো রকমেই কি ভালো হওয়া যায় না, ঠাকুরপো ? ওঁকে এক দিনের জন্যেও খুসি করতে পারলাম না। বিয়ের পর বছর খানেক যেতে না যেতেই এই যে বিছানা নিয়েছি, বোধ হয় চিতেয় চড়বার আগে আর ছাড়া পাবো না।"

মাঝখানে সুধীর কি বলতে যাচ্ছিল, বিভা বাধা দিয়ে বল্লে,—"সেদিন ওঁর মুখে শুন্‌লাম কে-একটা ছেলে নাকি নিজের মাথার মধ্যে স্বচ্ছন্দে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মরার মধ্যে নাকি ভীষণ মজা আছে। আমি ত' তা ভাবতেই পারি না, ভয়ে সমস্ত শরীর আমার কেঁপে ওঠে। সেদিন যে ভূমিকম্প হয়েছিলো মনে আছে, ঠাকুরপো ? দেয়াল-ছাত ভেঙে মাটির মধ্যে মিশিয়ে যাবো ভাবতে সে-ক'টা মুহূর্ত্ত যে আমার কী করে' কেটেছে বলতে পারবো না। তার পর থেকে সব সময়েই আমার মনে হচ্ছে আমি যেন শূন্যে ঘুরতে-ঘুরতে মাটির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। মরতে আমি কিছুতেই পারবো না। কিন্তু মরতে

যখন সত্যিই হবে একদিন, তখন হয় ত' টেরও পাবো না একটু। কি হ'বে?"

বিভার শঙ্কিত দুই চোখে অসহায় বেদনা!

অন্যমনস্কের মতো সুধীর বল্লে,—"ভালো হ'বে। জ্বরটা ফের একটু নামলেই হাওয়া বদ্‌লাতে নিয়ে যাবো তোমাকে। তুমি তখন আবার অনুভব করবে তুমি নববধূ—মনে দেহে পরিচয়ে। যৌবনকে আবার আবিষ্কার করবে, বৌদি।"

বিভা বল্লে,—"তোমাদের কত কষ্ট দিলুম। মা আর মলিনা এসেছিলো, ওদের পেয়ে জ্বর-টর সব পালালো—পুরী যাওয়া ঠিক করে' ফেলেছিলুম। ওদিকে বাবা মর-মর, মলিনারো সম্বন্ধ একটা প্রায় পাকা হ'য়ে এসেছে, মা আর দেরি করতে পারলেন না। বললেন; পুরী গিয়ে ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিস্। হুড়মুড় করে' আবার জ্বর এসে গেল। কোথায় বা পুরী, কোথায় বা কী!"

বিভার কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলুতে-বুলুতে সুধীর বল্লে,—"তোমার পুরী যেতে ইচ্ছে করে?"

—"খালি যেতে ইচ্ছে করে, ঠাকুরপো। ট্রেনে চাপলেই আমি ভালো হ'য়ে যাবো মনে হয়। গায়ে হু-হু করে' হাওয়া লাগলেই জ্বর নেমে যাবে দেখো। আমাকে তোমরা এমন করে' আটকে রেখেছ কেন? পেটের ব্যথাটা আবার টের পাচ্ছি যে, ঠাকুরপো। ওষুধটা নিয়ে উনি এখনো ফিরলেন না। ষ্টোভটা ঠিক করে' রাখ, উনুন-টুনুন আজ ধরানো হয় নি। পেটে হট্-ওয়াটার ব্যাগটা এবার চাপাতে হবে। মাগো!"

সুধীর নীচে গিয়ে ষ্টোভ মেরামত করতে বস্‌লো। উপর থেকে বিভার আর্ত্তনাদ কানে আস্‌চে: "ওষুধটা এক দাগ খেলেই কিন্তু এতক্ষণে ব্যথাটা নিশ্চয় পড়ে' যেত। তা হয় ত' ঐ টাকা দিয়ে উনি গেছেন ফিল্ম্ দেখতে। মানুষের মরতে ভয় করলেই কি আর মরণ হয় না নাকি?"

বিমল যখন ফিরে এলো, সুধীর ষ্টোভ সারিয়ে তার মাথায় এনামেলের ডেক্‌চি চাপিয়ে জল প্রায় ফুটিয়ে এনেছে। বিমলকে দেখতে পেয়েই সুধীর উদ্বিগ্ন হ'য়ে প্রশ্ন করলো: "ওষুধ এনেছ?"

বিমলের কণ্ঠে উদ্বেগের বাষ্পটুকুও নেই: "কেন?"

—"বৌদির যে ভীষণ ব্যথা উঠেছে, এতক্ষণে বোধ হয় অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন।"

শুক্‌নো হাসি হেসে বিমল বল্লে—"অজ্ঞান! বল কি! এই নাও ওষুধ।"

ওষুধের মোড়কটা খুল্‌তে খুল্‌তে সুধীর প্রায় ছুটে উপরে উঠে গেল। বলতে-বলতে গেল: "ব্যাগে জলটা পুরে' তুমিও শিগ্‌গির এস, বিমল-দা। ডাক্তারকে আরেকটা কল্ দিতে হ'তে পারে। হয় ত' একটা ইন্‌জেক্‌শান্ লাগ্‌বে।"

ডাক্তারকে ফের ডাক্‌তে যেতে হয় কি না তারই সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় বিমল নীচে একা অন্ধকারে উৎকর্ণ হ'য়ে বসে' রইলো। কিন্তু ডাক্তারকে আর দরকার নেই। ওষুধ তাঁর জোরালো; এক ঢোঁক পেটে পড়্‌তেই বিভা বেশ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে।

খবরটা সুধীরই এসে দিল: "মিনিট পনেরোর মধ্যেই ওষুধটা ধরেছে, বিমল-দা। মুখ-চোখের চেহারা যেমন হ'য়ে উঠেছিলো বৌদির, তার ওপর ওষুধ নিয়ে তুমি ফিরছ না,—আমি একেবারে অথৈ জলে পড়ে' গিয়েছিলাম আর-কি। ভাবলাম আর বুঝি ধরে' রাখা গেল না।"

সুধীরের মুখের পানে চেয়ে বিমল নীরবে সামান্য একটু হাসলে।

—"যখন ওঁর এমনি ব্যথা ওঠে তখন একা-একা কী করে' তুমি থাক?"

অত্যন্ত অসহায় স্বরে বিমল বল্লে,—"এই ভরসায়ই থাকি যে, ভগবানের কৃপায় আবার সে ব্যথা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাবে। হয়-ও তাই। নিবতে নিবতে বাতি আবার জ্বলে' ওঠে।"

—"এই ডাক্তারই 'কন্টিনু' কর। এতেই হয় ত' উনি সেরে উঠ্‌বেন।"

বিমলের মুখে সেই বিবর্ণ হাসি আবার ভেসে উঠ্‌লো।

সিঁড়ির এক ধাপ নেমে সুধীর বল্লে,—"তুমি একলাটি অন্ধকারে চুপ করে' বসে' আছ কেন?"

বিমল বল্লে,—"এই ত' বেশ আছি। তোমার বৌদি ত' এখন একটু ঘুমুচ্ছেন।"

—"না, খুঁজছেন তোমাকে। উপরে যাও এবার।"

সুধীরের মুখে উচ্চারিত হ'ল বলে' এই খবরটি মিথ্যা

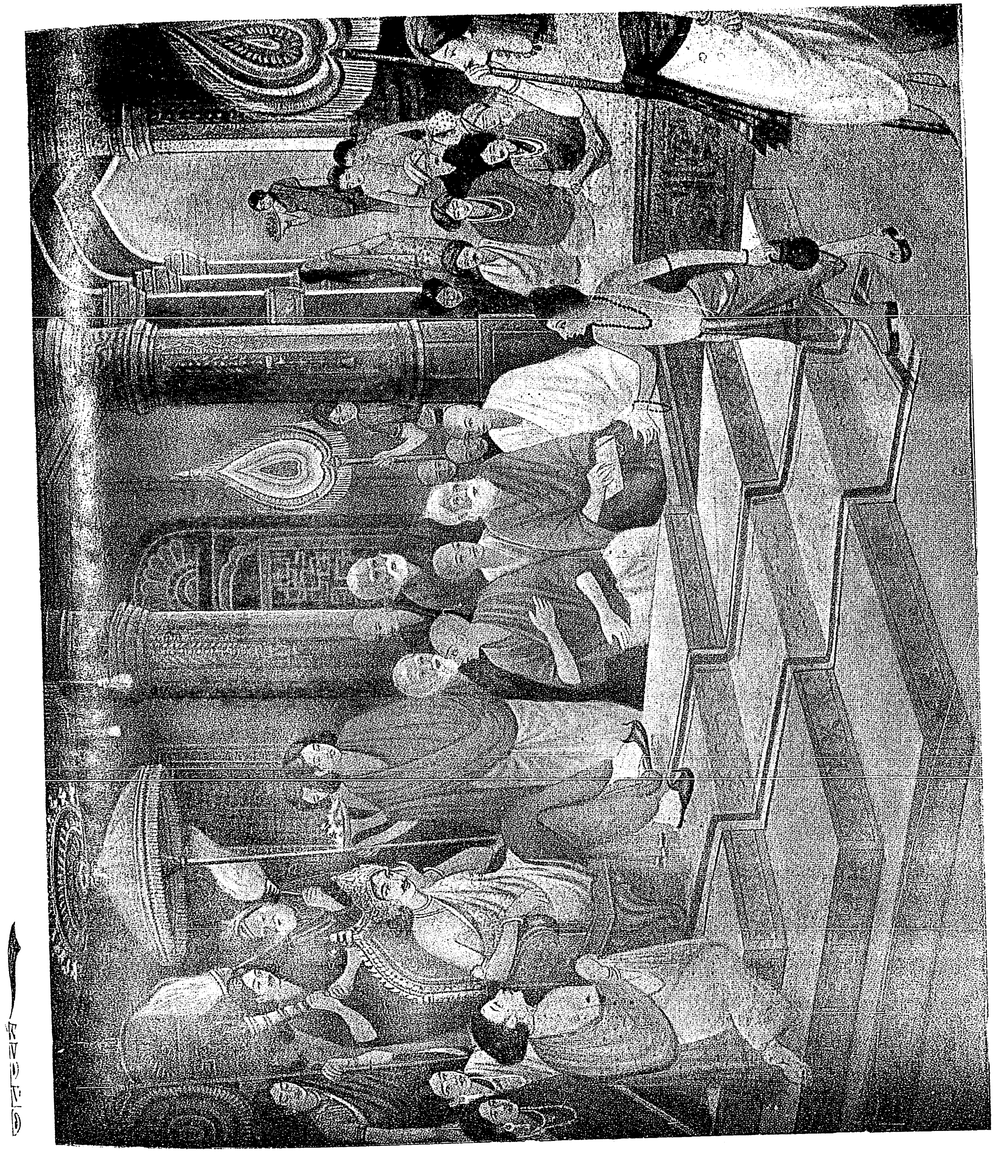

জনক-রাজসভায় অষ্টাবক্র

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মহারথী

হ'লেও বিমলের কেন না-জানি ভালো লাগলো। বিমল বল্লে,—"তুমি যাচ্ছ কোথায় ?"

—"একটা ফিডিং-কাপ্ কিনে নিয়ে আসি গে। যাব আর আসবো। তুমি ততক্ষণ ওঁর কাছে গিয়ে বোস একটু। রোগীকে একা-একা থাকতে দিতে নেই।"

শেষের কথাটা শুনে বিমলের মুখ সহসা কেমন গম্ভীর, কঠিন হ'য়ে উঠ্লো। তার পর অল্প একটু কেশে বস্‌লে,—"তার চেয়ে আমিই বরং ফিডিং-কাপ্‌টা নিয়ে আসি গে না! আমারই বা কতক্ষণ লাগবে ?"

—"না, বৌদি আমাকে বারে-বারে বলে' দিলেন তোমাকে ওপরে পাঠিয়ে দিতে। আমি এসে পড়লেই আবার ছুটি পাবে! আজকে থেকে রাতে আমিই ডিউটি দেব'খন। তুমি ঘুমিয়ো।" বলে' পকেট থেকে টর্চ বা'র করে' পথ চিন্‌তে চিন্‌তে সুধীর বেরিয়ে পড়্‌লো।

সেই রুগ্ন শ্রীহীন লুণ্ঠিতলাবণ্য নারীদেহ, ঘরের দেয়ালে মৃত্যুর নিয়তদোদুল্যমান ছায়া,—বিমলের মন বিতৃষ্ণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে এলো। সেই ঘরে এমন একটা চাপা বিশ্রী গন্ধ আছে যা বিমলের জীবনকে একেবারে পঙ্কিল করে' ছেড়েছে। ওষুধের মতই বিস্বাদ বিভার সান্নিধ্য,—তার চেয়ে এই খানিক আগে শহরের অজস্র মুখরতায় সে যে নির্বারিত চঞ্চল জীবনানন্দ ভোগ করে' এসেছিলো তার মাদকতা কতো নিদারুণ!

তবু তাকে পা টিপে টিপে উপরে উঠে যেতে হয়।

বিভা নির্জ্জীবের মতো পড়ে' আছে। ঘড়ির হৃৎপিণ্ডে মুহূর্ত্ত-মালার পদধ্বনি বাজ্‌ছে; তা ছাড়া অটুট নিস্তব্ধতা। বিভা সত্যিই নিশ্বাস নিচ্ছে কি না, কৌতূহলী হ'য়ে বিমল তার নাকের কাছে মুখ নোয়ালো। প্রেস্‌ক্রপ্‌সানে ডাক্তারেরো ত' ভুল হ'তে পারে। কিম্বা, এক ওষুধ দিতে হয়ত' অন্য ওষুধ কম্পাউণ্ডার ভুল করে' মিশিয়ে ফেলেছে। এমন যে হ'তে পারে না কোনোকালে তার অবশ্যি কোনো প্রমাণ নেই। কে জানে তাই টের পেয়ে সুধীর হয় ত' আগে থেকে সরে' পড়েছে।

নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে না। নিমেষে বিমলের মনে হোল ঘর-দেয়াল বাধা-বন্ধন সব ভেঙে-চুরে ছত্রখান হ'য়ে চারদিক একেবারে ফাঁকা পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। এখন যে তাকে চীৎকার করে' উঠ্‌তে হবে তার ভাবার্থ প্রতিবেশীরা ঠিক বুঝতে পারবে তো? শুভরাত্রির পর এত গভীর আনন্দে বিমল আর কোনোদিন স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করতে যায় নি। আকুল সম্ভাবনায় তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'তে লাগ্‌লো।

বুকের উপর স্বামীর স্পর্শ পেয়ে বিভা কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো: "এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ওষুধ আনবার নাম করে' কোন্ রাজ্যজয়ে বেরিয়েছিলে শুনি? ও কি, পান খেয়ে ঠোঁট দু'টো ত' খুব লাল করেছ দেখছি। বলি, পান কে দিলে?"

বিমল বিমূঢ়; মুখে তার কথা নেই; এবার নিজে সে অনুভব করতে চেষ্টা করছে সত্যিই সে নিশ্বাস ফেলছে কি না।

—"বলি, কোন্ শ্রী-হস্তের পান খাবার লোভে রোজ সন্ধেবেলায় এমনি যাওয়া হয় শুনি? আমি ত' একটা হাড়গিলে হ'য়ে আছি, তাই বুঝি এবার থেকে উড়ু-উড়ু! ক'টা পান খেলে? আর কিছু?"

বিমল তবু নিরুত্তর; ঘৃণায় যে সরে' যাবে তার পর্য্যন্ত শক্তি নেই।

—"বেশ ত' তাকে বিয়ে করে' নিয়ে এলেই হয়। আমি বুঝি তোমার পথের কাঁটা। মালিসের ঐ ওষুধটা শুনেছি বিষ, দাও না খানিকটা মুখে ঢেলে—চিরদিনের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে যাই। তারপর আমাকে যা-সব বলেছিলে সব আবার তাকে বলো। আমি কিন্তু তাকে অভিশাপ দিয়ে যাবো—সে যেন বিধবা হয়; সিঁদুর নিয়ে আমার মত মরার সৌভাগ্য তার যেন সাতজন্মেও না হয় কখনো।"

বিমল এবার স্ত্রীকে আদর করবার ভাণ করে' বল্লে—"কী বলছ যা-তা। ঘরে রান্নার আজ কিচ্ছু জোগাড় নেই, তাই ওষুধটা তৈরি করতে বলে' এক হোটেলে কিছু খেয়ে নিলাম। খাওয়ার পর দু' বেলায় দু'টি যে আমার পান চাই সে-কথা তুমি ভুলে গেলে নাকি?"

বিভা আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লো: "কিছুই ভুলিনি গো, কিছুই ভুলিনি, কিন্তু আমার এখনো মরণ হয় না কেন?"

আচম্বিতে বিমলেরো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: "হয় না কেন?"

কথাটা যে ফস্‌কে যাবে বিমল তা স্বপ্নেও ভাবেনি, কিন্তু বিভা উঠ্‌লো ক্ষিপ্ত হ'য়ে। বল্লে,—"কেন, কেন

আমি মরতে যাবো? তুমি আমার কে যে তোমার জন্যে প্রাণটা আমার বলি দিতে হ'বে?" বলে'ই দু' হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে' সে কাঁদ্‌তে সুরু করলে।

মুস্কিল! বিমল তাড়াতাড়ি তাকে কোলের কাছে আকর্ষণ করে' স্নিগ্ধস্বরে বল্লে,—"ছি বিভা, কি শুন্‌তে কি যে তুমি শোন তার ঠিক নেই। আমার কাছ থেকে কে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে? তোমার মরতে চাওয়ার চাইতে আমার বাঁচাতে চাওয়ার ইচ্ছাটা তো আর কম নয়। আমি তোমাকে না যেতে দিলে তুমি যাবে কী করে'?"

কিন্তু কা'র কথা কে শোনে? কেঁদে-ককিয়ে হাত পা ছুঁড়ে ধাক্কা মেরে আঁচড়ে-কাম্‌ড়ে বিভা স্বামীকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করে' ফেল্‌লে। রাগে বিমল বোধ হয় তাকে আরেকটু হ'লে আঘাত করে' বস্‌তো, কিন্তু এমন সময় ফিডিং-কাপ্ হাতে সুধীরের আবির্ভাব দেখে সে সাম্‌লে গেল:

—"নাও, তোমার বৌদিকে সাম্‌লাও এবার। তোমাদের সবাইকে ছেড়ে যাবেন ভেবে কেঁদে একেবারে ভুবন ভাসালেন। আমি কাছে থাকলে উচ্ছ্বাস আরো বেড়ে যাবে। বার্লি-ওয়াটারটা তুমিই করে' নিয়ো ভাই, কেমন?"

বিভার অজস্রোৎসারিত কান্নার দিকে চেয়ে সুধীর বল্লে,—"সে আর বলতে হবে না।"

ওষুধ-পত্রে কাপে গ্লাশে বোঝাই টেবিলটার কাছে এসে বিমল কি-একটা ছোট শিশি তুলে ধরলো; বল্‌লো,—"দু' ঘণ্টা পর-পরই তো মিক্‌শ্চারটা রিপিট্ করতে হবে, না? এই রইলো এটা। ও, না, এটা সেই মালিশের ওষুধ। দেখো, ভুল করে' এটা খাইয়ে দিয়ো না যেন। এটা আলাদা করে' রাখা উচিত।" মালিশের ওষুধটা বিমল একধারে সরিয়ে রাখলো—আলাদা করে'। যাবার সময় মুখ না ফিরিয়েই বলে' গেল: "ওটার দিকে একটু দৃষ্টি রেখো, সুধীর।"

দু' সপ্তাহেও কিছু সুরাহা হ'ল না,—বিভার অসুখ আরো বেড়ে গেল। পশু সাতাশে ভাদ্রে তার রোগভোগের এক বৎসর পুরো হবে।

বিভা বলে,—"মাকে শিগ্‌গির খবর পাঠাও, শেষকালে সেবার অভাবে মারা পড়বো নাকি?"

তিক্তস্বরে বিমল বলে,—"সেবার কোন্‌খানটায় তোমার ত্রুটি হয়েছে শুনি? ওষুধে-পথ্যে ডাক্তারে-কবরেজে একটা জমিদারি প্রায় ফতুর করে' এনেছ।"

সুধীর মাঝে পড়ে' ঝগড়াটাকে আর গড়াতে দেয় না; বলে,—"তবু অসুখের সময় সব সন্তানেরই মাকে কাছে পেলে ভালো লাগে, বিমল-দা। চাই কি, মাকে পেয়ে বৌদি সেরেও উঠ্‌তে পারেন। তা ছাড়া মলিনার বিয়ে হ'য়ে গেছে, এখন ত' ওঁর ছুটি।"

অতএব মাকে টেলি করা হ'ল।

মাকে পেয়ে বিভা আবার সত্যিই সেরে উঠ্‌ছে।

—"ডাক্তার আজ কী বলে' গেল বল না।"

—"বলে' গেল আর ভয় নেই। দিন সাতেক পরেই তুমি একটু চলতে পারলে আমরা পুরী যাবো। বাড়ি আমাদের ঠিক হ'য়ে আছে—ঠিক সমুদ্রের পারে।"

—"কিন্তু আমি আর তুমি। ঠাকুরপো যেতে চাইলে তাকে বারণ করে' দিয়ো। তার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে নিশ্চয়ই। মাকে ত' ফিরে যেতে হবেই—বাবার হাঁপানিটা নাকি ফের বেড়েছে।"

—"বিদেশে একা একা থাকতে তোমার অসুবিধে হবে না?"

—"একা কোথায়? এক দিকে তুমি, অন্য দিকে সমুদ্র। তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমার আনন্দের আর অবধি থাক্‌বে না। জ্বরটা আর না-হয়, এক ঘুম পরে চোখ চেয়ে জেগে দেখি সাতটা দিন স্বচ্ছন্দে ফুরিয়ে গেছে! জ্বর আর আসবে না, কি বল?"

স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বিমল বলে,—"না, এই সেরে উঠ্‌লে আর-কি! বহুদিন পরে মাথাটা আজ ধোয়াতে তোমাকে ভারি সুন্দর লাগ্‌ছে।"

দুপুরের নির্জ্জনতায় হারানো সুর আবার ফিরে আসে।

বিভা বলে,—"আরেকটু ঘেঁসে এসে বোস না। মাকে এখন একটু ছুটি দিয়েছি। এ ক'দিন তাঁর আর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ ছিলো না।" তারপর একটু থেমে: "সত্যিই আমি খুব কুৎসিত হ'য়ে গেছি, না? দেয়াল থেকে আমাদের ঐ ফোটোটা পেড়ে আনো না, আর ঐ আয়নাটা।"

বিমল পালঙের উপর আরো একটু বিস্তৃত হ'য়ে বসে' বলে,—"কপালে তোমার সিন্দুর—এই তোমার বড়ো সৌন্দর্য্য, বিভা।"

বিভার চোখে জল আসে; স্বামীর একটা হাত গালের উপর টেনে এনে বলে,—"কত পয়সা আমার জন্যে তোমার বেরিয়ে গেল। চাকরি না করে' যা দু' পয়সা আছে তা আরামে ভোগ করবে বলে' কত-কিছু মতলোব করেছিলে, কিছুই আমি হ'তে দিলাম না। আচ্ছা, আমি যদি মরে' যাই, তবে তুমি আবার বিয়ে করবে?"

বিমল তার গালে হাত বুলুতে বুলুতে বলে,—"ও কথা বলতে নেই, বিভা। কে কার আগে মরে, কিছু ঠিক আছে?"

—"না, কেন তুমি বিয়ে করবে না। এমন কাজে স্বার্থপরতা আমার নেই। তুমি আবার বিয়ে কোরো। আমার জন্যে তুমি সন্ন্যেসি হ'য়ে থাকবে সে-কথা ভাবলেও আমার দুঃখ হয়। মরে' গেলে আমি উঁকি মেরে তোমাদের দু'জনকে দেখতে পাবো তো?"

কোন কথা না কয়ে' বিমল তাড়াতাড়ি নীচু হ'য়ে স্ত্রীকে চুম্বন করে' বাক্যস্রোত বন্ধ করে' দেয়।

বিভা বলে,—"আজ তো আমি ভালো আছি, ক্লাবে যাও না আজ।"

—"হ্যাঁ, আজকে একবার যাবো।"

চকিতে বিভার মুখ মেঘ্‌লা হ'য়ে আসে। শিথিল হাতটা ধীরে কপালের উপর রেখে সে চোখ বোজে। আলাপ আর জমে না।

—"তুমি এখন একটু ঘুমোও।" বলে' বিমল উঠে পড়ে।

সুর যায় কেটে।

ক্লাব থেকে রাত করে' বাড়ি ফিরে এসে শুন্‌লো বিভার আবার জ্বর এসেছে। সঙ্গে পেটে সেই তীব্র ব্যথা। সুধীর ডাক্তার ডেকে এনেছিলো, ইন্‌জেক্‌শান্ দিয়ে ঘুম

পাড়িয়ে রেখে গেছেন। ক্লাবে বিমলকেও খবর দেওয়া হ'ত, কিন্তু অযথা তাকে বিব্রত করবার ইচ্ছা নাকি বিভার ছিলো না; তাই চাকরকে আর পাঠানো হয়নি।

বিমল শাশুড়িকে লক্ষ্য করে' বল্‌লো,—"সে কেমন কথা? বাড়িতে যমে-মানুষে টানাটানি আর বাইরে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাস পিট্‌বো? ভাবনা বুঝি খালি আপনাদেরই? আমি বুঝি কেউ নই?"

ব্যথাটা আর পড়তে চায় না। তবু বিকেল হওয়া-মাত্রই বিমল বেরিয়ে পড়ে, ফেরে গভীর রাতে। ফেরবার সময় ওদের গলির মুখের কাছে একটু দাঁড়ায়, একটা আর্ত্তনাদ শোন্‌বার আশায় কান পেতে থাকে। এমনো হ'তে পারে প্রথম আঘাতের প্রাবল্যে সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। হয়তো বিমলের আবির্ভাবে সে-স্তব্ধতা সহসা টুকরো-টুকরো হ'য়ে যাবে।

দুরু দুরু বুক নিয়ে বিমল উপরে উঠে আসে। সমুখেই সুধীরকে দেখ্‌তে পেয়ে শুধোয়: "কেমন আছে?"

সুধীর বলে,—"সেই একই অবস্থা।"

কোনো কোনোদিন বলে,—"একটু ভালো। ব্যথাটা নেই। জ্বরো নামবার দিকে।"

শাশুড়ির আর সয় না, একদিন বলেন,—"বাড়িতে এমন একটা রুগী, এত রাত করে' বাড়ি না ফিরলে কি আর চলে না বাছা?"

বিমল মুখের 'পরেই জবাব দেয়: "আপনিই ত' আছেন। আমি থেকে আর কি করব। সুধীরই তো সব তদারক করছে। বাড়িতে ডাক্তার-বদ্যির ত' হাট বসে' গেছে। এততেও যদি মেয়ে আপনার না সারে তবে আমি আর কি করি বলুন।"

ক্লাবে তাসের আড্ডা দারুণ জমে' উঠেছে এমনি সময় সনাতন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে একেবারে ফরাসের ধারে আছড়ে পড়্‌লো: "বাবু, শিগ্‌গির বাড়ি চলুন।"

তাস ভাঁজা না থামিয়েই বিমল শুধোল,—"কেন, কি হয়েছে?"

উত্তর কি হ'বে বিমলের বুঝি জানা ছিলো। নইলে কি আর চাকর পাঠিয়ে দিয়েছে?

সনাতন হাঁপ নিয়ে বল্‌লো,—"শিগ্‌গির চলুন বাবু, মা'র অবস্থা ভালো নয়। দাদাবাবু আপনাকে ডাকতে পাঠালেন।"

ঘরের সব লোক স্তব্ধ হ'য়ে সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বিমল বল্লে,—"বেঁচে আছে তো?"

উত্তর কি হ'বে বিমলের জানা ছিলো বৈ কি।

—"এখনো আছেন, কিন্তু বেশিক্ষণ বোধ হয় আর নেই।"

—"চল্ যাচ্ছি। সঙ্গে তোমরা কেউ আসবে নাকি হে শম্ভু? তুমি পাঁচুগোপাল? শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক আমাদের নেই তেমন।"

শম্ভু বল্লে,—"কাল থেকে আমার সর্দ্দি ভাই।"

পাঁচুগোপালের বাড়ি চেৎলার হাট পেরিয়ে, মড়া পুড়িয়ে একা ফিরতে তার ভয় করবে।

অগত্যা বিমল একাই বাড়ি চল্‌লো।

সনাতন বল্লে,—"আপনাকে মোটরে করে' তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছে। মা হয়তো আর নেই।"

বিমল ধম্‌কে উঠ্‌লো: "এ রাত্রে কোথায় তোর মোটর? রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একটাও?"

—"আপনি যদি বলেন তো বড় রাস্তা থেকে একটা ধরে' নিয়ে আসি।"

—"তোর আসতে আসতে ওদিকে সব সাফ হ'য়ে যাক্। দরকার নেই। চল্ পা চালিয়ে।"

গলির মুখে এসে বিমল দাঁড়ালো; সনাতন খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে সমুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো: "মা আর নেই, বাবু। তাঁকে আর দেখ্‌তে পেলেন না।"

—"কি, কি করে' জান্‌লি তুই?"

—"কান্না শুন্‌তে পাচ্ছেন না?"

—"তুই পাচ্ছিস্? কোথায়?"

দুইজনে উৎকর্ণ হ'য়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। কান্না কোথাও সত্যি শোনা যায় না। ফাঁকি!

বিমল ধম্‌কে ওঠে: "ঠেসে গাঁজা খেয়েছিস বুঝি? কানের মধ্যে বুঝি লাট্টু ঘোরার আওয়াজ হচ্ছে?"

—"তাই যেন হয় বাবু। আমাদের যেন কাঁদতে না হয় কোনোদিন।"

কিন্তু কে জানে, হয় তো খানিকক্ষণের জন্যে কান্নাটা চাপা পড়ে' আছে। কাঁদবার মধ্যে ত' শাশুড়ি—বুড়ো ফুস্‌ফুসে আর কত জোর হবে!

নীচেই সুধীরের সঙ্গে দেখা। ব্যাকুল হ'য়ে বিমলের ফেরবার প্রতীক্ষা করছে।

পাংশু মুখে বিমল প্রশ্ন করলো: "কি?"

সুধীর বল্লে,—"অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিলো মায়ের; পরাণ বাবুদের বাড়ি থেকে ব্যানার্জিকে ফোন্ করে' দিলাম। ইন্‌জেকশান্ দিয়ে ব্যাথাটা বন্ধ করে' দিলেন বটে, কিন্তু হার্টের অবস্থা সুবিধের নয়। রাতে ফের ব্যথা উঠ্‌লে একটা ওষুধ খেতে দিয়ে গেছেন! তাতে যদি না ধরে, তবে আবার তাঁকে কল্ দিতে হ'বে। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যথাই যে এবার সুরু হয়েছে!"

—"আমাকে আগে খবর পাঠাওনি, সুধীর?" বলে' বিমল অত্যন্ত দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল।

উপরে শোকের সমারোহের ত্রুটি হয় নি। সমবেদনা জানাতে প্রতিবেশিনীরা পর্য্যন্ত এসে জুটেছে। মা বিস্ফারিত শূন্য দৃষ্টিতে অন্ধকার দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন।

বিভার চেহারা দেখে সন্দেহ হয় এই রাত্রিও সে টিকবে না। মুখচ্ছবি শ্রান্ত, পাণ্ডুর, আভাহীন!

বিমলকে ঘরে ঢুকতে দেখে পাড়ার মেয়েরা সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। বিমল অতিব্যস্ততার ভাণ করে' সেই জনতার মাঝেই স্ত্রীকে স্পর্শ করতে যাচ্ছিলো, এক জন বর্ষীয়সী মহিলা তাকে বাধা দিয়ে বল্লেন,—"অনেকক্ষণ পর এই একটু ঘুমিয়েছে বাবা, তোমার ছোঁয়া পেলে তন্দ্রাটুকু ভেঙে যেতে পারে। তুমি তো আর অবোধ নও। তোমার অধীর হ'লে কি চলে? ঘুম যখন এসেছে একটু, এ-রাত্রি হয় তো কেটে যাবে।"

প্রেম প্রমাণিত করতে বিমল বিভার পায়ের কাছে অতি সন্তর্পণে বসতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ বিভা তন্দ্রা ভুলে স্পষ্ট প্রখর কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লো: "এখেনে আবার মরতে এসেছে কেন? যাও যাও, দূর হও এখান থেকে। পান খেয়ে আসনি আজ? আমি মরলেই তো তোমার রাস্তা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। অতদিন আর দেরি কেন? এক্ষুনিই ধরে' আনো না একটা। দু'জনে মিলে খুব তাস পিট্‌তে পারবে। যাও আমার সমুখ থেকে। ঠাকুরপো, একে আবার এ-ঘরে ঢুকতে দিয়েছ কেন?"

এ-জগতে এমন অপমান কে কবে পেয়েছে? তবু

অলৌকিক উদারতার ভাণ করে' বিমল উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে' বল্লে,—"রোগে ভুগে-ভুগে বেচারি একেবারে গেল। কাঁহাতক আর মাথার ঠিক থাকে। কিন্তু ঈশ্বর বলে' সত্যি কি কেউ নেই?"

বাইরে বারান্দায় এসেই হাঁক দিলো: "সুধীর!"

সুধীর ততক্ষণে সাইক্লে করে' ওষুধের দোকান ঘুরে এসেছে।

—"ওষুধটা আনলে?"

—"হ্যাঁ, এই যে। আচ্ছা দাম নিলে যা হোক্।"

—"তা নিক্। দেখি।"

সুধীরের হাত থেকে ওষুধটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেখতে বল্লে,—"ব্যথাটা আবার উঠ্‌লেই খাইয়ে দিতে হবে বলেছে? এমন কালো রং! বিষ-টিষ নয় তো?"

অল্প একটু হেসে সুধীর বল্লে,—"তোমার মাথা খারাপ নাকি?"

—"যাই, টেবিলের উপর রেখে আসি। তোমার খাওয়া হয়েছে ত'?"

—"না। এবার মেস থেকে একটু ঘুরে আসি গে। বৌদি ত' এখন একটু ঘুমুচ্ছেন—ব্যাথাটা উঠ্‌লেই হার্ট য়্যাফেক্ট্ করে—সেই যা ভয়।"

—"সে কি, মেস্‌এ যাবে কি? এখানে তোমার খাওয়ার জোগাড় হয় নি? ঠাকুরটা পালিয়েছে এরি মধ্যে?"

—"না না সে-জন্যে নয়। মেস্‌এ আমার সামান্য একটু কাজ আছে।"

—"কিন্তু কখন কি হয় বলা যায় না।"

—"আমি দশ মিনিটের মধ্যে চলে' আসবো।"

গভীর হতাশার সুরে বিমল বল্লে,—"কিন্তু সত্যিই কি আর আশা নেই, সুধীর?"

সুধীরের কণ্ঠে অভয়: "কার সাধ্য বৌদিকে ছিনিয়ে নেয়? তুমি যাও ওপরে—এর মধ্যে ব্যথা উঠ্‌লে ওষুধটা এক দাগ খাইয়ে দিয়ো। আমি এই আস্‌ছি।"

বিমল উপরে উঠে গেল, কিন্তু রোগীর ঘরে নয়—একেবারে ছাতে, খোলা ছাতে। জীবনে এবার সে সত্যিই ছুটি পাবে, পাবে বিস্তৃতি, অমেয় অধিকার। প্রতিদিনের এই অপরিবর্ত্তনীয় পুনরাবৃত্তির মাঝে নিজেকে আর সে ক্ষয় করে' ফেল্‌বে না। তার অনেক কর্ম্ম, অনেক সাধনা, অনাবিষ্কৃত ভবিষ্যৎ! সে চায় স্রোত—অজস্র, ফেনিল, গাঢ়! সে-স্রোতে মৃতদেহ ভেসে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক্। একা সে পরিপূর্ণ করে' বাঁচলেই বিপুলা পৃথ্বী আর নিরবধি কাল কৃতার্থ হ'বে।

কিন্তু বেশিক্ষণ ছাতে থাকলে চল্‌বে না, সুধীর এসে খোঁজ পেলে লজ্জার ব্যাপার হবে! ঘরে না থাকলেও কাছাকাছি কোথাও প্রতীক্ষা করা উচিত।

দোতলায় নামতেই সুধীরের সঙ্গে দেখা,—এইমাত্র সে ফিরেছে। সুধীর জিগগেস করলো: "বেদ্‌নাটা ওঠে নি?"

বিমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: "না বোধ হয়।"

—"বোধ হয়? খবর নাও নি?" সুধীর বিমলের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হেনে ঘরে গিয়ে দেখলো বিভা তখনো চুপ করে' চোখ বুজে' আছে। নিশ্বাস যেন আর টানতে পারছে না।

বিমল একবার একটু উঁকি মেরে অবস্থাটা নিরূপণ করে' অতি আস্তে ঘরে ঢুকে পড়লো।

সব চুপচাপ। কারো মুখে রা নেই। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনবার আশায় সবাই যেন ধ্যান করছে।

কিন্তু কতক্ষণ! হঠাৎ সমস্ত শরীরে আহত সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বিভা বিকটস্বরে চীৎকার করে' উঠ্‌লো। সেই ব্যথা!

সুধীর লণ্ঠনটা তুলে টেবিলটা হাতড়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো: "ওষুধ? সেই ওষুধটা?"

বিমল বিভার বিকৃত বেদনার্ত্ত মুখের দিকে চেয়ে শুকনো গলায় বল্লে,—"কেন, ঐ টেবিলের ওপরই ত' রেখেছিলাম। কোথায় আর যাবে?"

টেবিলে ছোট-বড়ো নানা মাপের শিশি-বোতল রাশীকৃত হ'য়ে আছে—সুধীর অল্প আলোকে কিছুরই ঠিক দিশে পায় না। মেরেরাও সন্ত্রস্ত হ'য়ে খুঁজতে লেগেছে। পালঙের তলা থেকে কেউ ফিনাইল্‌এর বোতর বের করে' শুধোয়: "এটা?" কেউ স্মেলিঙ সল্‌টের নীল শিশিটা খুঁজে এনে বলে: "এটা নিশ্চয়ই।"

বিমল স্থির, জিজ্ঞাসাহীন।

বিভা সমানে চীৎকার করছে। বিভার মা দেয়ালে কপাল কুট্‌তে লেগেছেন।

সুধীর তীক্ষ্ণস্বরে ধমকে উঠ্‌লো: "কোথায় রেখেছ ওষুধ? তোমার এতটুকু দায়িত্ব নেই? শিগ্‌গির খুঁজে বার করে' দাও বলছি।"

বিমল টেবিলের দিকে এগিয়ে এসে নির্লিপ্তের মতো বল্‌লে,—"তোমার হাত থেকে নিয়ে এখেনেই তো রাখলাম। উড়ে' তো আর যায়নি। সব ওলোট পালোট করে' রাখ্‌লে কী করে' খোঁজা যায় বল? আলোটা আরো একটু বাড়িয়ে দাও না।"

সহসা শরীরে একটা মোচড় দিয়ে বিভা দাঁতে দাঁত ঘষে' একটা বীভৎস শব্দ করলে। লণ্ঠনটা মেঝের উপর বসিয়ে সুধীর তাড়াতাড়ি বিভার কাছে ছুটে এলো, অশ্রু-বিগলিত করুণ স্বরে ডাকলে: "বৌদি।"

সুধীরের কণ্ঠে এই কাকুতি শুনে ঘরময় শোকবন্যা উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌লো। বিভার জীবনের পরমলগ্ন ঘনিয়ে এল বুঝি। এই দৃশ্য বিমল আর স্থির হ'য়ে দেখতে পারলো না। সহসা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল: "এ্যাঁ! ওষুধের শিশিটা যে আমার পকেটেই ছিলো দেখছি।"

সুধীর বিভার শয্যাপ্রান্তে নত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো, এবার খাড়া হ'ল। রূঢ়, নির্ম্মম সে ভঙ্গি! হাত বাড়িয়ে বললো,—"শিগ্‌গির দাও।"

—"এ কি? শিশিটা যে ভাঙা! ওষুধ সব যে কখন পড়ে' গেছে, সুধীর! কী হবে?"

ঘরে শোকের আরেকটা প্রবল ঢেউ আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌লো।

—"শিগগির ছুটে যাও, ব্যানার্জিকে ডেকে নিয়ে এস। আমার সাইক্‌ল্‌টা নিয়ে যাও। এক্ষুনি। ঘুমের থেকে টেনে তুলে নিয়ে আসবে। আর তোমরা একটু থাম দেখি দয়া করে'। এখনো আশা আছে। দেখি আমি কী করতে পারি।"

এখনো আশা আছে!

বিমল অবশ্যি সাইক্‌ল্‌টা নিলে না। সে যে সাইক্‌ল চড়তে জানে এ-সম্বন্ধে সুধীরের কাছে কোনো নজির নেই। রাস্তায় বেরিয়ে এসে গলির মোড়ের পানের দোকান থেকে সে বিড়ি কিনলো ও আরো খানিকটা এগিয়ে এসে একটা পাহারওয়ালার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলে।

ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া, তাঁর ঘুম ভাঙানো, মোটরের সোফার বাগানো (ব্যানার্জি নিজে ড্রাইভ্‌ করতে পারে কি না কে জানে) ইত্যাদি তো একটা তুড়ি মেরে লাফ দিলেই ঘটে' ওঠে না। ঘড়ি তো ইলেকট্রিকে চলে না আর। কত দিনের গুমোটের পর দক্ষিণ থেকে আজ কেমন হাওয়া দিয়েছে। আকাশ-ভরা তারা। একটা ট্যাক্সি পেলে চৌরঙ্গিতে বেশ একটু বেড়ানো যেত যা হোক্‌।

ঘণ্টা খানেক স্বচ্ছন্দে কেটে গেছে। বিমল মন্থর পদে বাড়ির মুখে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু গলির মোড়ে এসে দাঁড়াতেই সেই সুষুপ্ত নিস্তব্ধতা। পাড়াটা নিঝুম। আরো দু' পা এগিয়ে এসে বিমল থামলো। তার বাড়িটা পটে আঁকা ছবির মতো স্থির। খোলা জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু একটিও অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ব্যাপার কী?

সদর দরজা খোলা,—সনাতন বাইরে শুয়ে আছে। তবে ওকে ফেরবার সুযোগ না দিয়েই বিভাকে ওরা নিয়ে গেছে নাকি? সোজা শ্মশানে যাবার খবরটা বলতেই সনাতন এখনো বসে' আছে বুঝি। এখন ক'টা বাজ্‌লো? পার্কে বেঞ্চিতে বসে' ও ঘুমিয়ে পড়েছিলো হয় তো, ঘণ্টার আর হিসেব নেই।

বিমল চাকরটাকে শুধোলো: "কি?"

—"একটু ভালো আছেন এখন।"

—"সে কি রে? ভালো আছেন কি বলছিস?"

—"হ্যাঁ বাবু, যান না ওপরে।"

চোরের মতো বিমল উপরে উঠে এলো। দোতলার মাঝের দালানটায় সুধীর অস্থির হ'য়ে পাইচারি করছে। রোগীর ঘর স্তব্ধ। আলোগুলি কমানো। আবহাওয়াটি হাল্কা।

বিমলকে দেখেই সুধীর ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো: "কৈ? ডাক্তারবাবু এলেন?"

নিতান্ত অপরাধীর মতো ধরা গলায় বিমল বল্লে,—"বাড়িতে নেই। কোন্‌ এক জরুরি কল্‌এ চুঁচ্‌ড়োয় চলে' গেছেন বল্লে।"

—"চলে' গেছেন? সে কি কথা? আমার সঙ্গে appointment করে' চলে' গেলেন? এ হ'তেই পারে না। রাতের ফি কি আর আমরা দিতাম না?"

—"দিতামই তো।"

—"তুমি কোন্‌ ব্যানার্জির বাড়ি গিয়েছিলে? চক্রবেড়ের প্রতাপবাবুর বাড়িতে না?"

চোখ কপালে তুলে বিমল বল্লে,—"না তো। আমি গিয়েছিলাম বিড্‌ন্‌ ষ্ট্রিটে। ছি ছি! যাবো এবার? এই তো কাছেই।"

বাধা দিয়ে সুধীর বল্লে,—"দরকার হবে না। বৌদি এখন বেশ ভালো আছেন।"

—"ভালো আছেন?"

—"হ্যাঁ, ভাগ্যিস্‌ তখন বুদ্ধি করে' মেস থেকে সিরিঞ্জটা নিয়ে এসেছিলাম, মরীয়া হ'য়ে নিজেই ঈশ্বরের নাম নিয়ে দিলাম ইন্‌ট্রাভেনাস্‌। এম-বি হ'য়ে বেরুবার দিন পর্য্যন্ত ছ' মাস প্রতীক্ষা করতে গেলে বৌদিকে আর এ-যাত্রা ঠেকানো যেত না, বিমল-দা। সাহস করে' বিদ্যা জাহির করে' দিলাম—অবশ্য মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে'ই। হাতে হাতে ফল মিলে গেল। হার্ট দুর্ব্বল বটে, কিন্তু বোধ হয় আজ আর ভয় নেই।" নীরবে আর দু' চক্কর হেঁটে ফের বল্লে,—"তুমি খুব বেশি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছ, সনাতন তোমার জন্যে বিছানা করে' রেখেছে—তুমি এবার ঘুমোও গে।"

বিমল শুধু বলতে পারলো: "আর তুমি?"

—"আমাকে সারা রাত জেগে পাহারা দিতে হ'বে। তুমি যাও।"

এবার আর ব্যানার্জি নয়, সুধীর সাহেব-ডাক্তার নিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজি!

তেরো দিন যেতেই জ্বর গেল নেমে, ব্যথা গেল তলিয়ে। একুশ দিনের দিন বিভা বিছানায় উঠে বসতে পারলো। বিমলের হাত ধরে' ধীরে ধীরে জানলায় এসে দাঁড়াতে পারলো আরো সপ্তাহ খানেক বাদে।

বিভাকে আর পায় কে? যতো কিছু ছেলেমানুষি, যতো কিছু আখখুটেপনা! ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াবে, বৃষ্টিতে ভিজবে, তেঁতুলের টক না খেলে ইহজীবনে আর অর্থ থাকবে না। রোদ্দুরে দিয়ে নতুন শাড়ি পরে, পরিত্যক্ত দু' চার-গাছি চুল নিয়ে বিনুনি বাঁধবার চেষ্টা করে, রূপানুশীলনে ব্যর্থকাম হ'য়ে স্বামীর সংজ্ঞানুসারে কপালে সুন্দর করে' সিন্দুর আঁকা।

কিন্তু পৈতৃক সম্বন্ধের কি সূত্র ধরে' হঠাৎ একদিন বিভার হাঁপানি দেখা দিলো।

সাহেব ডাক্তার বল্লেন,—"হাওয়া বদল কর। পুরী মন্দ নয়।"

বিভার খুসি আর ধরে না। বাড়ি তো কবে থেকেই পাকা, সঙ্গে যাবে সনাতন আর ঠাকুর, মা আসবেন, বরের সঙ্গে মলিনা এসেও বেড়িয়ে যেতে পারে।

সুধীর বলে,—"আর আমি বুঝি বাদ?"

বিভা হেসে বলে,—"তুমি না গেলেই ত' বাদ।"

আর,—দেহরক্ষী বিমল, ভারবাহক! একটি অস্থি-স্তূপকে কাঁধে করে' তার সমস্ত জীবন পরিক্রমণ করতে হ'বে।

বিভা বলে,—"সমুদ্রের নাম শুনেই আমার নিশ্বাস ভরে' আসে, ঠাকুরপো। লোনা জল গায়ে লাগিয়ে আমি সোনা হ'য়ে ফিরে আসবো দেখো।"

সাহেব ডাক্তার বলে' দিলেন; "যত খুসি গায়ে হাওয়া লাগিয়ো, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে হুঁসিয়ার। Ozone-এই ওজন বাড়বে।"

বিভা নাক সিঁট্‌কে বলে,—"রেখে দাও ডাক্তারি। আমার নিজের জোরে শরীরে স্বাস্থ্যের জোয়ার নিয়ে আস্‌বো। আমার দেহই হবে আমার কাব্যসৃষ্টি।"

ট্রেন ছাড়্‌লে বিভা বল্লে,—"আমার আবার নতুন করে' বিয়ে হচ্ছে। কী যে ভালো লাগছে বলবার মত ভাষা খুঁজবো বলে'ই এখনো বেঁচে আছি।" বলে' নির্জ্জন কামরায় বিভা বিমলের বুকের উপর মাথাটা এলিয়ে দিলো।

বিমল বল্লে,—"ওষুধপত্র, নতুন atomizerটা—সব সঙ্গে নিয়েছ তো?"

বিভা বিমনা হ'য়ে বল্লে,—"নিয়েছি। কিন্তু ও-সব আর লাগবে না দেখো।"

—"বেশ ঠাণ্ডা আসছে কিন্তু। র‍্যাপারটা ভালো করে'

গায়ে দাও। কম্ফার্টারিটা কোথায় রাখলে আবার? গলাটা জড়াও। পায়ে মোজা আছে তো?"

বিভা আপত্তি করলো: "ঠাকুরপো বলে হাওয়া লাগালে বুকের কিচ্ছু ক্ষেতি হয় না।"

—"ফোঁপরদালালি করতে ঠাকুরপো আজ আর সঙ্গে নেই—এই বুঝে। নাও, কথা শোন।"

অপরাধীর মত নির্বিরোধে বিভা ক্রমশ একটি জামা-কাপড়ের পুঁটলি হ'তে থাকে।

—"এই হাঁচতে সুরু করেছ তো? হয়েছে! দাঁড়াও, জান্‌লাটা তুলে দি।"

—"জান্‌লা তুলে দিলে আমি মরে' যাবো।"

কাঠের জান্‌লাটা নামিয়ে ও কাঁচেরটা তুলে দিতে দিতে বিমল গম্ভীর হ'য়ে বল্লে,—"মরা অত সস্তা নয়।"

দূরের দিকের জান্‌লা দিয়ে বিভা শূন্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে রইলো।

পরে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় স্বামীর কাছে এসে করুণ-কণ্ঠে বল্লে—"আমি মরে' গেলে তুমি কাঁদতে? কী বলে' কাঁদতে বল না।"

—"কাঁদবার দিন মানুষের ফুরোয় না একদিনে। কিন্তু রাত্তির করে' বক-বক না করে' এখন একটু ঘুমোও দেখি। বেশি রাত জেগে পেট-গরম হ'লে আবার সেই ব্যথাই টের পাবে'খন।"

কথাটা অভিশাপের মতো কানে লাগে। বিভা চুপ।

তারপর আবার সে-ই বলে,—"আমি এমন একটা কঠিন অসুখ থেকে ভালো হ'য়ে উঠ্‌লাম, অথচ তুমি একদিনো আমাকে একটু আদর করলে না।"

বিমলের কথাটা বিদ্রূপের মতো শোনায়: "ভালো হ'য়ে উঠেছ নাকি?"

—"নিশ্চয়। বাঁচ্‌বো—আমার এই ইচ্ছাই আমাকে আয়ুষ্মতী করে' রাখবে।"

—"তুমি পাবে আয়ু, আর তাকে টিঁকিয়ে রাখতে আমার আয় যাবে শূন্যের ঘরে—হিসেবটা ঠিক হ'ল না।"

বিভার মুখ মলিন হয়ে ওঠে: "কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যদি আয়ু পাই, তবে আমার কল্যাণে শূন্য তোমার বামবর্ত্তী সংখ্যা নিয়ে অজস্র হ'য়ে উঠ্‌বে। আমি বামে থাকলে তোমার শক্তি ও সম্পদের আর অভাব কোথায়?"

এই বলে' সে নিজেই স্বামীর গ্রীবাবেষ্টন করে' নিজের গাল এনে বিমলের গালে ঠেকালো। মুহূর্ত্তে বিমল আহত হ'য়ে সরে গিয়ে বল্লে,—"তোমার জ্বর হয়েছে ফের?"

বিভার মুখ শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল। চোখ দুটি ভীত, মুখে অপার বিষণ্ণতা! নিজের কপালে নিজেই হাত রেখে অস্পষ্ট করে' বল্লে,—"জ্বর? না তো?"

—"না তো কি? স্পষ্ট জ্বর। বার কর থার্ম্মমিটার।"

পাছে রূঢ় নিদারুণ সত্যের মুখোমুখি হ'তে হয় সেই ভয়ে বিভা আর বাক্স খুললে না।

—"বেশ। জ্বর-জ্বর করতেই জর্জ্জর হ'য়ে থাক আর কি।" তারপর ধমকে: "শুয়ে পড় এক্ষুনি। ওঁকে আবার আদর করতে হবে!"

বিভা দ্বিরুক্তি না করে' গুটিসুটি হ'য়ে অমনি বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়লো। মনে-মনে গুণে'-গুণে' তেত্রিশ-কোটি দেবতার কাছে সে প্রার্থনা করতে লাগ্‌লো—জ্বর যেন তার না আসে! হাঁপানি হ'লে এক সময় কমবার সম্ভাবনা আছে, অল্প-অল্প পেটে-ব্যথা কষ্ট করে' তবু চাপা যায়, নিজে না ঢাক পেটালে কেউ টের পায় না; কিন্তু জ্বর একবার হাড়ের মাঝে বাসা নিলে আর যেতে চায় না—গায়ে হাত ছোঁয়ালেই যে ধরা পড়বার ভয়! তবে সমুদ্রে সে কেমন করে' স্নান করবে? সমুদ্রে স্নান না করলে সারবে কী করে'?

সমুদ্রের ধারেই ছোট একতলা বাড়ি—নূতন চূণকাম করা, ফিট্‌ফাট্। সামনে সমুদ্র—ফুলশয্যার রাতে বিভারই হৃদয়ের মতো ব্যাকুল। অহর্নিশি গর্জ্জন করছে। কলকাতায় রোগের যন্ত্রণায় সে যখন আর্ত্তনাদ করছিলো তখনো সমুদ্র এমনি প্রতিধ্বনি করেছে। বিভা তার জীবনের নিবিড়তম স্তব্ধতম মুহূর্ত্তটির কথা ভাবতে চাইলো। সে কবে? কোথায়? বিভা তা জানে না, তবু তখনো এই সমুদ্র সহানুভূতিতে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে-স্তব্ধতার পরিমাপ করে নি। কিসের তার এই গর্জ্জন? অজস্র জীবনোচ্ছ্বাসের!

জানলার পাশে বসে' বিভা প্রভাতে-সন্ধ্যায় দুপুরে-রাত্রে খালি সমুদ্র দেখে। যেন কোন বীরবল্লভ! নীল

বুজ লাল কালো সমুদ্র। রুক্ষ কর্কশ বন্ধুর নিষ্ঠুর সমুদ্র! তরঙ্গ, উদ্বেল! বালিতে ঝিনুক, জলে ফেনা। বসে' সে' বিভা তন্ময় হ'য়ে ঢেউ গোণে।

সেই যে ট্রেনে সে হেঁচেছিলো তাই থেকে তার আবার র হ'ল। পুরীতে ডাক্তার আর ডাকা হ'ল না। দু' দিন তেনা যেতেই হাঁপানি। সেদিন পেটের ব্যথাটাও একটু টের পলো বোধ হয়: মুখ ফুটে বিমলকে আর বল্‌ল না অবশ্যি। বিভা কাতর স্বরে বল্লে,—"আমাকে বুঝি স্নান করিয়ে নবে না একদিন? নিজে ত' দিব্যি দু' বেলা স্নান করছ।"

বিমল রুক্ষ হয়ে বল্লে,—"কেন করব না? আমার ফুদ তো আর আমসি হ'য়ে যায়নি?'

—"কিন্তু সমুদ্রে নামলে আমারো সব অসুখ ধুয়ে াবে দেখো।"

—"যেমন ট্রেনে চাপলেই তোমার সব ব্যাধি উড়ে াবে। লজ্জা করে না বলতে?"

—"দেখি না একদিন। আজকে ত' আর জ্বর নেই। বেশ ভালই ত' আছি।"

মুখ ভেঙচে বিমল বল্লে,—"বেশ ভালই ত' আছি। তারপর বলবে, বেশ ভালই ত' হাঁচি। পুরীতে আসবার ন্যে এত পেথম মেলেছিলে কেন? কলকাতায় মরতে থি মন ওঠে না? মাঝখান থেকে টাকার শ্রাদ্ধ। ালই কলকাতা ফিরে যাবো, বুঝলে?"

বিভার অভিমানের আর মুখ নেই; অনুনয় করে' লে,—"কিন্তু যাবার আগে আমাকে একদিন সমুদ্রে স্নান রিয়ে নিয়ো লক্ষ্মীটি। একটিবার।"

বিমল বল্লে,—"না।"

—"আমি তোমাকে লুকিয়ে রাত্রে চলে' যেতে পারি স্নান রতে, কিন্তু একা আমার সমুদ্রকে ভারি ভয় করে।"

পরে চিঠির কাগজ ছিঁড়ে সে সুধীরকে চিঠি লিখতে বসে: খালি সমুদ্র হ'লেই চলে না ঠাকুরপো, তুমি । কবে আসবে?

জান্‌লা দিয়ে বিভা সমস্তক্ষণ খালি সমুদ্র ও সমুদ্রতটের শ্য দেখে।

কিন্তু কালকের রাতে বিমলকে আর সে লুকুতে পারে । পেটের ব্যথায় তাকে চেঁচাতে হয়েছে।

আজই রাত্রে বিমল তাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

প্রাচীরের চাপে সমুদ্র এবার শুকাল! আর তরঙ্গ নয়, চাকা! বিভা চোখ বুজে কলকতার সেই এঁদো ক্ষুদ্র কুঠরিটার কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠ্‌লো।

বিমল অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে এসে জিগ্‌গেস করলে: "সমুদ্রে নাইতে যাবে?"

বিভা প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে চেয়ে রইলো। কাল যে তার প্রায় দু'য়ের কাছে জ্বর ছিলো, আর এখনো যে তা নর্ম্যাল হয় নি তা স্বামীর অজানা নেই। সে আমতা-আমতা করে' বল্লে,—"গায়ে বোধ হয় এখনো জ্বর আছে। নেব টেম্পারেচার?"

বিমল বল্লে,—"দরকার নেই। ওটুকু জ্বরে কিছু হবে না। কিছুতেই কিছু হয় না তোমার। সমুদ্রে নাইবার তোমার এত সাধ—এস। সনাতনকে সঙ্গে নাও।"

আনন্দে বিভা সহসা লাবণ্যময়ী হ'য়ে উঠ্‌লো। সমুদ্রের ঢেউ—প্রথম পুরুষ-স্পর্শের চাইতেও রোমাঞ্চময়! কোমরে কাপড় জড়িয়ে বিভা ছোট খুকির মত হাত-তালি দিয়ে উঠলো।

স্বামীর হাত ধরে' কাঁধে সামান্য একটু ভর দিয়ে বিভা বালিতে পা ডুবাতে ডুবাতে অগ্রসর হ'তে লাগলো। বহন করে' নিয়ে যেতে স্বামী কষ্ট পাচ্ছেন এ-কথা ভাবতে লজ্জার আর তার শেষ ছিলো না। সে হাঁপিয়ে পড়েছে দেখে বিমল তাকে এক সময় কোলে তুলে নিলো। বিভা বিমলের কাঁধের উপর মুখ লুকিয়ে ভাবছিলো—সমুদ্র ত' সে পেয়ে গেছে।

পেছনে সনাতন—কাপড়-চোপড় নিয়ে আসছে দু'জনের।

হাওয়ায় বিভাকে উড়িয়ে নেয়; পায়ের তলায় ঢেউ এসে তাকে আছাড় দিয়ে ফেলে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো; সে বিমলের একটা পা ধরে' ফেল্‌লো: "শিগগির তোল আমাকে।"

ঢেউটা পিছু হটতেই নিজেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। বল্‌ল,—"আর একটু হ'লে হয়েছিলো আর কি। তুমি আমাকে ধরে' থাক।"

স্বামীর হাত ধরে' ভয়ে-ভয়ে বিভা জলে নামতে থাকে। বিমল বলে,—"ভয় কি? আমিই ত' ধরে' আছি। ঢেউটা এলেই নীচু হ'য়ে ডুব দেবে—ওটা চলে' গেলেই আবার সাফ।"

বিভা বিমলকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' বলে,—মুলিয়াগুলোকে ডাক।"

—"দরকার নেই।"

—"আমার ভারি ভয় করছে। কাজ নেই সমুদ্রস্নান করে'। চল উঠে পড়ি।"

—"কিসের ভয়?" বলে' বিমল বিভাকে শক্ত করে' ধরে' আরো দূরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। প্রচণ্ড একটা ঢেউ আসে, বিভাকে নীচু হ'তে বলে—বিভা সব সময়েই মিল রাখতে পারে না, একটা অদৃশ্য হ'তে না হ'তেই আরেকটা এসে তাকে গ্রাস করে।

হঠাৎ সে হাত তুলে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো: "আমি গেলাম। শিগগির আমাকে বাঁচাও।"

সে-স্বর বিমল ছাড়া কেউই আর শুনতে পায় না। সে তাকে আরো দূরে জলের তলায় টেনে আনে।

ক্ষণতরে ঢেউয়ের মাঝে বিভার মুখ একবার ভেসে ওঠে—ভয়বিহ্বল বীভৎস কদর্য্য সে-মুখ। দুই চোখে অসহায় অনুনয়। স্বামীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে' সে আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লো: "আমার বুকটা কেমন করছে! কেমন যেন! পারি না আর। তুলে নিয়ে চল আমাকে।"

বিমল হয় তো এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করলো। বা হয়তো করলো না। বিভার দৃঢ় মুঠিটা অত্যন্ত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সে তাকে উন্মত্ত ঢেউয়ের মধ্যে আলগোছে ছেড়ে দিলো।

পারে সনাতন বসে' ছিলো। বিমলকে একা উঠ্‌তে দেখে সে আকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করলো: "বাবু, মা, মা কোথায়?"

বিমল উত্তর দেবার জন্য আর দাঁড়াল না।

বন্যা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

শুষ্ক পীত রুক্ষ ধরা—এত জল তার মাঝখানে
কোথা হ'তে আসে?
উচ্ছ্বাসে ফাঁপিয়া উঠে, ফেটে পড়ে গর্জ্জনের গানে,
ক্ষিপ্ত হ'য়ে হাসে।
ছুটে' আসে, ধেয়ে চলে, মেতে নাচে প্রলয়ের মতো
দুর্দ্দম দুরাশা,
গ্রাসে পূরি' আরো চায়—একি ক্ষুধা ক্ষিপ্ত অসংযত,
—কার এ পিপাসা!

ধরিত্রী কাঁপিছে ত্রাসে, উচ্চকিত দূর দিগ্বিদিক,
ছিন্ন ভিন্ন বেশ,
নিষ্পেষণে শত চূর্ণ, বক্ষে বিদ্ধ মৃত্যুর বিশিখ,
লুণ্ঠনে নিঃশেষ।
নিরন্ধ্র মেঘের মন্দ্রে আকাশের বক্ষতল ত্রাসি'
যে বজ্র গর্জ্জায়,
ছন্দে ছন্দে তালে তালে তারি ব্যথা উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
বর্ষণে—ঝঞ্ঝায়।

পতি বক্ষ হ'তে পত্নী নিমিষে কোথায় হ'লো লীন—
আর দেখা নাহি,
ক্ষীণ শিশু মাতৃহারা—চক্ষে তার ঘনায় দুর্দ্দিন,
মুখে মৃত্যু চাহি।
গৃহ-স্বামী গৃহ-শূন্য, পশুরো দাঁড়াতে নাহি স্থান,
জল—শুধু জল,
জলের সমাধি তলে ধরিত্রীর মজ্জমান প্রাণ
নির্ব্বাক—নিশ্চল!

একদিন জলময় এ বিশ্বের জন্ম-কেন্দ্র হ'তে
রূপে রসে ভরা
পাবনী কল্যাণী মূর্ত্তি—উঠে' এলো উচ্ছল আলোতে
সদ্য-স্নাতা ধরা,
বক্ষেতে করুণা ধারা, চক্ষে শুধু মূর্ত্ত দীপ্যমান
আনন্দ অশোক,
অনিন্দ্য মূর্ত্তিরে চাহি' স্বর্গে স্বর্গে জাগিল আহ্বান—
জয়—জয় হোক্!

ওষ্ঠ প্রান্তে সুধা ভরি', চুম্বি তারে দিল স্নিগ্ধ ক'রে
জ্যোৎস্না অনুপম,
দীপ্ত সূর্য্য নেমে এলো উর্ব্বরতা স্পর্শপুটে ভ'রে
শুভ্র বর সম।
বাতাস আনিল বহি' জীবনের ধারা অন্বেষিয়া
দিক দিগন্তর,
জগদ্ধাত্রী মাতারূপে ধরিত্রী উঠিল বিকশিয়া
সুস্মিত সুন্দর।
সেদিন কে ভেবেছিল আজিকার এদিনের কথা—
মৃত্যু-কলরোল,
অকস্মাৎ এ ধ্বংসের উচ্ছৃঙ্খল নিষ্ঠুর বারতা,
এ জল-কল্লোল?
কে ভেবেছে—যে বন্যার বক্ষ-স্তন্যে কন্যা বসুন্ধরা
চক্ষে প্রীতি আনে,
তারি উগ্র রুদ্র রোষ মৃত্যুর নির্ম্মম বিষে ভরা—
ক্ষমা নাহি জানে!
হে জননী জীব-ধাত্রী, অয়ি মাতা কন্যা-স্নেহাতুর,
একি মূর্ত্তি তোর?
কোথা সে বিদীর্ণ-মর্ম্ম আর্দ্র-শীর্ণ সংগুপ্ত ফল্গুর
গলদশ্রু লোর?
মৃত্যু-মন্ত্রে উচ্চকিয়া আবর্ত্তে স্ফারিত চূর্ণ করি'
উচ্চ ঊর্ম্মি রাশি,
প্রলয় তাণ্ডবে তোর এ কি রূপ উঠিছে শিহরি'—
অয়ি সর্ব্বনাশী!
এ সদ্য শোণিত-সিক্ত দানবী মূর্ত্তির আগে হায়
সভয়ে সন্ত্রাসে,
মর্ম্মের নিভৃতে আজ রক্ত জ'মে হিম হ'য়ে যায়,
স্পন্দ থেমে আসে!
মুখর মনের ভাষা অধরের দ্বারে কর হানে—
আড়ষ্ট অসাড়,
মাতার অক্ষয় দৃঢ় স্নেহ গর্ব্ব তারি মাঝখানে
এ কি ব্যভিচার!
শরতের বুকে আজ শারদ লক্ষ্মীর সিংহাসন
হয় নাই পাতা,
আকাশ উড়েনি তার অঞ্চলের নীলের কেতন—
নক্ষত্রের খাতা।

চরণে ফোটেনি পদ্ম, মুগ্ধ করি' বুকের নিঃশ্বাসে
ঝরেনি শেফালি,
চন্দ্রের চকিত হাস্য জ্বালে নাই আকাশে বাতাসে
আনন্দ দীপালী।
নাই—নাই—কিছু নাই—উৎসব আনন্দ নাই ঘরে,
নাহি হাস্য রোল,
সমস্ত ছাপায়ে আজ বক্ষে বক্ষে ওঠে আর পড়ে
মৃত্যুর কল্লোল।
দুর্গন্ধে দূষিত বাষ্পে বাতাসের কণ্ঠ ভরি' বাজে
ধ্বংসের রাগিণী,
লক্ষ্মীর আসনে আজ এ রাক্ষসী কে যে বসিয়াছে—
কেহ নাহি চিনি!
যা কভু দিবার নহে হে নির্দ্দয় নিজ হাতে তুলে'
দিয়েছ তাহাই,
লক্ষ আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে বাতাসে উঠেছে অশ্রু দুলে'—
অশ্রু তব নাই।
তুমি চেয়ে আছ স্থির অটল অমোঘ অনুপম,
রুদ্র রূপ রাশি,
এক তিল বাড়ে নাই—ওষ্ঠ প্রান্তে হয় নাই কম
এক বিন্দু হাসি।
তোমারি হয়েছে জয়—জয়ী হ'লো তোমারি শাসন
হে রুদ্র দেবতা,
মিথ্যার স্বার্থের সৃষ্টি চূর্ণ করি' আজি চাহে রণ
ধ্বংসের ব্যর্থতা।
ধরণীরে বেঁধেছিল স্পর্দ্ধাভরে শত লক্ষ পাকে
শক্তি মদোদ্ধত,
তোমার ফুৎকারে তাহা উড়ে' গেছে মত্ত ঝঞ্ঝা আগে
শুষ্ক পত্র মতো।
হে ভৈরব, হে ভীষণ, রক্ষা করো—রক্ষা করো আজ,
ক্ষান্ত করো রোষ,
যা নিয়েছ সেই ঢের—তার বেশী আর নাই কাজ,
হোক্ পরিতোষ!
তোমারি হয়েছে জয়, দুন্দুভি সে উঠেছে উচ্ছ্বাসি',
আর কেন তবে?
এবার সম্বর নিজে হে উদ্দাম, হে উগ্র সন্ন্যাসী,
শান্তি হোক্ ভবে।

TIGHT BINDING.

বর্ম্মা-যাত্রা

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী বি-এ

লাহোরের একজন মুসলমান গণৎকার একটি বাঙ্গালী মেয়ের হাত দেখে বলছিলেন—"এর সমুদ্রযাত্রা অবশ্যম্ভাবী।" সকলে হেসে অস্থির! যা শতকরায় দেড়শখানা অসম্ভব, এমন একটা বাজে গণনা করলে কে

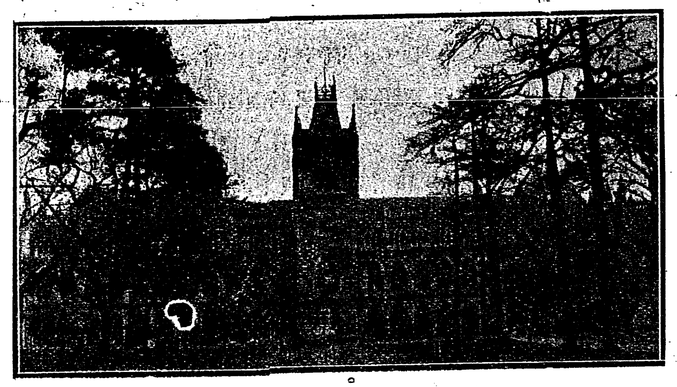

হাইকোর্ট

না হাসবে? কিন্তু দেখতে দেখতে গণনা ফলে উঠল। হয় ত বা গণৎকারের কথাতেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে মেয়েটি বি-এ পাশ করবামাত্র তার পিতা গবর্ণমেণ্টের বৃত্তির

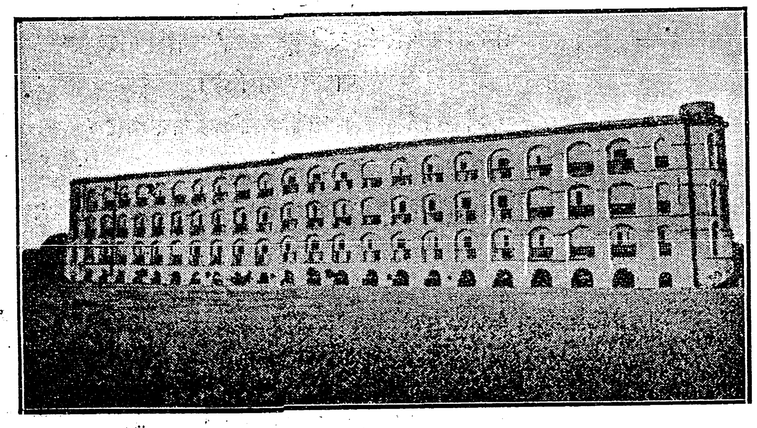

ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের ডাল্‌হাউসি ব্যারাক্

জন্যে তাকে আবেদন করতে বললেন। এই যে তীরটি ছোঁড়া হল তাতে লক্ষ্য বিদ্ধির কোনই আশা ছিল না কিন্তু। কারণ, গুটিকত খাস পাঞ্জাবী এম-এ ও ডবল এম-এ মেয়েরাও আবেদন করেছেন এ কথা জানা ছিল তাদের দাবীর কাছে এ মেয়েটির দাবী টিঁকতেই পারে না তত্রাচ ভবিতব্য অঘটন ঘটালে,—পঞ্জাবী এম-এ মেয়েদে দাবী খণ্ডন করিয়ে, পঞ্জাব প্রবাসিনী বাঙ্গালী বি-এ মেয়েটির দাবী মঞ্জুর করালে। দৈবচালিত পঞ্জাব-সরকার একেই বৃত্তিধারিণী করে বিলেত পাঠালেন।

সেই পর্য্যন্ত সেই মুসলমান গণৎকারের গণনায় সকলের অগাধ বিশ্বাস। তাঁর খোঁজে সবাই ব্যস্ত। একদিন পূর্ব্বোক্ত বালিকার পিতৃগৃহে তিনি আবার অকস্মাৎ উপস্থিত হলেন। বাড়ীশুদ্ধ সকলে তাঁকে হাত দেখাতে ছুটল। আবালবৃদ্ধবণিতা অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে একটি প্রশ্ন জুড়ে দিলে—"আমার হাতে সমুদ্র যাত্রা আছে?"

সেদিন আমি তাঁদের বাড়ীতে অতিথি। আমারও হাত দেখা হল। গণৎকার সাহেব হাতের ভিতর তন্ন তন্ন করে সমুদ্রযাত্রা খুঁজে কোথাও তার দিশে পেলেন না। আমি তবু আশা ছাড়লুম না। "হয় ত কোথাও লুকিয়ে আছে, আর একটু নিরীক্ষণ করে দেখুন খুঁজে পাবেন"—এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সাহেব নরম হয়ে বল্লেন "There are some chances of sea-voyage in 1928."

আশ্বস্ত হলুম। একেবারে আশা তীত নয়। তখন ১৯২৭এর এপ্রিল মাস মাত্র। ১৯২৮এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দৈব সম্ভাবনা পেকে উঠবার সুদীর্ঘ অবসর রয়েছে।

দৈব আর পুরুষকারের মাঝে ভেদের গণ্ডিটা কোথায় টানা যেতে পারে? আমার পক্ষে সমুদ্রযাত্রা করা নি

করা নিতান্তই আমার স্বেচ্ছাধীন। অথচ দৈবের দিক দিয়ে কথাটা শুনে নিতে চাই। অনেক ইচ্ছা নিজের ভিতর থেকে প্রেরণা পায় না হয় ত, বাইরের প্রেরণার উপর ফলবতী ও ফলবতী হবার অপেক্ষা রাখে। দেশ-ভ্রমণেচ্ছা, সুদূর প্রয়ানের ইচ্ছা অনেকেরই মনে মনে থাকে,

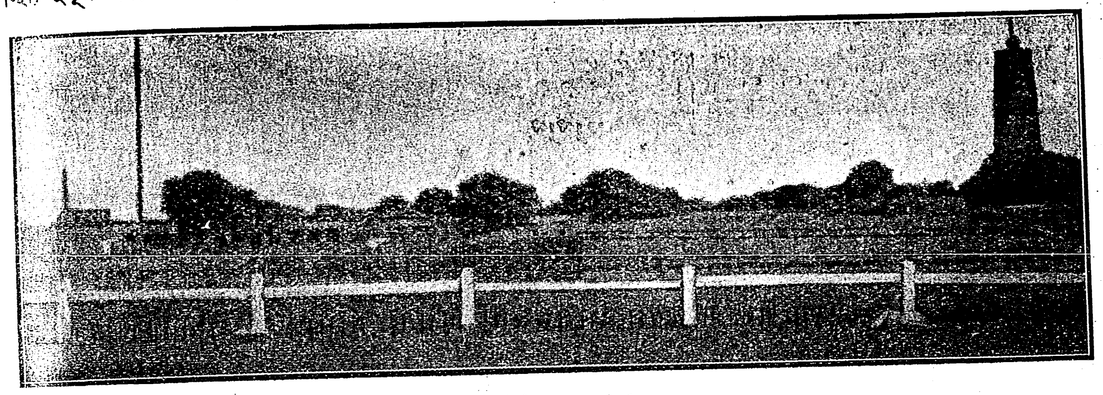

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ

কিন্তু কাজে হয়ে উঠে না। অর্থবল হলেও উদ্যমের বল যোটে না। সেইখানে দৈবের সাহায্য চাই। আমি তার প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। কিন্তু ১৯২৮এর শেষ মাসের শেষ দিনেরও অবসান হল—আমার সমুদ্রযাত্রা দেখা দিল না। সম্ভাবনামাত্র ছিল, নিশ্চিত ত ছিল না; সুতরাং গণৎকারের গণনা মিথ্যা হল এ কথা বলতে পারলুম না। বরঞ্চ সেই পর্য্যন্ত একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল—এ জীবনে আর সমুদ্রযাত্রা নেই, কেন না, দৈবজ্ঞের গণনানুসারে তার সম্ভাবনার শেষ দিন পর্য্যন্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

যখন এই বছরের এপ্রিলের শেষে বর্ম্মা প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্স থেকে নিমন্ত্রণ ও তাগিদের পর তাগিদ এল এবং তাঁদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে বর্ম্মা যাওয়া স্থির করলুম, তখনও সে বিশ্বাসে কোন ঘা পড়ল না। এ আর সমুদ্রযাত্রা কি? এ ত ভারতের ওপারে যাওয়া মাত্র, বৃহত্তর ভারতেরই আর এক কোণে।

সভানেত্রীর অভিভাষণ রচনার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম। চারশ পৃষ্ঠা বর্ম্মার ইতিহাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলুম। যাত্রাটা মনের পিছনে পড়ে গেল, যাত্রার লক্ষ্যটাই সামনে এসে দাঁড়াল। সময়োপযোগী জাহাজে ক্যাবিন রিজার্ভ করিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলুম মাত্র।

১৮ই মে আচম্বিতে নিম্নলিখিত নোটিশটি হস্তগত হতে আমার বিশ্বাসটা একটু নাড়া খেলে, এত দিন পরে একটা পাকা রকমের ধারণা মনে ঢুকল—এবার জলপথের যাত্রা বটে, স্থলপথের নয়। তবু দৈবজ্ঞের গণনাকে অবহেলা করে একে সমুদ্রযাত্রা বলতে এখনও মন সরল না—সমুদ্র-জলের ছিটেফোঁটা মাত্র লাগবে বৈ ত নয়!

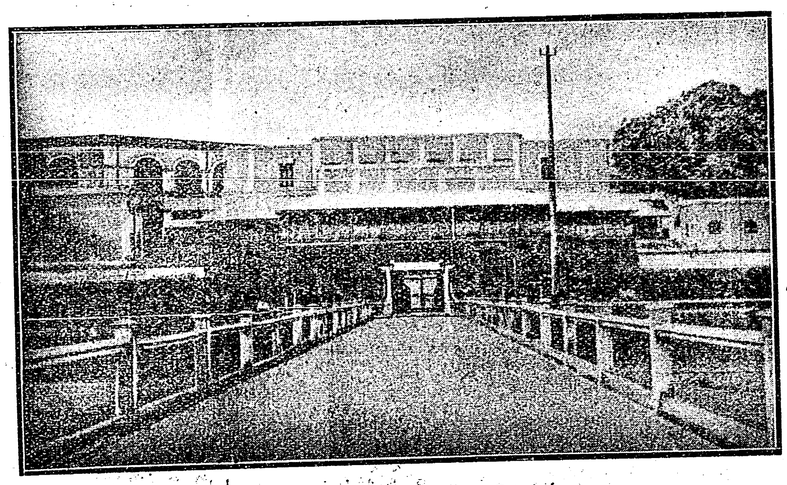

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—পলাশি গেট্

নোটিসটি এবম্বিধ ঃ—

Friends are not allowed on board" এই ভীতিজনক লাইনটিতে আমি দুর্ম্মনা হবার পূর্ব্বেই আমার উপযুক্ত পুত্রটি পকেট থেকে দুখানি পাস বের করে

দেখালেন তিনি আগেই ষ্টীমার কোম্পানীর কাছ থেকে এই দুটি যোগাড় করে রেখেছেন, জাহাজের উপর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যেতে পারবেন, আমার কোন অসুবিধে হবে না।

১৯শে মে বেলা ৭৷৷০টার সময় আউট্‌রাম ঘাটে উপস্থিত হলুম। সেখানে হিন্দুমিশনের স্বামী সত্যানন্দ সশিষ্যবর্গে অপেক্ষা করছেন। আমার পুত্র শ্রীমান দীপক ঘাটের ক্লার্ক, চৌকিদার, ডাক্তার ও কুলির হাত থেকে

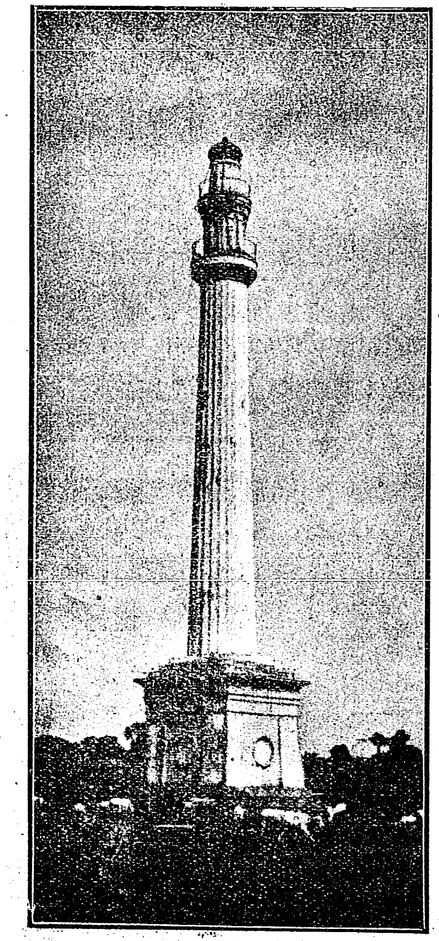

অক্টারলনি মনুমেণ্ট্

আমায় একে একে সসম্ভ্রমে উত্তীর্ণ করিয়ে জাহাজের ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়িয়ে দিলে। তার সংগৃহীত দ্বিতীয় পাসখানা স্বামিজীর এক শিষ্যের কাজে লাগল। ডাঙ্গার সঙ্গে জাহাজের সিঁড়ির যোগ ছিন্ন হবার আগেই মায়ের সব গোছগাছ করে দিয়ে, মাকে প্রণাম করে এবং মায়ের শিরোঘ্রাণ নিয়ে পুত্রপ্রবর ফিরে গেল। সে অদৃশ্য হওয়ামাত্র মনে পড়ল তাকে ত বলে দেওয়া হয়নি রেঙ্গুনে

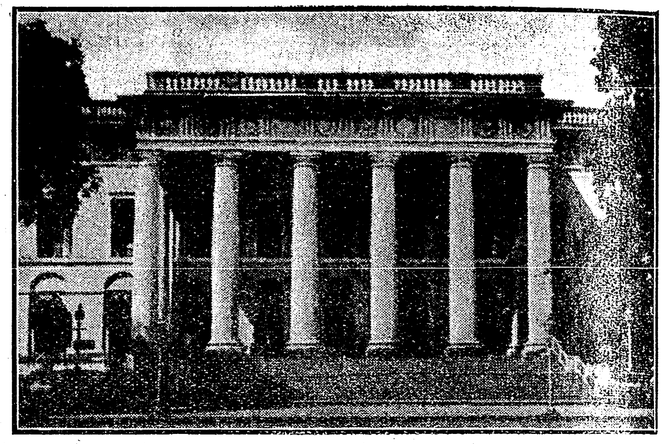

টাউন হল

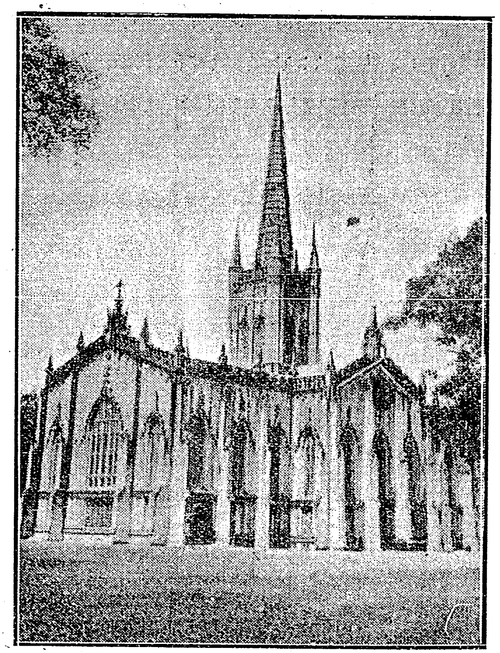

সেণ্ট্ পল্ ক্যাথিড্রাল

তারযোগে খবর পাঠাতে হবে যে, আমি আজ রওয়ানা হয়েছি। স্বামী সত্যানন্দ আশ্বাস দিলেন জাহাজ থেকে বেতারে খবর পাঠান চলবে, তাতে খরচ মাত্র পাঁচগুণ বেশী।

ইতিমধ্যে একটি গুজরাটী যাত্রী আত্মপরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ রুজু করেছিলেন। খানিক পরে দেখা গেল তিনি ও একজন মুসলমান বণিক জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ঘাটের প্লাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান নিজেদের লোকজনদের সঙ্গে কথা কইছেন। একটা টাকায়

জড়িয়ে একখানা কাগজের টুকরো নীচে ফেলে দিয়ে তাদের থেকে কতকগুলি থার্ডক্লাসের প্যাসেঞ্জার বঙ্গীয় বলছেন শোনা গেল—"এখনি তার-ঘরে গিয়ে এই তারটা যুবক আর দুটি সেকেণ্ডক্লাসের ফিরিঙ্গি মেয়ে—খাঁটি দিও।" আমার তার দেবারও এই সুযোগ দেখে সাহেবসুবোরা নয়। হয় ত ব্রহ্মাযাত্রী অ্যাংলো সাহেব-

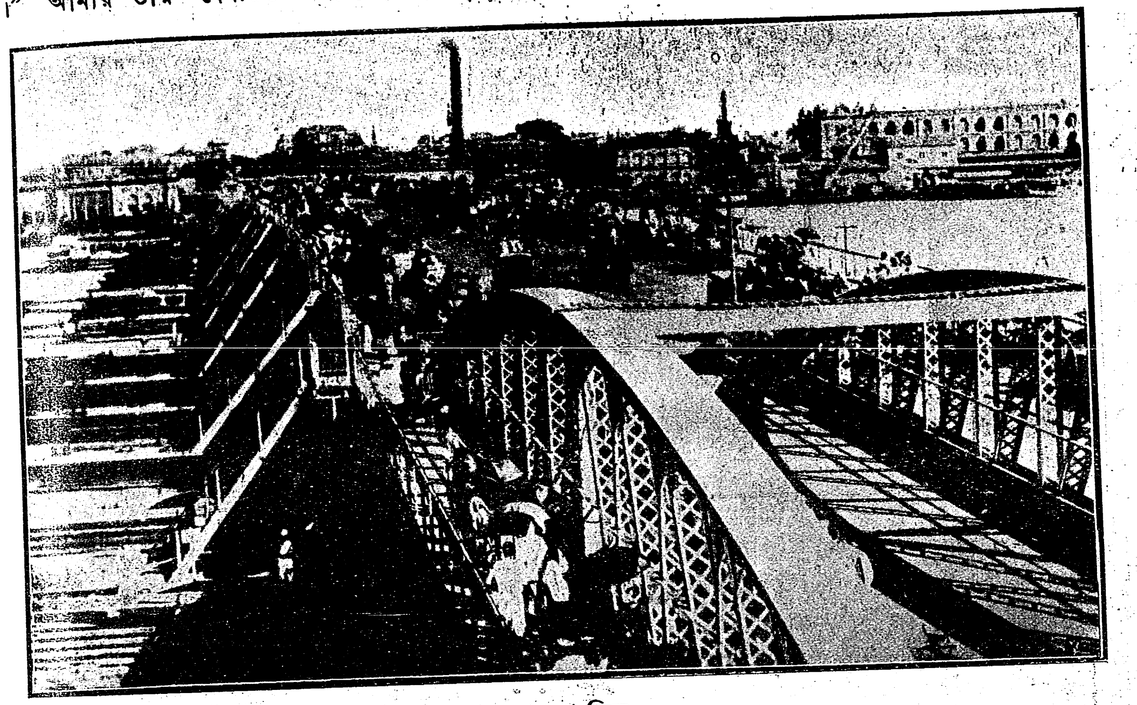

হাওড়া ব্রিজ

ক্ষিপ্রগতিতে তাঁদের পাশে গিয়ে স্বামী সত্যানন্দ তাঁদের লোকের মারফৎ আমার হয়েও একটী তার পাঠাবার সুব্যবস্থা করলেন।

অল্পক্ষণ পরেই জাহাজ ছাড়ল। শিকল খোলার ঝনঝনার সঙ্গে কলকাতা সশব্দে ধীরে ধীরে দৃষ্টির অন্তর্হিত হতে লাগল। অদূরে হাওড়া ব্রিজ অস্পষ্টতর হল। হাইকোর্টের চূড়া, নতুন কৌন্সিল হাউস, বেতারের খুঁটি, কেল্লা সব একে একে দিক্‌চক্রের নীচে ডুবে এল। জাহাজ থেকে তীরবর্ত্তী আত্মীয়বন্ধুদের উদ্দেশ করে যাত্রীদের রুমাল ঘোরান অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকল। রুমাল ঘোরাচ্ছিলেন সেকেণ্ডক্লাসের ডেক

জেনারেল পোষ্ট আফিস

দের কলকাতায় আপনার বলতে কেউ ছিল না—আর এই নব্য বঙ্গসন্তানেরা বোধ হয় কোথাও শুনে

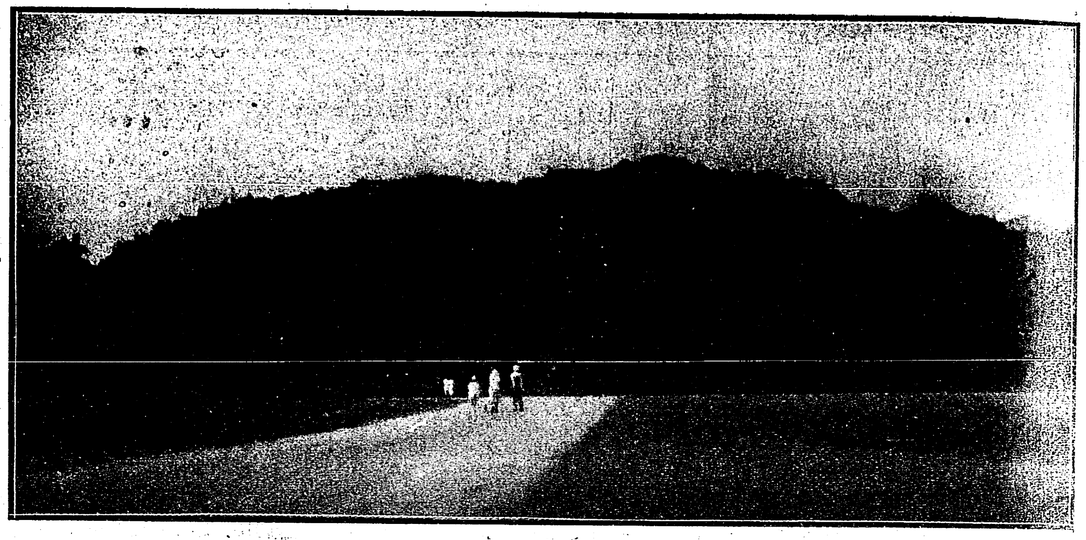

থাকবেন জাহাজ থেকে রুমাল ঘোরানটা পুরোদস্তুর যাত্রী-কায়দা; তাই অবিশ্রাম বিঘূর্ণন চলতে থাকল। কলকাতার উপকূলের যখন বিন্দুবিসর্গও আর দৃষ্টিগোচর রইল না, তখনই তাঁরা ক্ষান্ত দিয়ে নেপথ্যে অন্তর্দ্ধান হলেন। এবার ডেকের উপর আবির্ভূত হলেন তাঁদের বাড়ীর মেয়েরা। মেয়েগুলি খাঁচা থেকে ছাড়া-পাওয়া পাখীর মত ঘুর ঘুর করতে লাগল। একবার ফার্ষ্টক্লাসের ডেকে, একবার সেকেণ্ডক্লাসের ডেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে, কখনো রেলিং ধরে গঙ্গার উপর ঝুঁকছে, কখনো কখনো এখান ওখান থেকে ডেক-চেয়ার টেনে এনে এক জায়গায় জড় করে জটল্লা করে বসে গল্প করছে। বয়স কারো ষোল সতের বছরের বেশী নয়; আলতামাখা খালি পা, সিঁথেয়

বোট্যানিক্যাল্ গার্ডেন

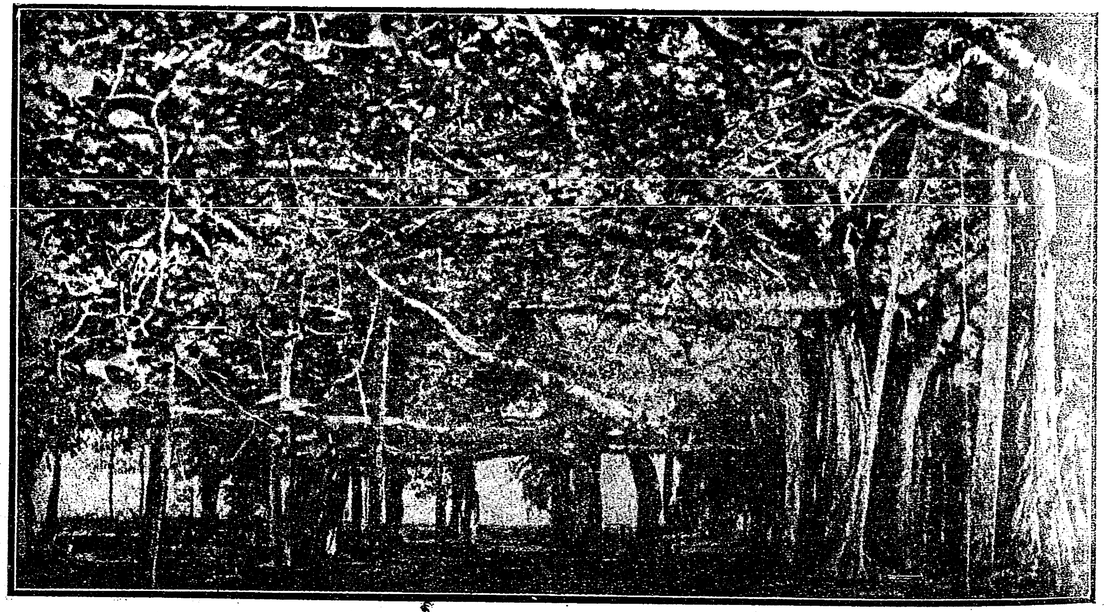

বিশাল বটগাছ—বোটানিক্যাল গার্ডেন

ধ্যাবড়া করে সিন্দুর মাখা। যদিও একালের ফ্যাশনে ফেরতা দিয়ে শাড়ী পরবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু তেমন পারিপাট্য ফুটাতে পারেনি—দেখলেই মনে হয় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। পরে তাদের সঙ্গে কথা কয়ে জানলুম তারা পাড়াগাঁয়ের নয়, কলকাতারই মেয়ে বটে, কিন্তু এমন শ্রেণীর, যাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা বা অপর শ্রেণীর দশজনের সঙ্গে মেলা-মেশার প্রথাটা এখনও প্রচলিত নেই। বেচারীদের তাই আজ এত নিঃসঙ্কোচ স্ফূর্ত্তি। কেউ বাধাও দিচ্ছে না। তাদের অভিভাবকেরা, যে রুমাল ঘোরান শেষ করে কোথায় অন্তর্হিত হল; সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আর কেউ তাদের টিকি দেখতে পেলে না। অবশেষে এই মেয়েগুলির অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলে জাহাজের আধবুড়ো সারিঙ। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে তাদের দৌরাত্ম্যি সহ্য করে করে, একবারটি এসে বল্লে—"মারা, আপনারা এখানটায় বসবেন না, এটা ফাষ্টো ক্লাস, সাহেবেরা রাগ করবেন।" মেয়েগুলি তখনকার মত উঠে গেল। আবার খানিক বাদে এসে সোখালিজম ভাবগ্রস্ত একটি মেয়ে বললে—"এতগুলো চেয়ার পড়ে রয়েছে, বসতে দেবে না? চল্ না ভাই এ দিকে টেনে এনে বসি।" আর একটি অপেক্ষাকৃত সুবুদ্ধি বা ভীরু মেয়ে বললে—"না ভাই, বকবে।"

এই জাহাজে চাটগাঁয়ী সারিঙ ছাড়া তাদের সীমা ও মর্য্যাদা রক্ষা শিক্ষা দেবার জন্য আর কেউই ছিল না। বাড়ীর লোকেদের পাত্তাই নেই। বাস্তবিকই ফাষ্টক্লাসে অনেকগুলি খালি ডেক-চেয়ার পড়ে ছিল—তার কারণ এই যে আজ ফাষ্টক্লাসের অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী, আমাকে নিয়ে মোটে আটটি মাত্র। একে ত এই জাহাজখানা মেলজাহাজ নয়, তার উপর বঙ্গোপসাগরে ঝড় বাদল আরম্ভ হয়েছে, বর্ষা নেমেছে, পারৎপক্ষে কেউ এই সময় যেতে চায় না।

সহযাত্রী একক ইংরেজেরা জাহাজের ওধারে বসে গল্পের বই পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছিল। একটিমাত্র দম্পতী পরস্পর কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল। পতিটিকে কিছুতেই য়ুরোপীয় মনে হল না, গৌরাঙ্গ বটে,—পূরো সাহেবী পোষাক, হাব ভাব, উঠা-বসাও বটে। কিন্তু তবু মুখে এমন একটা কি দুর্ব্বলতা মাখান ছিল, যাতে স্বাধীনচেতা লোক বলে মনে হয় না। পরে জানতে পারলুম সে ইহুদি—রেঙ্গুনে তার অতি নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে তার মেমবধূ পরিগ্রহের ইতিবৃত্তও জানতে পেরেছিলুম। জাহাজে দম্পতীর আচরণ একেবারে আদর্শ সদ্য বিবাহিত নূতন প্রেমিক-প্রেমিকার মত। সর্ব্বদাই দুজনে নিরালায় বসে আছে। দুপুর বেলা 'লাউঞ্জে' (আরাম গৃহে) মেমবধূ একখানি কৌচে নিদ্রিতা, মাথার কাছে চৌকি টেনে বসে বর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তাঁর রক্ষকতা করছেন। তাঁদের আশে পাশে অন্য কৌচে বা চেয়ারে অন্য যাত্রীরা স্ব স্ব পাঠে ব্যাপৃত। বউ যদি ডেকে না উঠেন, বরেরও দেখা পাওয়া যায় না। সমুদ্রে ঢেউ খেলা আরম্ভ হতে প্রথম প্রদোষ থেকেই তাঁরা উভয়ে যে অন্তর্দ্ধান করলেন, রেঙ্গুনে পৌঁছিবার আগে আর কারো তাঁদের দর্শনলাভ হয়নি।

জাহাজের মুখ ঘুরে গিয়েছিল—কলকাতা কোন্ দিকটায়, শিবপুর কোন্ দিকটায়, দিক্‌ভ্রম হচ্ছিল। একজন খালাসীকে জিজ্ঞেস করলুম—"বোটানিকেল গার্ডেন ছেড়ে গেছি কি?"

সে বল্লে—"এই যে, এখনি তার ধার দিয়ে যাচ্ছি, ও-পাশটায় দেখতে পাবেন।"

ওপাশে গিয়ে তার ঘাটের সিঁড়ি দেখতে পেলুম, দু একটা বাড়ীও দৃষ্টিগোচর হল, কিন্তু তার তাল-বীথিকা, মহাবট প্রভৃতির দৃশ্য স্মৃতির দূরবীণে কল্পনার চোখেই শুধু দেখা দিলে।

আমাকে ছেড়ে বাকী সাতজন যাত্রীর মধ্যে দুটি ফিরিঙ্গি রমণী—মা ও মেয়ে, এবং একটি পূর্ব্বোল্লিখিত গুজরাটী হিন্দু। ৯টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়ল। গুজরাটীটি জাহাজের খানা খান না। আমার জন্যে নিরামিষ আহারের হুকুম দেওয়া হয়েছিল। ভোজনগৃহে চারখানা টেবিল সাজান ছিল—তিনখানা যাত্রীদের জন্যে—একখানা জাহাজের অফিসারদের জন্যে। আমি মধ্য টেবিলে না গিয়ে পাশের একখানা টেবিলে বসলুম। ফিরিঙ্গি মহিলা দুটি আমার অনুমতি নিয়ে আমার টেবিলে এসে বসলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের কিছু পূর্ব্বে জাহাজের গোয়ানীজ বাটলার এসে আমায় বল্লে—যাত্রী কম, দুখানা টেবিল উঠিয়ে দেওয়া হবে, একখানাতেই সব যাত্রীদের জায়গা

পাতা হবে,—আমার তাতে আপত্তি আছে কি? আমি বল্লুম—"আমি যখন নিরামিষাশী, অন্তদের খাওয়ার সঙ্গে আমার সংস্রব নেই, আমার টেবিলটা আলাদা থাকলেই ভাল।"

বেলা একটার সময় মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা পড়ল। ভোজন-গৃহে গিয়ে দেখি আমার জন্মে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট টেবিল লাগান হয়েছে; আর ফিরিঙ্গি মেয়েদের জায়গা হয়েছে সর্ব্ব-সাধারণ টেবিলে। সে মহিলা দুটি—একজন বৃদ্ধা, একজন তরুণী—ছলছল চোখে আমায় বল্লেন—"আমাদের আপনার সঙ্গে বসতে দেবেন না? We hate to sit at the other table."

আমি বল্লুম—"স্বচ্ছন্দে আসুন।"

কিন্তু খানসামারা নারাজ, দু টেবিলে আমিষ পরিবেশন করতে হলে তাদের কাজ বেড়ে যায়।

ফিরিঙ্গি মহিলাদ্বয় উচ্চপদস্থ সাহেবদের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নয় বোধ হল। তাই তাঁরা স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ সাধ্যাতীত ব্যয় করে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট নিলেও, এখানে তাঁদের অনধিকার প্রবেশ এই রকম একটা ভীত কুণ্ঠিতভাবে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন,—চাকরদের হুকুম করবার সাহসও তাঁদের নেই। রেঙ্গুনে বাড়ী বাড়ী পিয়ানো শিখিয়ে তাঁরা জীবিকা অর্জ্জন করেন। মেয়েটির আঁখি-কোণে বর্ম্মীরক্তের মিশ্রণ পরিস্ফুট। তাঁদের কিন্তু এক বেলার বেশী আর সাধারণ টেবিলে বসার যন্ত্রণা সহ্য করতে হল না। মধ্যাহ্নভোজনের পর যে বিশ্রাম করতে ক্যাবিনে নামলেন, তিন দিন ধরে যাত্রা শেষ পর্য্যন্ত আর উঠলেন না।

অপরাহ্নে জাহাজের কাপ্তেন আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁর রীতিই দেখলুম সব যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখা। নিজের ঘরকন্নার অনেক কথা শুনালেন। তাঁর স্ত্রী দাসী-চাকরদের মোটে শাসনে রাখতে পারেন না। শাসনকার্য্যে কাপ্তেন সাহেবের সাহায্যের অনবরত প্রয়োজন পড়ে। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া-প্রীতি কোন কাজের নয়, তাতে তারা ঘরকন্নায় অপটু হয়ে পড়ে। তাঁর স্ত্রী তার একটি নিদর্শন। কাপ্তেন সাহেব জাহাজে চলে এসেছেন; যদি এই ক'দিনের মধ্যে রাঁধুনি ছেড়ে যায়, তবে বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না, ছেলেপিলেরা অভুক্ত থাকবে; কেন না, তাঁর স্ত্রী রন্ধনে অপটু, এবং একটা চাকরের জায়গায় আর একটা চাকর যোগাড় করে বহাল করতেও অক্ষম। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ অভিমতটা মনুপ্রমুখ পুরুষপুঙ্গব মাত্রেরই মত,—সব অবস্থাতেই তাদের পদ্মবশে রাখা সমীচীন মনে করেন।

সমুদ্র বিষয়ক নানা গল্পগুজবও করলেন। নাবিকদের সম্বন্ধে সু-প্রসিদ্ধ নানারকম কুসংস্কারে তিনিও ভরা দেখলুম। গল্প করলেন, তিনি অনেকবার সমুদ্রে মৎস্যকন্যা (mermaid) দেখেছেন। আমি অবিশ্বাস প্রকাশ করলে বললেন, তারা অলৌকিক বস্তু নয়, প্রকৃতপক্ষে একপ্রকারের জলজীব—কোমরের উপর পর্য্যন্ত নারীর আকৃতি, কোমরের নীচে থেকে মৎস্যতুল্য, অনেক সময় তারা ডাঙ্গার উপর রোদ পোহাতে উঠে। 'লাউঞ্জ' গৃহে বৈকালিক চা পান করতে করতে তাঁর সঙ্গে গল্পে গল্পে কেটে গেল। তখন এত প্রচণ্ড গরম যে বাইরে ডেকের উপর বসবার যো নেই।

এর পর আলাপ হল জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে। আমি জাহাজে চড়ে অবধি এঁর খোঁজ করেছিলুম—শুনেছিলুম না কি বাঙ্গালী। কিন্তু কোথায় যে তিনি, কেউ বলতে পারে নি তখন।

লোরেটো কন্‌ভেণ্টে শ্বেতাঙ্গিনী য়ুরোপীয় নান্‌দের মধ্যে একটি শ্যামাঙ্গিনী বাঙ্গালী 'নান্‌' ছিলেন। সব শাদার মধ্যে হঠাৎ এই একটু শ্যাম কেমন কেমন লাগ্‌ত। জাহাজের অফিসরী বেশভূষা ও নাবিকী টুপি পরিহিত সাদা মুখেদের মধ্যে একটি শ্যামমুখ অফিসর যে মধ্যে মধ্যে চোখে পড়তেন তাতেও কেমন কেমন ঠেকত—মনে হত, বুঝি তাঁদের একটি পোষ্যপুত্র। দেখতে খুব ছেলে মানুষ, ভাল মানুষ, আর প্রায় সর্ব্বক্ষণ কাসিতে পিঠটা একটু নোয়ান। জানতে পারলুম ইনিই জাহাজের ডাক্তার, একজন উচ্চপদের অফিসার। ক্রমে এঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে শুনলুম, তাঁর পদ নিয়মানুযায়ী উচ্চ হলেও, বাঙ্গালী বলে, তাঁকে পদানুযায়ী সম্মান ও অধিকার সব স্থলে দেওয়া হয় না। ভোজনগৃহে অফিসারদের যে আলাদা টেবিলের কথা বলেছি, সান্ধ্য ভোজের সময় তাঁর সেখানে গিয়ে খাবার অধিকার নেই—ছোট অফিসারের মত তাঁর ডিনারটা ক্যাবিনেই খেতে হয়। সেই জন্যে আত্মসম্মানরক্ষার্থ অন্যান্য সময়ও টেবিলে গিয়ে খান না, ক্যাবিনেই খান। এইরকম আরও কতকগুলি বিষয়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতরবিশেষ করা হয়।

শরীর অসুস্থ হওয়ায় সমুদ্রের হাওয়া তাঁর পক্ষে উপকারী বলে তিনি ক্যাম্বেল থেকে বেরিয়েই এই চাকরী নিয়েছেন। এই পথে অনেকবার ফেরাফেরি করেছেন। কিছু টাকা জমিয়েছেন। আর এক মাস পরে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে বিলেত যাবেন। অতি অমায়িক, অতি শান্তশিষ্ট লোকটি। তাঁর এই কাসি নিয়ে বিলেত যাওয়াটা কতদূর সঙ্গত হবে বুঝলুম না। কিন্তু তাঁর প্রাণের আকিঞ্চন বিলাতের ডিগ্রি পাওয়া। তাঁর মা নেই, আর তিনি অবিবাহিত, সুতরাং তাঁর জন্যে ভয় পাবার কেউ নেই, তাঁকে নিরস্ত করবারও কেউ নেই।

একটি গুজরাটী যাত্রীর কথা পূর্ব্বেই বলেছি। রেঙ্গুনে তাঁর অডিটরের ফার্ম্ম আছে। সিমলার অডিটর্স কনফারেন্সে বর্ম্মা হইতে মনোনীত সরকারী প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন। আমায় বহুদিন পূর্ব্বে বম্বের শান্তা ক্রুজ সহরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কোন মিটিংয়ে দেখেছিলেন বল্লেন। তিনি বিটলভাই বল্লভভাই প্যাটেলদের স্বজাতি। বর্ম্মাপ্রবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁর কাছে অনেক খবর পেলুম। বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বল্লেন, ব্যবসাদার বাঙ্গালী সেখানে অতি অল্প,—অধিকাংশই সরকারী চাকুরে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঐক্যের বা প্রেমের বন্ধন নেই। পাছে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, তাই কেউ কারো জন্যে কিছু করতে ভয় পান। অল্পদিন হল রিট্রেঞ্চমেণ্ট কমিটির শস্ত্রাঘাতে অনেক বাঙ্গালী ক্লার্ক কর্ম্মচ্যুত হলেন—অথচ তাঁদের স্থলে বহু ফিরিঙ্গিকে ভর্ত্তি করা হল। বর্ম্মার সমগ্র বাঙ্গালীরা মিলে এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই করলেন না, কোন মিটিং ডাকলেন না; ভয়, পাছে যাঁরা চাকরীতে বহাল আছেন তাঁদেরও চাকরী যায়। তিনি আপশোষ করে বল্লেন—এমন কর্ম্মদক্ষ অথচ এমন ভীরু সম্প্রদায় আর একটিও নেই বর্ম্মাতে।

তাঁর মুসলমান বণিক বন্ধুটি বর্ম্মার প্রাদেশিক হিন্দুকনফারেন্সের মনোনীত সভানেত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুর কাছে যেমনি শুনলেন আমার অগ্রজ তাঁদের সহরের ভূতকালীন কমিশনর ঘোষাল সাহেব, অমনি আমার কাছে এসে সেলাম করে তাঁর উল্লেখ করে অনেক আপ্যায়নজনক কথা বললেন।

এই ভাবে গল্পে সল্পে আলাপ পরিচয়ে বেলাটা কেটে গেল। চারটের সময় সুন্দরবনের সামনে জাহাজ নোঙ্গর করলে,—জল অল্প, জোয়ার না এলে জাহাজ এগোতে পারবে না। সন্ধ্যে ৭টায় জোয়ার আসতে জাহাজ ছাড়ল, ঝড়ও উঠ্‌ল, জাহাজও দুলতে আরম্ভ হল।

৭॥০টায় সান্ধ্য ভোজের পর সেকেণ্ড ক্লাস থেকে কলকাতা যূনিভার্সিটিতে পড়া দুই একটি বর্ম্মা ছাত্রকে স্বামী সত্যানন্দ আমার কাছে নিয়ে এলেন। তাদেরই দেশে যাচ্ছি,—তাদের বর্ত্তমান মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে যত কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান নিয়ে যেতে পারি সেই ভাল। তাদের মধ্যে একটি ছেলে বি-এ পাস, ধর্ম্মের দিকে খুব ঝোঁক। ধর্ম্মালোচনা করতে করতে মিশনরিদের হাতে পড়ে। ষ্ট্যানলি জোন্স তাকে কাবু করে দিলেন। সে তাঁরই দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু এখন ক্রীশ্চানিটিও তাকে তৃপ্তি দিতে পারছে না—সে তার ভিতরে ঢুকে দেখছে বৌদ্ধধর্ম্মের যে শিক্ষা আজীবন তার শিরায় শিরায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নিবদ্ধ হয়েছে, শিক্ষা-হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম্মে তার চেয়ে বেশী কিছু নেই। আর ফিলজফির দিক দিয়ে খ্রীষ্টানদের অনেক কথা এখন তার ধাঁধাজনক বোধ হচ্ছে। সে খ্রীষ্টান হওয়ার দরুণ বাপের ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে। খ্রীষ্টান হবার পর সে বিয়ে করেছে। তার স্ত্রী কিন্তু বৌদ্ধ, ছেলেপিলেরা বৌদ্ধ, সে একাই খ্রীষ্টান। আর একজন সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত বর্ম্মী ছেলে এল। বিশ্লেষণে সে বেরোল পাঞ্জাবী আর্য্যসমাজীর পুত্র, মা তার মণিপুরী বর্ম্মী।

এদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে এক চেনা-শত্রুর আগমন-চিহ্নে উন্মনা হতে লাগলুম। ছেলেরা কেউ কেউ দাঁড়িয়ে সমুদ্রের তরঙ্গায়িত মূর্ত্তি দর্শন করতে লাগল। একজন বললে "আপনি উঠে দাঁড়িয়ে একটু দেখবেন না। এমন অপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৌন্দর্য্য চাক্ষুষ করবেন না?"

আর একজন বললে—"উনি কি আমাদের মত চঞ্চল প্রকৃতির যে এতে ওঁর রক্ত চঞ্চল হবে?"

আমি ডেক-চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসে আছি, উত্তরোত্তর আমার কথা কমে আসছে, কণ্ঠ থেকে কথা নিঃসৃত করতেই একটা বিপদের সূচনা লক্ষ্য করছি। বহু বর্ষ পূর্ব্বে সমুদ্রপথে একবার মাদ্রাজ গিয়েছিলুম, তখনই সমুদ্ররোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। বম্বে থেকে রত্নগিরি জঞ্জীরা প্রভৃতি দ্বীপে প্রয়াণকালেও আমার অন্তরপুরুষ বহির্ম্মুখী হয়েছিলেন। এখানে যে তিনি সুশীল বালক

হয়ে থাকবেন সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের উৎপত্তি হচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে সকলেই ভিতর থেকে একটা অসোয়াস্তি অনুভব করতে লাগলেন। বর্ম্মী যুবকেরা পরস্পর হাত-ধরাধরি করে খুব দ্রুতবেগে ডেকের উপর পায়চারি করতে লাগল—সেটা না কি সমুদ্র ব্যাধির নিবারক। স্বামী সত্যানন্দ, গুজরাটি যাত্রী, সাহেব সুবো সবাই অনেকক্ষণ ধরে এই মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করে পরাজয় মেনে যে যার ক্যাবিনে পলায়নপর হল।

আমি শুনেছিলুম যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডেকে থাকা যায় ভাল, ডেকের তাজা হাওয়ায় রোগ প্রশ্রয় পায় না, ক্যাবিনে গেলেই বিপদ। আমি সেই উপদেশ অনুসারে ঠিক করে আছি ক্যাবিনে শীঘ্র যাওয়া হবে না, যতক্ষণ পারা যায় উপরেই থাকতে হবে। যাত্রীরা সবাই নেমে গেল—পড়তে পড়তে, টলতে টলতে, জাহাজের রেলিং, দেওয়াল, চৌকি প্রভৃতি ধরে ধরে। আমি বসে রইলুম। ক্রমে ডেকের আলো স্তিমিত হয়ে এল, খালাসীরাও অদৃশ্য হল। একটা শূন্য পুরীর ভয়ঙ্করতায় সবটা আচ্ছন্ন হল। প্রবল ঝড়ো হাওয়া, বিষম দোলানি। আমি দেখলুম আর একা বসে থাকা চলে না, এবার নীচে নামাই শ্রেয়ঃ। আমার ক্যাবিনের চাবি আবার আমার বেহারার কাছে। সে থাকে থার্ডক্লাসের ডেকে। ভোজনাগারে জাহাজের কোন না কোন খানসামা সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে, তাদের বল্লেই আমার বেহারাকে ডেকে দেয়। কিন্তু ভোজনাগার পর্য্যন্ত টলমল করে যেতেই যেন এক যুগ কাটল। তার পর ঘুমন্ত খানসামাদের ডেকে, জাগিয়ে, নীচে পাঠাতে আর এক যুগ। শেষে সিঁড়ি দিয়ে পা সামলিয়ে নেমে আমার ক্যাবিনের দুয়োর পর্য্যন্ত এসে দাঁড়াতে আর এক যুগ। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলুম আর এক যুগ। সমুদ্রব্যাধিমুক্ত বেহারাটি গজেন্দ্রগমনে এসে চাবি খুলে দিলে। আমার ঘরে ঢোকারই বাকী ছিল কি ভিতরটা বাইরে ছুটে পড়ল। যেন কোন দৈত্য পাকস্থলীর মধ্যে পাম্প বসিয়ে বসিয়ে তার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে খালি করে দিতে দৃঢ়ব্রত হল। সে দৈত্যির তাড়না ডাঙ্গায় হয় না, তার শাসন মিঠে জলে চলে না, শুধু লবণাম্বুধিতেই তার উৎপত্তি, প্রভাব ও প্রলয়।

যাত্রাকালে আমার পুত্রটি বলেছিলেন—"জ্যোতিষীর কথা ত ভুল হল না, এই ত তোমার সমুদ্রযাত্রা হল।"

তখনও সেটা বাজে সন্দেহ বলে মনকে স্তোক দিয়েছিলুম। এখন কিন্তু এই সাক্ষাৎ দৈত্যের সমক্ষে আর সমুদ্রযাত্রাকে অস্বীকার করতে পারলুম না। জ্যোতিষের পক্ষ সমর্থন অতঃপর অসম্ভব হল।

পরদিন আর উঠতে পারলুম না। মধ্যাহ্নে অতি কষ্টে স্নানাগারে গিয়ে স্নানটা করে আসা গেল। এঞ্জিন ঘরের নীচেই স্নানের ঘর। স্নানের ঘরেও বিজলীর পাখা লাগান আছে, পাখা চালিয়ে স্নান করতে হয়। নয় ত উত্তাপাধিক্যে সহজ অবস্থাতেও সেখানে গা ঘোরে,—সমুদ্র ব্যাধির কবলিত হলে ত কথাই নেই। কোন ক্রমে স্নানটা সেরে টলতে টলতে আবার বিছানায় এসে পড়লুম। জাহাজের খানসামা ক্যাবিনেই খাবার সাজিয়ে নিয়ে এল। ফল ছাড়া আর কোন কিছু খেতে প্রবৃত্তিই হল না। সারা দিন চোখ বুজে পড়ে রইলুম। উঠলে, বা বালিসের থেকে মাথা তুল্লেই দৈত্যের তাড়না। তবু মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে ক্যাবিনের গোল গবাক্ষ দিয়ে, কালো জলের মুক্তোচ্ছ্বাস দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

কাল বিকেল পর্য্যন্ত, সুন্দরবনের উপকূল পর্য্যন্ত ভারতের সীমার মধ্যেই ছিলুম। সে সীমা অতিক্রম করতে না করতে উত্তাল তরঙ্গের সম্মুখীন হলুম। আজ সকালে দেখি, যে বিশাল জলপ্রাঙ্গণ বহুযোজন ব্যেপে শায়িত ছিল, সে হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে, নিজেকে চূর্ণ চূর্ণ করে ভেঙ্গে, আবার গড়ে, পর্ব্বতসম প্রাচীরের আকার ধারণ করে কলগর্জ্জনে বলছে—"যেতে পাবে না, পাবে না—আমাকে অতিক্রম করে কিছুতেই যেতে পাবে না।"

কালাপানির ঘোর কালো জল ভারতকে আগলিয়ে রয়েছে। ভীষণ অঘোরীর মত শাণিত ফেনিল অস্ত্র দেখিয়ে পথিকের পথ রোধ করতে চাইছে। কিন্তু ব্যর্থ তার আস্ফালন। চেতনের ইচ্ছাশক্তির কাছে জড়ের শত উদ্যমও পরাস্ত। এই ভীষণ সমুদ্রপথ বেয়েই বিদেশীরা ভারত উপকূলে উপনীত হয়ে ভারতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে। আজ ভারতের লোকও কালাপানির অভিভাবকতায় আর ত্রস্ত নয়। তারাও কালো থেকে নীল, নীল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে সাদা জলের রাজপথে ঘুরে ফিরে বিশাল ভারতের উপান্তে দেশদেশান্তে উপস্থিত হচ্ছে। সেই পথ ধরে আমিও চলেছি।

সন্ধ্যাবেলায় বেহারা বল্লে—এখন ঝড় থেমে গেছে, জাহাজ আর তত দুলছে না, দুটি একটি বাদে সব যাত্রীই যারা ডেক থেকে পালিয়েছিল—ফের ডেকে ফিরে গেছে। জাহাজ দুটো দরিয়া ছাড়িয়ে এখন তিনটে দরিয়াতে পৌঁচেছে, এবার আমি স্বচ্ছন্দে উপরে যেতে পারি।

বুঝলুম, গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে বোধ হয় এখন Gulf of Maraban এসে পড়েছি। আমার কিন্তু আজকের সন্ধ্যেতে আর উপরে যেতে উদ্যমে কুলল না। তার পরদিন সকালে জেগে পায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যখন দেখলুম ভিতরটা আর বাইরে আসতে চাচ্ছে না, তখনই উপরে যেতে সাহস করলুম।

এই তৃতীয় দিনটা ভারি চমৎকার লাগল। ঠিক যেন গঙ্গার উপর ষ্টীমারে হাওয়া খেতে বেরিয়েছি। দুজন সাহেব ডেকের উপর "রিঙ" খেলতে লাগল। টেনিস বা ব্যাডমিণ্টন-কোর্টের মত ডেকের উপর খড়ি দিয়ে ঘর কাটা, মাঝখানে একটা জাল টাঙ্গান। বলের পরিবর্ত্তে একটা খড়ের বিঁড়ে—জালের এপাশে ওপাশে হাতে করে ঘুরিয়ে ফেলে খেলা হচ্ছে, তাকেই বলে 'রিঙ'। অল্প পরিসরের মধ্যে যতটা আমোদ ও ব্যায়ামের সুযোগ উদ্ভাবন করা যেতে পারে তার ত্রুটী নেই। বিকেল থেকেই ব্রহ্মদেশের আবছায়া দেখা গেল। বেসিনের আলোকস্তম্ভ দূর থেকে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলজ্বল করতে লাগল। এখন আর অপার সমুদ্রের উপর নেই আমরা, দুদিকেই পার দেখা যাচ্ছে।

পরদিন ভোরে ইরাবতীর ভিতর দিয়ে টক্‌টকে লাল বালারুণের মুকুটপরা রেঙ্গুনবন্দরের অজানা কূলে এসে লাগলুম। একটা নির্দ্দিষ্ট আমন্ত্রণে বাড়ী ছেড়ে ব্রহ্মদেশের অভিমুখে, পরিচিত ছেড়ে অপরিচিতের দিকে বাহির হয়েছি বটে—কিন্তু তবু অনির্দ্দিষ্টের আশঙ্কা মনের অন্তস্তলে বরাবরই দোলা দিচ্ছে।

জাহাজ একেবারে বন্দরে পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী হবে শোনা গেল। বেহারার উপর জিনিষপত্র গোছগাছের ভার দিয়ে আমি ডেকের উপর নতুন সহরের প্রথম দৃষ্টিটা উপভোগ করতে এলুম। একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক অকস্মাৎ কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে আমায় অভিবাদন করলেন। নিজের পরিচয় দিলেন তিনি রাজা রেড্ডিয়ারের সেক্রেটারী, পাইলটের নৌকায় তিনি আগেই এসেছেন। রাজা এবং অন্যান্য সকলে বন্দরে প্রতীক্ষা করছেন। মিনিট পাঁচেক পরেই আবার পাঁচ ছয়টি লোক হঠাৎ কোথা দিয়ে এসে আমায় ঘিরে ফেল্লেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই হাতে ফুলের মালা। একজনের হাতে একটা মস্ত তোড়া। তাঁরা বন্দরে প্রতীক্ষা না করে হেল্‌থ অফিসারের নৌকাতেই এসে পড়েছেন বল্লেন। পরস্পরে পরস্পরের পরিচয় দিতে দিতে আমায় মাল্যভারে অবনত করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন রাজা রেড্ডিয়ার—রেঙ্গুনের মাদ্রাজী ক্রোড়পতি, বর্ম্মা প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, একজন স্বামী শ্যামানন্দ—রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তা, একজন ডাক্তার ওটদিত্তামল, রেঙ্গুন আর্য্য সমাজের 'প্রধান'। পার্সি হেল্‌থ অফিসার ও তৎসঙ্গী একজন মুসলমান ব্যারিষ্টারও আমায় 'বর্ম্মাপ্রদেশে স্বাগত' বলে অভিবাদন করলেন। সকলের সাগ্রহ ও সাদর অভ্যর্থনায় মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর নিকট হয়ে পড়ল, শূন্য পূর্ণ হয়ে গেল। কথা-বার্ত্তায় রেঙ্গুনে ও রেঙ্গুনের বাইরেও আমার জন্যে যে দীর্ঘ কার্য্য-তালিকা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তার কতকটা আভাষ পেলুম।

স্বামী সত্যানন্দের খোঁজ হল; তাঁকেও ক্যাবিন থেকে বের করে যথাযোগ্যভাবে সম্মানিত করা হল।

একজন বন্দরের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, দূর থেকে বহু লালপাগড়ীর ভিড় মনে হল। আমি ভাবলুম—এ কি সরকারী সাবধানতা? আগন্তুকেরা বললেন—"না, ঐ লাল রঙ্গ লাল নিশানের, নিশান হাতে বিপুল জনতা আপনার জন্যে ভোর থেকে অপেক্ষা করছে।"

আমাকে তারা কোন দিন চোখে দেখে নি, আমিও তাদের কোন দিন চোখে দেখি নি। চেনা বা অচেনাদের এতটা শ্রদ্ধার অপাত্রতা সম্বন্ধে নিজের অনুভূতি প্রগাঢ় হয়ে আমায় লজ্জাবনত করলে। কিন্তু বাঁধি গতের অঙ্গ জেনে ওর অনিবার্য্যতা বিচার করে মনকে নিরঙ্কুশ করলুম।

খরখরে রৌদ্র উঠার পর প্রায় বেলা ৯টার সময় জাহাজ বন্দরে ঢুকল। তার পরে হিন্দুসভা ও কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটরীদ্বয়—মিষ্টার জে, সি, ঘোষ ও মিষ্টার লাঠিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রোসেশন পরিচালিত হল। সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে প্রায় ১১টার সময় গন্তব্য গৃহে পৌঁছলেন। সে গৃহটি

মহাত্মা গান্ধীর সোদরোপম বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মেটার। সাবরমতী আশ্রমে আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। তিনি কলিকাতাতেই তার করে আমায় তাঁর আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা, রেঙ্গুনের জষ্টিস সেনের পত্নী, মেটা সাহেবের দাবীর উপর নিজের দাবীর শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করে আমাকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁদের গৃহে প্রত্যহ একবার আনাগোনার সর্ত্তে আমি মেটা পরিবারের নিকট মুক্তি পেলুম।

অতিথির সঙ্গে সঙ্গে দুজন মাদ্রাজী ভলন্টিয়ারের হস্তধৃত দুখানি স্বরাজ পতাকা জজসাহেবের গৃহদ্বারে শোভমান হল।

সাগর-সঙ্গমে

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কোন রকমে পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা যায়; কিন্তু ঘাড়টা পর্য্যন্ত সোজা করিবার উপায় নাই, মাথা তুলিলেই নৌকার ছইয়ে ঠেকিয়া যায়।

দাক্ষায়ণী মোটা মানুষ, পায়ে একটু বাতও আছে। পা না ছড়াইয়া বেশীক্ষণ একভাবে তিনি বসিয়া থাকিতেই পারেন না, কিন্তু সে অসুবিধার কথা তাঁহার এখন মনেই নাই। সঙ্কীর্ণ নৌকার ছই-ঢাকা স্থানটিতে বসিয়া, তিনি 'সেথো' লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া সে সব গাল পাড়েন তাহার কারণ অন্য।

'সেথো'র কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশে, অপরিচিত তীর্থ-স্থানে যাহার ভরসা করিয়া রওনা হইতে হইয়াছে, মনে মনে যত রাগই থাকুক, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে কেহ সাহস করে না। গরু-ভেড়ার মত তাল পাকাইয়া নৌকার সঙ্কীর্ণ ছইএর নীচে অশেষ দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইলেও তাহারা নীরব হইয়াই থাকে।

কিন্তু দাক্ষায়ণী চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নহেন। পাড়ার ডাকসাইটে তেজী মেয়ে-মানুষ;—বালিকা বয়সে বিধবা হইবার পর লোকে তাঁহার অননুকরণীয় নিষ্ঠা ও ধর্ম্মাচরণের জন্য শ্রদ্ধা যতখানি করে, তাঁহার প্রচণ্ড মুখের ধারকে ভয় করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী।

বিদেশে বিভুঁয়ে অপরিচিত তীর্থপথের একমাত্র সহায় হইয়াও লক্ষ্মণ সে মুখের কাছে রেহাই পায় না। দাক্ষায়ণী কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিবার মেয়ে নয়; বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে তাঁহার রাগের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান।

"হতচ্ছাড়া মুখপোড়া বাঁদর। দেশে তোকে ফিরতে হবে না? তখন পাইখানার খ্যাংরায় তোর মুখ ভেঙে না দিই ত আমি মুখুজ্যেদের বৌ নই!"

লক্ষ্মণ উত্তর দেয়না; উত্তর দিতে এমন কি তাহাকে এই কদিন দেখিতেও পাওয়া যায় নাই। হালের মাচানের উপর সভয়ে দাক্ষায়ণীর নাগালের বাহিরে সে দিন কাটায়। দাক্ষায়ণীর সামনে আসিবার সাহস তাহার নাই।

ছইএর ভিতর হইতে দাক্ষায়ণীর কণ্ঠ শোনা যায়—"জোচ্চোর, পাজী, হারামজাদা, আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই ত তোকে সাগর পর্য্যন্ত পৌঁছুতে হবেনা—তার আগে তুই ওলাওটায় মরবি।"

লক্ষ্মণ এ অভিশাপে শিহরিয়া ওঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার তাহার কিছুই নাই। নৌকার অপর ধারে খোলা পাটার উপর বসিয়া যাহারা কলরব করিতেছে, তাহাদের সম্পর্কেই দাক্ষায়ণীর এই রাগ। লক্ষ্মণেরও এমন মনে হয় পয়সার লোভে এমন কাজটা না করিলেই হইত। কিন্তু এখন যে আর উপায় নাই।

ছইএর ভিতর হইতে আবার কলরব শোনা যায়। বছর আষ্টেকের একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে ছইএর অপর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে লইয়াই গোল।

দেখিতে সুশ্রী হইলে কি হইবে, ওইটুকু এক রত্তি মেয়ের

চাল চলন কথায় বার্ত্তায় অসহ্য পাকামি দেখিলে গা জ্বলিয়া যায়। ছইএর ভিতরকার মেয়েরা একবাক্যে প্রতিবাদ করিয়া বলে—"মানুষের বসবার জায়গা নেই, এখান দিয়ে যাবি কি লা?"

ছোট মেয়েটি তাহার ফুলের মত কচি মুখটি অপরূপ ভঙ্গীতে বিকৃত করিয়া হাত নাড়িয়া বলে—"যাবনা কেন লা! তোমাদের ত কেনা জায়গা নয়!"

অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া মেয়েরা বলে "ওমা কোথায় যাব মা! এক ফোঁটা মেয়ের কথার ঢঙ দেখেছ!"

একজন বলে, "হবেনা, কি রক্তে জন্ম!"

মেয়েটা ছোট মুখখানি বাঁকাইয়া বলে, "মুখ নাড়তে আর হবেনা, ভালোয়-ভালোয় পথ দাও বলছি, নইলে গায়ের ওপর দিয়ে যাব।"

দাক্ষায়ণী এতক্ষণ কথা বলেন নাই। এবার অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চোখ রাঙাইয়া বলেন—"তবে রে ইল্লুতে মেয়ে—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা; যা না দেখি গায়ের ওপর দিয়ে; গলা টিপে পুঁতে ফেলব না!"

কিন্তু দাক্ষায়ণীর চোখ রাঙানিতেও ভয় পাইবার মেয়ে সে নয়; চোখ ঘুরাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে "ইস্ পুঁতে অমনি সবাই ফেলে!"

ওদিক হইতে একটি স্ত্রীলোক ডাকিয়া বলে "ওদের সাথে আবার লাগতে গেলি কেন লা বাতাসী!"

বাতাসী চক্ষের নিমেষে একেবারে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়া বলে, "দেখনা মা, লক্ষ্মণ দাদার কাছে যেতে চাইলুম তা মাগী গলা টিপে দিলে।"

ছইএর তলার স্ত্রীলোকের দল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়—"ওমা কি ঘেন্না! তোর গলা টিপলে কে লা ছুঁড়ি? আবার বলে কি না মাগী!"

বাতাসী ফুঁফাইতে ফুঁফাইতে অসঙ্কোচে বলে—"না বলবেনা! গলা টিপে দিলে চুপ করে থাকবে!"

"হ্যাঁ গা, ওই কচি মেয়ের গলা টেপা কিসের জন্যে?" বলিয়া যে স্ত্রীলোকটি উঠিয়া আসে—শীর্ণ অসুস্থ কুৎসিত মুখে, কোটরপ্রবিষ্ট দুই চোখে, দেহের সমস্ত ভঙ্গীতে, তাহার জীবনের কদর্য্য ইতিহাস অতি স্পষ্ট ভাবেই লেখা—দেখিলে চিনিতে বিলম্ব হয় না। কাছে আসিয়া বাতাসীকে কোলের কাছে টানিয়া নিয়া বলে—"কে গলা টিপলে কে শুনি!"

বাতাসী অম্লানবদনে দাক্ষায়ণীর দিকে দেখাইয়া দিয়া বলে, "ওই ধুমসি মাগীটা।"

দাক্ষায়ণীর মুখে পর্য্যন্ত এই নির্লজ্জ মিথ্যা অভিযোগে খানিকক্ষণ কথা সরে না। তাহার পর নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া তিনি কটুকণ্ঠে বলেন,—"আমি গলা টিপলে আজ যে মরে স্বর্গে যেতিস ছুঁড়ি, সে ভাগ্যি তোর হবে!"

ঝগড়াটা ইহার পর আরো কত প্রচণ্ড হইয়া উঠিত বলা যায়না, কিন্তু মাঝিরা ইতিমধ্যে আসিয়া মাঝে পড়িয়া বাতাসী ও তাহার মাকে একরকম জোর করিয়াই সরাইয়া লইয়া যায়। দূর হইতে পরস্পরের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ ইহার পর চলিতে থাকে, কিন্তু বিশেষ কিছু কেলেঙ্কারী আর হইতে পারেনা।

* * * *

ডায়মণ্ড হারবার হইতে নৌকা ছাড়িবার পর এমনিতর গোলযোগ কয়দিন ধরিয়াই চলিতেছে। দাক্ষায়ণী নৌকা ছাড়িবার পর তাঁহাদের সঙ্গে বেশ্যার দলকে সহযাত্রী করা হইয়াছে জানিতে পারা অবধি নৌকায় আর জলগ্রহণ করেন নাই। এখন আর উপায় নাই, নহিলে তিনি বোধ হয় নৌকাও ত্যাগ করিয়া যাইতেন।

এই কয়দিনের ভিতর মাত্র দুইবার চরে নৌকা লাগান হইলে তিনি ভাল করিয়া স্নান করিয়া সামান্য একটু আহার করিয়াছেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁহার নৌকায় নিরম্বু উপবাসে কাটিয়াছে। অন্যান্য ভদ্র যাত্রীরা সকলেই স্ত্রীলোক এবং তাহাদের অধিকাংশই তাঁহার মত বিধবা। তাহারা তাঁহার মত অতখানি আত্মসংযম কিন্তু করিতে পারে নাই। গঙ্গাজল ও বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই ইত্যাদি বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়াছে, তাঁহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু দাক্ষায়ণীর সঙ্কল্প অটল।

উপবাস তাঁহার একরকম গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ কিছু কাবু তিনি তাহাতে হইয়াছেন এমন মনে হয়-না। কষ্ট যেটুকু হইয়াছে 'সেথো' লক্ষ্মণকে গাল পাড়িয়া তিনি সেটুকু একরকম লাঘব করিয়া লইয়াছেন। আজ কিন্তু এতদিন বাদে তাঁহাকে যেন ক্লান্ত দেখায়—ছোট ওই

এক ফোঁটা মেয়ের হাতে অপমানটা তাঁহার বড় বেশী বাজিয়াছে মনে হয়। আর সকলে উত্তেজিত হইয়া ওই কচি মেয়ের শয়তানী বুদ্ধি, তাহার কলঙ্কিত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি অনেক কথা লইয়াই আলোচনা করে!

"আঁতুড়ের গন্ধ গা থেকে যায়নি, মেয়েটার কথা শুনলে গা!"

"কচি দাঁতে এত বিষ, বড় হলে ও কত সংসারে আগুন দেবে মা কে জানে!"

"ওই এক রত্তি আমাদের নাতনীর বয়সী মেয়ে—দিনকে একেবারে রাত করে দিলে!"

"কে জানে মা, মা গঙ্গার কি মহিমে! নইলে এত পাপও তিনি স'ন।"

কিন্তু দাক্ষায়ণী এ সমস্ত আলোচনায় যোগ দেন না; এমন কি 'সেথো' লক্ষ্মণকে গাল দিতেও তিনি আজ ভুলিয়া যান।

দুই দিন পরের কথা। শতমুখী পিছনে ফেলিয়া নৌকা ধবলাটের কাছাকাছি আসিয়া নোঙর করিয়াছে। কুয়াসাচ্ছন্ন তিমিরলিপ্ত রাত্রে তীরতট কিছু দেখা যায় না, শুধু নৌকার গায়ে গাঙ্গের স্রোতের মৃদু আঘাতের শব্দ শোনা যায়। আকাশ ও জল অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে; তাহারই মাঝে শুধু দূরে দূরে সাগরমুখী চলমান কয়েকটি নৌকার ক্ষীণ আলো দেখিয়া গাঙ্গের সীমা নির্ণয় করা চলে। সঙ্কীর্ণ জায়গায় আর সকলের মত আড়ষ্ট হইয়া ঘুমাইতে দাক্ষায়ণী পারেন না। একাকী জাগিয়া তিনি ছইএর ছিদ্রপথে গাঙ্গের কালো জলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল জলের শব্দ যেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যায় নোঙর ফেলিবার সময় মাঝিদের কথাবার্ত্তা তাহার কিছু কাণে গিয়াছিল—তাহাদের কথাতেই শুনিয়াছিলেন—এখানকার জোয়ার বড় প্রবল, তখন নৌকা না সামলাইলে বিপদের সম্ভাবনা।

সহসা তিনি ভীত হইয়া উঠিলেন—এই জোয়ার নয় ত? কিন্তু মাঝিরা সবাই ত ঘুমাইতেছে। যদি কোন বিপদ ঘটে!

জলের শব্দ ক্রমশঃ আরো বাড়িয়া উঠিতেছিল।

মাঝিদের ডাকা উচিত কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় ভীষণ শব্দ করিয়া ছোট নৌকাটি উন্মত্তভাবে দুলিয়া উঠিল।

জোয়ারের টানে বেহাল হইয়া প্রকাণ্ড মহাজনী জ ছোট নৌকাটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

পলকের মধ্যে ভীত সন্ত্রস্তোত্থিত মাঝি ও যাত্রীদে চীৎকারে, নৌকার তক্তাগুলির প্রচণ্ড বিদারণ শ অন্ধকার নদীবক্ষ মুখর হইয়া উঠিল। কোথা দিয়া সে নিদারুণ মুহূর্ত্তে কি যে হইয়া গেল—দাক্ষায়ণী কিছুক্ষণে জন্য একপ্রকার জ্ঞান হারাইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

খানিক বাদে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইলে নদীর হিমশীতল জলে তিনি কেমন করিয়া ভাসিতেছেন। সামনে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল দৈত্যে মত বৃহদাকার ভড়ের কালো ছায়ামূর্ত্তির সঙ্গে তাঁহাদে নিষ্পেষিত নৌকাটি যেন জড়াইয়া গিয়াছে।

হাল ভাঙ্গিয়া পাণিতরাস চৌচির হইয়া সে নৌকা ডুবিতেছিল।

ছেলেবেলা সাঁতারের অভ্যাস ছিল, দাক্ষায়ণী দেখিলে এখনও ভাসিয়া থাকিতে তাঁহার কষ্ট হয়না। ভড়ে মাঝি মাল্লারা এই বিপদে ছুটাছুটি করিয়া হল্লা করিতেছিল, চীৎকার করিয়া একবার তাহাদের ডাকিলেন। কিন্তু শুনিতে কেহ পাইল বলিয়া মনে হয় না।

প্রৌঢ় বয়সে এই হিমশীতল জলে বেশীক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন এমন আশা দাক্ষায়ণীর ছিলনা। শু তাই নয়, সুন্দরবনের গাঙ্গের কুমীরের কথাও তিনি জানিতেন—ভাসিয়া থাকিলেও কতক্ষণ আর রেহাই পাইবেন।

এমন সময় দৈব খানিকটা কৃপা করিল। ভাঙ্গা নৌকার হালটা সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। অন্ধকারে প্রথমটা তাহার কালো মূর্ত্তি দেখিয়া দাক্ষায়ণী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিলেন সেটা কাঠ। সবলে সেটিকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

কিন্তু এটা কি? পুঁটুলির মত একটা কি জিনিষ হাতে ঠেকিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পুঁটলি হইতে অস্ফুট একটা ভীত শব্দ বাহির হইল। মুখটা একটু কাছে লইয়া গিয়া ভালো করিয়া নজর করিয়া চাহিতেই বি

সব পরিষ্কার হইয়া গেল। ভীত কাতর দুটি চক্ষু মেলিয়া বেচারীদের সেই ছোট মেয়েটা প্রাণপণে হালের এক দিক আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই নিদারুণ মুহূর্ত্তেও তাহাকে স্পর্শ করিয়া ঘৃণায় দাক্ষায়ণীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভড়ের উপরকার মাঝিরা তখন কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া বোধ হয় নিমজ্জমান যাত্রীদেরই অনুসন্ধান করিতেছে। তাহার অস্পষ্ট আলোয় সেই অসহায় মেয়েটার মুখ দেখিবার বিন্দুমাত্র অনুকম্পা তাঁহার হইলনা। বিষাক্ত সরীসৃপ-শিশুর মত এই একদিন বড় হইয়া সংসারকে পাপের বিষে জর্জ্জর করিয়া তুলিবে এমনি একটা অস্পষ্ট চিন্তায় তাঁহার মন বিজাতীয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অসহায় কান্না, দুর্ব্বল দুটি হাতে প্রাণপণে হালটিকে জড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা, এ সমস্ত কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া সবলে তিনি তাহাকে জলে ঠেলিয়া দিলেন।

মেয়েটা 'মাগো' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, খানিকটা ডুবিয়া জল খাইয়া নাকাল হইয়া ক্ষীণ দুটি বাহু তুলিয়া তাঁহার হাতটা ধরিবার একবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল, তাহার পর আবার ডুবিল;—মশালের আলোয় ঈষৎ রক্তাভ নদীর কালো জল তাহার শেষ চীৎকারের মাঝখানে তখন নিঃসাড় নিস্তব্ধতার যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মেয়েটার সেই শেষ অর্দ্ধস্ফুট চীৎকারে দাক্ষায়ণীর মনে কি যেন সব ওলট-পালট হইয়া গেল। ডুবিবার আগে তাহার সে ভীত সকাতর মুখের মিনতি ভুলিবার নয়। কলঙ্কিত একটা বেশ্যার মেয়ে—শিরায় শিরায় তাহার পাপের পঙ্কিল রক্ত; বাঁচিয়া সে শুধু সংসারের পাপের ভারই বাড়াইতনা, নিজেরও তাহার দুর্গতির সীমা থাকিতনা, এ সব ভাবিয়া আর তাঁহার মন প্রবোধ মানিতে চাহিলনা। এখনও যেন অস্পষ্টভাবে তাহার কাপড়ের একাংশ জলের উপর ভাসিতে দেখা যাইতেছিল। এখনও হয়ত তোলা যায়। কিন্তু অবশ দেহমনে এই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাওয়াও যে সহজ নহে। দারুণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দাক্ষায়ণী উন্মত্তের মত হইয়া উঠিলেন।

হঠাৎ অনতিদূরে মেয়েটার মাথাটা ভাসিয়া উঠিল।

দাক্ষায়ণী ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু জলের ভিতর হাতড়াইয়া কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। এই কয়দিনের উপবাসে দুর্ব্বল বাতগ্রস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতক্ষণ শীতল জলে থাকার দরুণ ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিতেছিলেন। তবু আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া তিনি চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিলেন—হাতের মুঠায় কি যেন একটা ধরিয়াছেনও মনে হইল, কিন্তু তখন তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নাগালের অত্যন্ত কাছে কালো হালের কাঠটা তখনও ভাসিতেছিল, দাক্ষায়ণী হাত বাড়াইয়া সেটা ধরিবার চেষ্টা করিলেন—হাত তাঁহার উঠিল না। মুঠায় যাহা ধরিয়াছিলেন, সেইটাই শুধু তাঁহার আড়ষ্ট হাতে জড়াইয়া রহিল।

কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু দাক্ষায়ণীর কপালে নাই।

জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনিতে পান নিকটে কাহারা বলিতেছে—"তাইতেই বলে না মায়ের প্রাণ!"

দুর্ব্বল দেহে অবসন্ন মনে কথাটার কোন তাৎপর্য্য তিনি বুঝিতে পারেন না, বুঝিবার উৎসাহও তাঁহার থাকে না। সারা দেহে অসীম ক্লান্তি অনুভব করিয়া দাক্ষায়ণী আবার ঝিমাইয়া পড়েন।

কিন্তু সকালবেলা তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠেন। সামান্য যেটুকু দুর্ব্বলতা থাকে তাহা এমন কিছু মারাত্মক নয়।

তিনি যেখানে শুইয়া আছেন, সেটা যে কোন নৌকারই একটা ঘর তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না। ডান পাশের খুদরি জানালা দিয়া দিগন্ত-প্রসারিত জলরাশির উপর প্রভাতসূর্য্যের আরক্ত জাগরণ প্রথমেই চোখে পড়ে। নৌকার এ ঘর তাঁহার অপরিচিত। জলে ডুবিয়া মরিতে মরিতে কোনরকমে তিনি উদ্ধার পাইয়াছেন, এইটুকুই শুধু বুঝিতে পারেন, কেমন করিয়া এই অপরিচিত নৌকায় স্থান পাইয়াছেন, কে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছে, কিছুই তাঁহার স্মরণ হয় না।

অপরিচিত এক বৃদ্ধ মাঝি আসিয়া একগাল হাসিয়া বলে—"মা গঙ্গার খুব কিরপা বোলতে হবে মাঠাকরুণ। নিতে নিতে ফিরিয়ে দেছেন। আর একটু দেরী হলে দুজনের কাউকে তুলতে পারা যেতনি।"

দেখিতে দেখিতে আরো কয়েকজন মাঝি মাল্লা দরজার কাছে আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়ায়।

একজন বলে, "মেয়েটা যা জল খেয়েছিল, বাঁচবে বলে আর আশা ছিলনি। মাঠাকরুণের খুব পুণ্যি ছিল তাই!"

বৃদ্ধ মাঝি বলে—"যা জম্পেস করে তেনার কাপড়টা ধরেছিলেন মাঠাকরুণ, আমি ত পেরথমে ছাড়াতেই নারলুম।"

আর একজন বলে, "তা জম্পেস করে ধরবেনি? মায়ের প্রাণ ত বটে!"

কে একজন ইতিমধ্যে মেয়েটাকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনিয়া একেবারে দাক্ষায়ণীর কোলের কাছে বসাইয়া দিয়া বলে, "নেন মাঠাকরুণ, মেয়েকে আপনার একদম চাঙ্গা করে দিছি।"

দাক্ষায়ণী এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, এইবার কিন্তু বিস্ময়ের তাঁহার আর সীমা থাকে না। বেশ্যাদের সেই মেয়েটাকেই তাঁহার কন্যা ভাবিয়া ইহারা তাঁহার কোলের কাছে বসাইয়া দিয়াছে!

মেয়েটা সভয়ে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। দাক্ষায়ণী উঠিয়া বসিয়া মাঝিদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য বলেন—"ও ত আমার মেয়ে নয়।"

মাঝিরা সবাই হাসিয়া ওঠে। বুড়া মাঝি হাসিয়া বলে, "ঠিক বলেছেন মা ঠাকরাণ, ওটা কুড়োনি মেয়ে, গঙ্গার জলে ওটাকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি—কি বলিস খুকী!"

খুকী মাথা নোয়াইয়া একেবারে বিছানার সঙ্গে যেন মিশাইয়া যাইতে চায়। দাক্ষায়ণী মাঝিদের কথার ধরণে সহসা ভীত হইয়া ওঠেন, তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন—"ও যে সত্যি আমার মেয়ে নয়।"

কিন্তু কে সে কথা শুনিতেছে! তাঁহার মুখের ভাবই বা কে লক্ষ্য করে। বাতাসী তখন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুঁফাইয়া ফুঁফাইয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে। বুড়া মাঝি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বলে—"আরে এটা কি পাগলী মেয়ে, তামাসা বোঝেনা! তুইও বলনা কেন, তুমি আমার মা নও!"

দাক্ষায়ণী বিহ্বল ভাবে সকলের মুখের দিকে তাকান। ইহাদের এ অদ্ভুত ধারণা কোথা হইতে জন্মিল, কেমন করিয়াই বা এ ধারণা তিনি দূর করিবেন, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেননা।

বাতাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধ মাঝির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যায়। দাক্ষায়ণী ক্লান্ত মনে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়েন।

ধবলাট বেশী দূরে নয়। দুপুর নাগাদ মহাজনী ভড় হইতে মাঝিরা সেখানে তাঁহাদের নামাইয়া দেয়। ইহার পর তাহাদের অন্য দিকে যাইতে হইবে। সুতরাং আর বেশী তাহারা তাঁহাদের লইয়া যাইতে পারিবেনা।

বৃদ্ধ মাঝি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া বলে—"হুকুম নেই, মাঠাকরুণ, নইলে আপনাদের গঙ্গাসাগর অবধি পৌঁছে দিতুম। তবে ধবলাট হয়ে হামেশা গঙ্গা-সাগরে নৌকো যাবে মা—তার একটায় চেপে বস্‌বেন।"

দাক্ষায়ণী অত্যন্ত বিমূঢ় ভাবে ভড়ের উপর হইতে নদীর পাড়ে ফেলা তক্তার উপর দিয়া নামিয়া যান।

বৃদ্ধ মাঝি ডাকিয়া বলে—"মেয়েটার হাতটা ধরে নিন মাঠাকরুণ, বড় পেছল।"

যন্ত্রচালিতের মত দাক্ষায়ণী বাতাসীর হাতটা ধরিয়া তীরে ওঠেন।

এই কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁহার মনের ভিতর দিয়া যে ঝড় গিয়াছে, তাহাতে বিমূঢ় হওয়া কিছু আশ্চর্য্যও নয়। মাঝিদের কাছেই খবর পাইয়াছেন যে, তাঁহাদের নৌকার দু'একজন মাল্লা ছাড়া আর কেহই বোধ হয় রক্ষা পায় নাই। তাঁহার একই গ্রাম হইতে তাঁহার যে সব সখী সাথী আসিয়াছিল, তাহারা সবাই নৌকার মাঝে বন্দী হইয়া অতি শোচনীয় ভাবে ডুবিয়া মরিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের দু'জনকে ছাড়া আর কাহাকেও তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই; এবং তাঁহাদের দুইজনের যে মা ও মেয়ের সম্বন্ধ এই ভুল তাহাদের আরও কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ভাঙা সম্ভব হয় নাই। তাহারা তাঁহাকে ভাঙা হালের উপর হইতে মেয়েকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়াছে; এবং সন্তানের জন্য ছাড়া মানুষ এমন কাজ করিতে পারে, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করে কেমন করিয়া! বৃদ্ধ মাঝি হাসিয়া বলিয়াছে—"নাড়ীর টান বড় টান মা-ঠাকরুণ, ও কি আর লুকোবার জো আছে।"

মহাজনী ভড়এর মাঝিরা পাটা তুলিয়া ধীরে ধীরে আবার নৌকা ছাড়িয়া দেয়। সে নৌকা দূরে অদৃশ্য হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাক্ষায়ণী বিমনা হইয়া বাতাসীর হাত ধরিয়া তীরে দাঁড়াইয়া থাকেন। তার পর সহসা সচেতন হইয়া সজোরে মেয়েটার হাত তিনি দূরে ছুঁড়িয়া দেন। তাঁহার গঙ্গাসাগর যাত্রার পথের সমস্ত দুর্ঘটনার কারণ ক্ষোভ ও রাগ এই মেয়েটার উপর গিয়া পড়ে। তাহার মুখের দিকে চাহিতে পর্য্যন্ত তিনি পারেন না।

বাতাসীকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়া নিজের দুশ্চিন্তায় তন্ময় হইয়াই তিনি আগাইয়া চলিতে থাকেন। দুশ্চিন্তা তাঁহার বড় কম নয়। কোমরের থলেতে বাঁধা পাথেয়র টাকা তাঁহার জলে ডুবিয়াও খোয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু হাজার শক্ত হইলেও অপরিচিত স্থানে একা মেয়েমানুষ হইয়া গঙ্গাসাগর দূরের কথা দেশে ফিরিবার ব্যবস্থাই কেমন করিয়া করিবেন, তাহা ভাবিয়া দাক্ষায়ণী আর কূল পান না। সামনে কতকগুলা বড় বড় আটচালার চারি পাশে অনেকগুলা লোক জড় হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদেরই অনুনয় বিনয় করিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে ভাবিয়া দাক্ষায়ণী চলিতে থাকেন।

হঠাৎ ধপ্ করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়! মেয়েটা এতক্ষণ বুঝি তাঁহার পিছু পিছুই আসিতেছিল, মাঝে একটা মাটির ঢিপিতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

অত্যন্ত কটু কণ্ঠে তাহাকে ভৎর্সনা করিতে গিয়া দাক্ষায়ণী সহসা চুপ করিয়া যান। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আলো একটা খোলমকুচিতে লাগিয়া মেয়েটার পা কাটিয়া একেবারে ঝুঁজিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। ইহার পর তাহাকে ধরিয়া তুলিতেই হয়। মেয়েটা অশ্রুসিক্ত ভীত মুখটা নীচু করিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়। কাল রাত্রে সবে সে অনেক কষ্টে জলে ডুবিয়া মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছে! ছোট মেয়ে,—শরীর তাহার এখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। হাত ধরিয়া তুলিয়া দাক্ষায়ণী দেখিতে পান পা দুটো তাহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে!

উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেন—"হাঁটতে পারবে না?"

যত দোষই থাকা মেয়েটি নির্বোধ নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার একান্ত নিঃসহায় অবস্থাটা তাহার সামান্য বুদ্ধিতে যতখানি সম্ভব সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের সহিত তাহার পরিচিত মেয়েদের তফাৎ যে কত তাহাও সে কিছু কিছু জানে। দুই দিন আগে যাঁহাকে সে অপমান করিয়াছে, আজ তাঁহারই অনুকম্পা তাহার একমাত্র সম্বল, এইটুকু যত অস্পষ্টভাবেই হউক বুঝিয়া, সে তাঁহাকে বিব্রত করিতে ভয় পায়।

ধরা গলায় মাথা নীচু করিয়া সে বলে 'পারব', কিন্তু খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দুই পা যাইতে না যাইতে দুর্ব্বলতায় মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়ে। দাক্ষায়ণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।

কোলে করিয়া এইবার তাহাকে লইয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই, কিন্তু দাক্ষায়ণীর চিরজীবনের সংস্কারে এই অশুচি মেয়েটাকে অমন করিয়া বহিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত বাধে। মেয়েটার পা কাটিয়া রক্ত পড়িতে দেখিয়া যেটুকু মায়া তাঁহার হইয়াছিল, তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইতে হওয়ার সম্ভাবনায় সেটুকু একেবারে উবিয়া গিয়া শুধু বিতৃষ্ণাতেই তাঁহার মন তিক্ত হইয়া ওঠে। মনে হয়, মেয়েটা ছেনালী করিয়া অজ্ঞান হইবার ভান যে করে নাই, তাই বা কে বলিতে পারে!

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া তিনি সচেতন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাতাসীর সত্যই তখন জ্ঞান নাই। সে তাঁহার গায়ে লতাইয়া পড়ে। অগত্যা দাক্ষায়ণীকে কোলে লইতেই হয়; এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপে জীবনের কোন্ অজ্ঞাত অপরাধে এই শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাই বোধ হয় বিধাতার কাছে তিনি প্রশ্ন করেন।

দূর হইতে তাঁহাদের বিপদ দেখিয়া দুই একটা লোক আপনা হইতেই আগাইয়া আসে। দাক্ষায়ণী সংক্ষেপে তাহাদের কাছে নৌকাডুবির কথা জানাইয়া সহায়তা প্রার্থনা করেন। বাতাসী সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যই করেন না; করা যে নিষ্ফল এটুকু তিনি এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। হাতে হাতে তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়।

মেয়েটাকে তাঁহার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া একজন

বলে—"তবু ভগবানের দয়া বলতে হবে বাবু, মা মেয়ের একজনকে রেখে আরেক জনকে নেন নি—কি সর্ব্বনাশই তাহলে হত!"

সে রাত্রের মত গঞ্জের এক ব্যাপারীর ঘরে আশ্রয় তাঁহাদের মিলিল। ঠিক হইল পরদিন সাগরগামী কোন নৌকায় তাঁহাদের তুলিয়া দেওয়া হইবে।

পৌষ মাসের শীত। গরম কাপড় যাহা ছিল, নৌকার সঙ্গেই সমস্ত ডুবিয়াছে। ব্যাপারীরা দয়া করিয়া একটা পাতিবার কাঁথা ও একটা কম্বল জোগাড় করিয়া দিয়াছে—মায়ে-ঝিয়ে কোনরকমে তাহাতে রাত কাটাইতে পারিবে ইহাই তাহাদের ধারণা।

হোগলায় ছাওয়া নাতি-বৃহৎ মাটির ঘর এক কোণের মৃদু কেরাসিনের শিখায় ভাল করিয়া আলোকিত হয় নাই। তাহারই এক ধারে জড়সড় হইয়া বসিয়া বাতাসী শীতে কাঁপিতেছিল। দুর্ব্বল শরীরে ঘুম তাহার অনেকক্ষণ হইতেই পাইয়াছে; কিন্তু হোঁচট খাইয়া অজ্ঞান হইবার পর প্রথম চোখ খুলিয়া দাক্ষায়ণীর মুখের যে চেহারা সে দেখিয়াছে, তাহার পর তাঁহার সামনে এতটুকু নড়িয়া বসিবার সাহসও তাহার নাই। লোলুপ দৃষ্টিতে উষ্ণ কম্বলটার দিকে তাকাইয়া সে তাই সভয়ে চুপ করিয়া বসিয়াই ছিল। শীত দাক্ষায়ণীরও করিতেছিল; কিন্তু কম্বল গায়ে দিতে গেলে মেয়েটাকেও ডাকিতে হয়; এবং সমস্ত রাত ওই অপবিত্র মেয়েটার সঙ্গে শুইবার কল্পনায় তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিতে পারিতেছিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অত্যন্ত শুষ্ক কণ্ঠে তিনি বাতাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"বসে বসে কাঁপবার কি দরকার! এসে শোও না!"

এ আদেশের ভিতর মমতার লেশমাত্র নাই, এটুকু বাতাসীর পক্ষে বোঝা বিশেষ কঠিন নয়; তবু সসঙ্কোচে সরিয়া আসিয়া বিছানার এক প্রান্তে কম্বলের এক অংশ মাত্র গায়ে দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

দাক্ষায়ণী তাহার গায়ের উপর কম্বলের অন্য দিকটা ছুঁড়িয়া দিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিলেন—"আবার অত ঢঙ কেন? ও কম্বল আমি ছোঁব না। ভাল করে গায়ে দাও।"

বাতাসী কম্বলটা আর একটু টানিয়া লইল, কিন্তু ভালো করিয়া গায়ে দিতে পারিল না।

বাহিরের শীত ও নিজের মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া দাক্ষায়ণী আরও অনেকক্ষণ জাগিয়া কাটাইলেন—বাতাসী ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিছানার এক পাশে বাতাসীর কাছ হইতে সযত্নে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাঁহাকে শুইতেই হইল। কম্বলের এক প্রান্ত গায়ে দিয়া মনে মনে গঙ্গাসাগরে গিয়া স্নান করিয়া এ অশুচিতা দূর করিবেন ইহাই তিনি স্থির করিলেন।

তার পর কখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—মনে নাই। ভোর রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

বাতাসী কখন ঘুমের ঘোরে সরিয়া একেবারে তাঁহার বুকের কাছটিতে ঘেঁসিয়া আসিয়া শুইয়াছে—তাহার একটি হাত তাঁহার কণ্ঠে শিথিল ভাবে লগ্ন।

কেরাসিনের ডিবিয়াটা তখনও তেমনি জ্বলিতেছে। তাহার রক্তিম আলোয় মেয়েটার দিকে চাহিয়া; ওই কোমল মুখ হইতে সেদিন কি করিয়া অমন কুৎসিত কথা বাহির হইয়াছিল, কিছুতেই তিনি ভাবিয়া পাইলেন না—সে মুখে সংসারের ভাবী সর্ব্বনাশিনীর কোন আভাষও নাই।

তবু বহু দিনের সংস্কারে শরীরটা তাঁহার কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কণ্ঠলগ্ন শীর্ণ শুভ্র হাতখানা সরাইতে গিয়াও সরাইতে তিনি কেন জানি না পারিলেন না।

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে বাতাসী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ঘুমন্ত চোখ খুলিয়া প্রথমেই তাহার নজরে পড়িল কম্বলটি তাহার গায়ে বেশ ভালো করিয়া জড়ান। দাক্ষায়ণী ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কি যেন করিতেছেন।

হয় ত সারা রাত্রিই সে কম্বল ও বিছানা দখল করিয়া ছিল,—দাক্ষায়ণীকে হয় ত সারা রাত্রিই এই শীতে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে ভাবিয়া সে ভয়ে ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিতে যাইতেছিল; দাক্ষায়ণী হাত নাড়িয়া তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"থাক্ থাক্! সকালের হিমে উঠে কাজ নেই। হাড় একেবারে কালিয়ে দিচ্ছে!"

তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "তুমি শুয়ে থাক, আমি এক্ষুণি আসছি, কিছু ভয় নেই।"

বাতাসী সবিস্ময়ে আবার শুইয়া পড়িল। দাক্ষায়ণীর স্বরে অপ্রত্যাশিত যে স্নেহের আভাষটুকু ছিল, তাহাতেই অকারণে বাতাসীর কান্না যেন নূতন করিয়া উছলিয়া উঠিয়াছে। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

দাক্ষায়ণী খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল কোথা হইতে ইহারই মধ্যে কোঁচড়ে ভরিয়া মুড়ি ও গোটা কয়েক মোয়া তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

হাসিয়া বলিলেন, "খুব খিদে পেয়েছে—না? নে—তাড়াতাড়ি এবার উঠে মুখটা ধুয়ে আয় দিকি!"

তার পর দরজার কাছে গিয়া সামনের উঁচু পাড় দেওয়া পুকুরটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"ওই যে সামনে পুকুর! একলা যেতে পারবি ত! না—আমি যাব সঙ্গে?"

মৃদুস্বরে "পারব" বলিয়া বাতাসী চলিয়া গেল।

দাক্ষায়ণী পিছন হইতে আর একবার সাবধান করিয়া বলিলেন—"খুব সাবধানে নামিস্—ভারী পেছল কিন্তু!"

দুপুরবেলা সাগর যাইবার নৌকা পাওয়া গেল। দাক্ষায়ণী ইতিমধ্যে গাঙ্গের জলে ভাল করিয়া স্নান করিয়া মেটে হাঁড়িতে সামান্য ভাত ডাল ফুটাইয়া বাতাসীকে খাওয়াইয়া নিজেও কিছু খাইয়া লইয়াছেন। রান্নার ব্যাপারে বাতাসীর সাহায্য তিনি কিছু গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু আগাগোড়া দুইজনের মধ্যে অত্যন্ত সহজে অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ব্যবহারে সাহস পাইয়া বাতাসী মুখ খুলিতে দ্বিধা করে নাই। রান্নার জায়গা হইতে একটু দূরে বসিয়া আগাগোড়া সে নিজে হইতে অনেক কথাই কহিয়াছে—ঝাল সে মোটে খাইতে পারে না, যে লঙ্কাগুলো ছোট হয় সে গুলোর ঝাল বেশী ইত্যাদি—

দাক্ষায়ণী একটু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন "যেমন তুই!"

ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া বাতাসী মুখ নীচু করিয়াছে।

তার পর একটু দূরে দূরে কলাপাতা করিয়া খাইতে বসিয়াও তাহাদের কম কথা হয় নাই।

দাক্ষায়ণী স্নান করার পর ভিজা কাপড়েই রান্না করিয়া খাইতে বসিয়াছিলেন।

বাতাসী জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"ভিজে কাপড়ে শীত করছে না?"

দাক্ষায়ণী একটু হাসিয়া বলিয়াছেন "শীত করলে আর কি করছি বল! তুই ত একটা কাপড় দিবি না।"

বাতাসী বলিয়াছে "আমার কাপড় যে সব ডুবে গেছে।"

"তা না হলে দিতিস—কেমন?"

বাতাসী লজ্জায় আর কিছু বলিতে পারে নাই। খানিক বাদে কিন্তু, তাহার ভাল ডুরে কাপড়টা পরিয়া থাকিলে যে তাহা হারাইত না, ঘরে তাহার যে সত্যকার সিল্কের একটা কাপড় আছে, ইত্যাদি অনেক কথাই সে গল্প করিয়াছে।

এই গল্পের সম্পর্কে বাতাসীর জীবনের আবেষ্টনের কথা বারে বারে স্মরণ হওয়ায় দাক্ষায়ণী একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাতাসীর উপর আগেকার বিরাগ তাঁহার কখন দূর হইয়া গিয়াছে তিনি জানিতেও পারেন নাই।

কিন্তু এত মোলায়েম ভাবে এই দুইটি কক্ষভ্রষ্ট প্রাণীর সম্বন্ধ বেশীক্ষণ গড়িয়া উঠিতে পারে না।

দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে ভরসা পাইয়া বাতাসীর ভয় ও আড়ষ্টতা ক্রমশঃ দূর হইয়া আসিতেছিল।

সাগরে যাইবার নৌকায় উঠিবার সময় হঠাৎ সে মুখ বাঁকাইয়া ঘাড় দোলাইয়া তাহার বয়সের পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল—"আর নৌকোয় উঠতে পারিনে বাবা! জল যেন আমার দুচক্ষের বিষ! বলে আর জলে যাব না সই···"

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত বলিয়াই দাক্ষায়ণীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই আটকাইয়া গেল—ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল।

দেখা গেল দাক্ষায়ণীর মুখ এক মুহূর্ত্তে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বারেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া হন হন করিয়া তিনি সোজা নৌকার উপরে উঠিয়া গেলেন—বাতাসী উঠিতেছে কি না একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

নিজেকেই তিনি বোধ হয় মনে মনে ধিক্কার দিতেছিলেন। কেউটের ছানার আসল রূপ সমস্ত আচরণের

তলা হইতে সহসা প্রকাশ যদি হইয়া থাকে, আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি সব জানিয়া শুনিয়া এ মেয়েটির সুধু মুখখানি দেখিয়া খানিকক্ষণ এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন কেমন করিয়া!

দাক্ষায়ণীর সমস্ত শরীর মেয়েটার কদর্য্য ভঙ্গী স্মরণ করিয়া রি-রি করিতেছিল। দেহে ও মনে তাহার কত দিনের কত মানুষের পাপের ক্লেদ যে সঞ্চিত হইয়া আছে, কে জানে! আর তিনি খানিকটা আগে ইহারই সঙ্গে কি না হাসিয়া কথা কহিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, একটু মায়াই তাঁহার মেয়েটার উপর পড়িতে সুরু হইয়াছিল। তাঁহার পবিত্র পিতৃ ও শ্বশুর কুল স্মরণ করিয়া দাক্ষায়ণী মনে মনে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গঙ্গাসাগরে নামিয়াই এই মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদনের একটা ব্যবস্থা করিবেন, ইহাও তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে ভুলিলেন না।

অত্যন্ত হতাশ মনমরা ভাবে বাতাসী তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল—চোখ দুইটা তাহার জলে তখন ছল ছল করিতেছে। কিন্তু দাক্ষায়ণী দেখিয়াও তাহাকে দেখিলেন না।

বাতাসী তাহার সামান্য বুদ্ধিতে চেষ্টার ত্রুটি করিল না। বড় মহাজনী নৌকা—মাঝি মাল্লা ও তাঁহারা দুইজন ছাড়া যাত্রী একটিও নাই—গঙ্গাসাগরে দোকান খুলিবার জন্য তাহারা নৌকা বোঝাই মাটির খেলনা, পুতুল ইত্যাদি লইয়া চলিয়াছে।

শুধু দাক্ষায়ণীকে কথা কহাইবার জন্যই অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে সে একবার সেই পুতুলগুলির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমার ওই রকম একটা টিয়া পাখি আছে—ওর চেয়েও বড়!"

কিন্তু দাক্ষায়ণী যেমন চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, তেমনই রহিলেন—ঘুমাইতেছেন কি জাগিয়া আছেন বোঝা গেল না।

বাতাসী আর একবার সভয়ে বলিল—"এ নৌকাটা খুব বড়! বড় নৌকা ডোবে না—না?"

দাক্ষায়ণী তেমনি নিরুত্তর।

বাতাসী আর একবার হতাশ ভাবে শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমি খুব ভাল পা টিপতে পারি!"

কিন্তু পায়ে হাত দিতেই পাটা সরাইয়া লইয়া দাক্ষায়ণী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"থাক!"

অপরাধীর মত সসঙ্কোচে হাতটা সরাইয়া লইয়া বাতাসী বিষন্ন মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দাক্ষায়ণীর প্রসন্নতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আর কি করা যায় কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না।

চাপা কান্নায় গলার কাছটায় কি একটা জমাট বাঁধিয়া তাহার নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতেছিল। ভাল করিয়া কাঁদিতে পারিলে বুঝি তাহার খানিকটা তৃপ্তি হইত, কিন্তু সে সাহস তাহার হইল না। শুধু দুটি গাল বাহিয়া নীরবে অজস্র ধারে যে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা সে কোন মতেই নিবারণ করিতে পারিল না।

ধবলাট হইতে গঙ্গাসাগর বেশী দূরে নয়। পালে ভাল হাওয়া পাইয়া তাহাদের নৌকা খুব তাড়াতাড়িই চলিয়া আসিয়াছে। এখন বারদরিয়ার সামান্য একটু অংশ পার হইলেই হয়। কিন্তু এতদূর এমন নির্ঝঞ্ঝাটে আসিবার পর এই খানেই এমন বিপদ ছিল তাহা দাক্ষায়ণী জানিতেন না।

নৌকায় উঠিবার পর অনেকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। তাহার পর বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে উঠিয়া মাঝিদের কাছে গঙ্গাসাগরে থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইয়াছে। সঙ্গের সাথী কেহ নাই—একাই তাঁহাকে যাহা কিছু সব করিতে হইবে। নিজে একলা হইলেও যাহোক ভাবনা ছিল না; সঙ্গে আবার এই মেয়েটা জুটিয়াছে—দাক্ষায়ণীর একটু দুর্ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক।

মেয়েটা এতক্ষণ ধরিয়া বরাবর তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছে; কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাহার দিকে দৃষ্টি দেন নাই।

কিছুক্ষণ হইতে নৌকা একটু দুলিতেছিল। আপাততঃ নৌকার কামরার বাহিরে আসিয়া তাহারই কারণ তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার পায়ের তলা হইতে নৌকাটা যেন মনে হইল সামনে সরিয়া যাইতেছে। বাতাসী 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া পিছন হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে সামনে টানিয়া বুকের কাছে তুলিয়া ভীত পাংশু মুখে দাক্ষায়ণী

চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইল—নৌকা আবার ডুবিতেছে।

মাঝিরা আসিয়া ধরিয়া না ফেলিলে আতঙ্কে তিনি কি যে করিয়া ফেলিতেন বলা যায় না। তাহারা এক রকম জোর করিয়াই তাঁহাদের নৌকোর কামরায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া জানাইল যে, ভয় করিবার ইহাতে কিছু নাই—সাগরের ঢেউ লাগিয়া নৌকা খানিকটা এইরূপ করিবেই।

কিন্তু দাক্ষায়ণী আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে অত্যন্ত অবোধের মত বলিলেন—"আমাদের না হয় কোথাও নামিয়ে দাও বাবা! আমরা না হয় হেঁটেই যাব।"

এখানে যে চারি ধারে জল ছাড়া নামিবার স্থান কোথাও নাই, এবং থাকিলেও, সেই জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে নামার অর্থ যে নিশ্চিত মৃত্যু, এ কথা মাঝিরা তাঁহাকে কোন মতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না।

প্রত্যেক ঢেউএর দোলার সঙ্গে নিতান্ত নির্বোধের মতই তিনি জেদ করিতে লাগিলেন—"আমার কাছে যা আছে সব নাও বাবা, আমাদের নামিয়ে দাও। জঙ্গল হোক যা'হোক, শক্ত মাটি ত বটে,—আমরা যা হোক করে হেঁটে পেরিয়ে যাব!"

অবশেষে কোন মতে বুঝাইতে না পারিয়া মাঝিরা বিরক্ত হইয়া তাহাদের কাজে চলিয়া গেল।

প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া দাক্ষায়ণী পাংশু মুখে সেই ঘরে কাঠা হইয়া বসিয়া রহিলেন। শুধু বাতাসীকে বুক হইতে নামাইবার কথা বুঝি তাঁহার মনেই ছিল না।

গঙ্গাসাগরে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা নিরাপদেই পৌঁছিয়াছেন। যাত্রীদের থাকিবার উপযোগী বালির উপরে হোগলার একটা ঘরও ভাড়া মিলিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের ব্যবস্থা ভাল, দাক্ষায়ণীকে কোন ব্যাপার লইয়া একলা হইলেও বিশেষ বিপদে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষায়ণীর দুশ্চিন্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বাতাসীকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া তিনি আর কূল কিনারা পান না।

মেয়েটা কয় দিনে যেন একেবারে নব জন্ম লাভ করিয়াছে। কে জানে আগেকার জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার গভীর হয় ত ছিল না! যে রকম সহজে সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইয়াছে, তাহাতে সেই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কে বলিবে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে চিরদিনের সম্পর্ক তাহার নয়!

কখন হইতে যে বাতাসী তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে, তাহা দাক্ষায়ণীর স্মরণ হয় না; কিন্তু কেন বলা যায় না—এ ডাক তাঁহার কোথাও আর বেঁধে না।

তাঁহার উঠিবার আগেই ভোর রাত্রে বাতাসী জাগিয়া তাঁহাকে ডাকে—"বাঃ—এখনো ঘুমোচ্ছ! আজ সেই যে সূর্য্যি ওঠবার আগে কি করতে হয় বলেছিলে না!" তাহার পর দাক্ষায়ণীর সাড়া না পাইয়া আর একবার নাড়া দিয়া বলে—"ও মা, শুনছ?"

দাক্ষায়ণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলেন—"তুই কি পাগল! —এখনো সূর্য্যি ওঠবার অনেক দেরী—নে শো!"

তাহার পর শুইয়া শুইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিয়া বলেন—"ও মা, শিশিরে যে একেবারে ভিজে গেছে কম্বলটা। দেখি—গা ভেজেনি ত।"

"না গো না, গা ভিজবে কেন, নীচে আবার একটা চট্ দিয়ে দিলে না শোবার আগে।"

দাক্ষায়ণী আশ্বস্ত হইয়া বলেন—"নে তা হলে শুয়ে পড়।"

বাতাসীর কিন্তু আর শুইবার ইচ্ছা নাই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—"বাবা, ওই বিশমুনী কম্বল আর চট্ গায় দিয়ে শুতে পারি না! ওই ত সবাই উঠে পড়েছে, ওঠ না তুমি।"

শীতের ভিতর সহজে কম্বল ত্যাগ করিতে দাক্ষায়ণীর ইচ্ছা হয় না—চোখ বুজিয়াই বলেন—"বৃষ্টি পড়ছে শুনতে পাচ্ছিস না। ধরুক বৃষ্টি একটু।"

বাতাসী বলে—"আহা, ও বুঝি বৃষ্টি, চাল থেকে শিশিরের জল পড়ছে ত!"

ব্যাপারটা সত্যই তাই; হোগলার বেড়া দেওয়া যাত্রীঘরগুলির চালও হোগলা দিয়া যেমন-তেমন করিয়া ছাওয়া। শীতের সারা রাত্রের শিশিরে তাহা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। সেই চাল ভেদ করিয়াই শিশিরের জল চারি ধারে বালির উপর টপ্‌টপ্ করিয়া পড়িতে থাকে!

অগত্যা দাক্ষায়ণীকে উঠিতেই হয়। বলেন—"গঙ্গা-সাগরের সব পুণ্যি তুই একাই করে নিয়ে যাবি দেখছি!"

বাতাসী সলজ্জ হাসিয়া বলে—'আহা'।

গঙ্গাসাগরে থাকিবার দিন ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে—দু'একদিন দেরী করিলেও দেশে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। বাতাসীকে লইয়া তখন কি করিবেন, দাক্ষায়ণী কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না।

যত আত্মীয়ই সে হইয়া উঠুক, তাহার প্রতি মায়া যে বেশ খানিকটা পড়িয়াছে ইহা অসঙ্কোচে নিজের মনে স্বীকার করিতে বাধা না থাকুক, তাহাকে যে তাঁহার সঙ্গে দেশে লইয়া যাওয়া যায় না, এ কথা দাক্ষায়ণী ভাল করিয়াই জানেন।

মিথ্যা তিনি বলিতে পারিবেন না। পরিচয় গোপন করিয়া ইহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্বশুরকুলের অপমান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। লোকে যদি কিছু সন্দেহ নাও করে, তবু জানিয়া শুনিয়া তাঁহাদের পবিত্র পরিবারে এই কলঙ্কিত-জন্মা মেয়েটিকে তিনি কেমন করিয়া স্থান দিবেন!

বাতাসীকে ছাড়িতেই হইবে; কিন্তু কেমন করিয়া! এ-রকম অনাথ ছেলে-মেয়ের ভার কাহারা লয় কিছুই তাঁহার জানা নাই। জানা থাকিলেও, সেখানে বাতাসীর অনিষ্ট হইবে না, এ কথা তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস হইত না।

দুর্ভাবনায় দাক্ষায়ণীর সমস্ত সমস্ত মাথার ঠিক থাকে না।

বাতাসী কথা কহিয়া জবাব পায় না।

দাক্ষায়ণী হঠাৎ হয় ত রুক্ষ স্বরে বলেন—"জ্বালাতন করিসনি, ভাল লাগে না বাপু! দুদণ্ড সোয়াস্তি পাবার উপায় নেই, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি তোকে নিয়ে।"

বাতাসী নীরব হইয়া যায়, শুধু চোখ দুইটা তাহার অল্পেই সজল হইয়া আসে।

খানিক বাদে কি ভাবিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া দাক্ষায়ণী আবার বাহির হইয়া পড়েন। এটা সেটা দেখাইয়া, নানান গল্প করিয়া আবার বাতাসীর মুখে হাসি ফুটাইতে তাঁহার দেরী লাগে না।

এক এক সময়ে তাঁহার মনে হয়, বাতাসীর জন্য এত ভাবিবার দায়ই বা তাঁহার কিসের? কোথাকার কলুষিত সমাজের একটা মেয়ে, দৈবাৎ কয়েক দিনের জন্য তাহার জীবন তাঁহার সহিত জড়াইয়া গেছে মাত্র। এ বন্ধনকে স্বীকার করিবার কোন দায়ীত্বই ত তাঁহার নাই। তাঁহার সঙ্গ না পাইলেও বিধাতার সংসারে তাহার একটা কোন কিনারা হইতই,—আজ তিনি তাহাকে ছাড়িয়া গেলেও তাহার যেমন হোক একটা আশ্রয়ের অভাব হইবে না! আর পাপের পঙ্কের মধ্যে যে আশৈশব লালিত, তাহার পক্ষে আর আশ্রয়ের ভালো-মন্দ কি?

স্নানের যাত্রীদের ভিড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে দাক্ষায়ণীর মনে হঠাৎ অদ্ভুত এক খেয়ালের উদয় হয়। এই গঙ্গা-সাগরেই তাহাকে ফেলিয়া কোনরকমে লুকাইয়া তিনি ত বেশ চলিয়া যাইতে পারেন। যাহার সহিত অতীতে কোন সম্বন্ধ ছিল না, ভবিষ্যতে যাহার সহিত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না, তাহাকে এ ভাবে পরিত্যাগ করার ভিতর অন্যায়ও ত কিছু নাই। সব সমস্যার অতি সহজেই তাহা হইলে মীমাংসা হইয়া যায়, দুর্ভাবনার গুরু ভার নামাইয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারেন।

ভীড় ঠেলিয়া অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দাক্ষায়ণীর নজরে পড়ে বাতাসী তাঁহার পিছনে নাই! এই খানিক আগেও তাহাকে পিছুপিছু আসিতে যে তিনি দেখিয়াছেন! না, এ নির্বোধ মেয়েটাকে লইয়া আর পারা গেল না,—পথ চলিতে চলিতে চারি দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকা তাহার ভারী বদ্ স্বভাব। একটু অসাবধান হইলেই সে পিছাইয়া পড়ে। দাক্ষায়ণী খানিক দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেন। কিন্তু তবু বাতাসীর দেখা নাই। এবার তাঁহার রাগ হয়। পই পই করিয়া এ কয় দিন তিনি তাহাকে রাস্তায় সঙ্গ-ছাড়া হইতে বারণ করিয়াছেন! অজানা অচেনা জায়গায় বয়স্ক লোকেরাই পথ চিনিতে হায়রাণ হয়। চারি দিকে একই ধরণের হোগলার কুঁড়ের সার,—একটার সঙ্গে আর একটার কোন তফাৎ নাই। ইহার ভিতর একবার হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করা কি কম কষ্টকর!

দাক্ষায়ণী একটু আগাইয়া যান। তবু বাতাসীর পাত্তা নাই। এবার তাঁহার ভয় হয়। হাবা মেয়েটা

এই ভীড়ের ভিতর কোন্ দিকে যাইতে কোন্ দিকে গিয়াছে কে জানে! একলা ত সে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবেই না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও যে করিবে সে উপায় ত নাই। মাঝির নামেই এখানকার বসতির পরিচয়—সে নাম ত সে জানে না।

দাক্ষায়ণী চীৎকার করিয়া ডাকেন—"বাতাসী"। সাড়া না পাইয়া তিনি আরো অগ্রসর হইতে থাকেন। স্নান হইতে যাহারা ফিরিতেছে তাহাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সুবিধা হয় না। দাক্ষায়ণী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন।

শেষ পর্য্যন্ত বাতাসীকে সেদিন পাওয়া যায়।

অনেক খোঁজার পর হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে একটা দোকানের ধারে কয়েকটা লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচামেচি করিতেছে। ভীড় সরাইয়া মুখ বাড়াইতেই রোরুদ্যমানা বাতাসী একেবারে ঝাঁপাইয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে।

এতক্ষণের উদ্বেগ ও আশঙ্কা এবার দাক্ষায়ণীর রাগে পরিণত হয়। ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া তিনি বলেন,—"বলেছিলুম না আমার হাত ছাড়িয়ে যাস্‌নি! আর যাবি একলা!"

আশপাশের লোকেরা তাড়াতাড়ি নিষেধ করিয়া বলে—"আহা মেরো না, মেরো না, মেয়েটা এতক্ষণ কেঁদে একেবারে সারা হয়েছে!"

একজন বলে,—"কিন্তু কি হাবা মেয়ে তোমার মা! অতবড় মেয়ে তা জিজ্ঞেস করলে কারু পরিচয় বলতে পারে না! শুধু বলে মার সঙ্গে এসেছি।"

বাতাসী কিন্তু এ চড় বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া দাক্ষায়ণীর কোলের কাছে মুখ লুকাইয়া একসঙ্গে অশ্রু ও হাসিমাখা মুখে বলে—"তুমি এগিয়ে গেলে কেন?"

একটু নির্জনে আসিয়া দাক্ষায়ণী জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, আজ যদি তোকে ফেলে পালিয়ে যেতুম?"

বাতাসী হাসিয়া, বড়বড় চোখ দুইটা তাঁহার মুখের পানে পরম নির্ভরতায় তুলিয়া ধরিয়া বলে, "ঈস্"।

সেদিন রাত্রে বাতাসী আর কিছু খাইতে চাহিল না। একটু সর্দ্দির সঙ্গে চোখ দুইটা তাহার লাল হইয়াছে। দাক্ষায়ণী গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—একটু উত্তাপ আছে। খাওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি তিনি করিলেন না।

রাত্রে হোগলার ছাউনিতে হিম আটকায় না। ভাল করিয়া তাহাকে গরমে রাখিবার জন্য দাক্ষায়ণী একটা বাড়তি কম্বল কিনিয়াই আনিলেন। কিন্তু দেখা গেল জ্বর তাহার বাড়িয়াছে।

সকালে তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে দাক্ষায়ণী একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। দেহে অসহ্য উত্তাপ, মুখ চোখ ফুলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। জ্বরের ঘোরে বেহুঁস হইয়া বাতাসী তখন ভুল বকিতেছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের স্থাপিত সেবাশ্রম হইতে একজন প্রতিবেশী দয়া করিয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া দিল। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে দাক্ষায়ণীর বুক একেবারে শুকাইয়া গেল।

কঠিন নিউমোনিয়া! বাতাসীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

হাসপাতালের প্রতি দাক্ষায়ণীর আজন্ম অবিশ্বাস। তিনি কিছুতেই রাজী হইতে চাহেন না। ডাক্তার বুঝাইল যে এ রোগের জন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় যেরূপ সতর্ক শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন তাহা দাক্ষায়ণীর অস্থায়ী আবাসে হওয়া অসম্ভব। মেয়েকে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিলে হাসপাতালে দেওয়াই উচিত।

শেষ পর্য্যন্ত দাক্ষায়ণীকে বাতাসীর কথা ভাবিয়াই রাজী হইতে হইল। স্বেচ্ছাসেবকরা আশ্বাস দিয়া গেল যে ভয়ের কোন কারণ নাই। সেখানে থাকিতে না পারিলেও যখন খুশী তিনি গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিবেন। তাঁহার মেয়ের শুশ্রূষারও ত্রুটি হইবে না।

হাসপাতাল পর্য্যন্ত বাতাসীকে পৌঁছাইয়া আসিয়া দাক্ষায়ণী যখন পথে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, তাঁহারও দেহ মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। আজ স্নানের শেষ দিন। অসংখ্য যাত্রী ঠেলাঠেলি করিয়া সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছে। ভীড়ের ভিতর মন্ত্র-চালিতের মত তিনিও সেই দিকে চলিলেন; কিন্তু মনে হইল, এসব কিছুরই যেন তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। সামান্য একটা অপরিচিত মেয়ে কয় দিনের পরিচয়ে তাঁহার সমস্ত জীবনের ধারা যেন বদলাইয়া

দিয়াছে। নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, পুণ্য কিছুরই যেন আর সে অর্থ নাই।

পদে পদে আজ ফিরিয়া বাতাসী আসিতেছে কি না দেখিবার প্রয়োজন নাই। দণ্ডে দণ্ডে কাহারও অনর্গল প্রশ্নের জবাব দিতে আজ বিব্রত হইতে হয় না। স্নান করিতে গিয়া বেশী ডুব দিয়া ফেলিল কি না, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বেশী দূরে গিয়া পড়িল কি না, সাঁতার কাটিবার নিষ্ফল চেষ্টায় পাশের কাহারও গায়ে জল ছিটাইয়া স্নানের বিঘ্ন ঘটাইল কি না, এ সব সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিবার দায় হইতে তিনি মুক্ত, নির্বিঘ্নে পুণ্য কাজ সারিবার কোন বাধাই আজ নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনে হয়, বুঝি পুণ্যের সব আকর্ষণও তাঁহার গিয়াছে।

স্নান করিয়া উঠিবার পর তাঁহার মন কিন্তু কতকটা যেন শান্ত হয়। মনে হয়, মায়া তাঁহার যত বেশীই হোক, বাতাসীর জীবন-দীপ যদি এমনি করিয়াই নিভিয়া যায়, তাহা হইলেও দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু তাঁহার নাই। কিছু দিন বাদেই ত তাঁহাকে যেমন করিয়া হোক এই হতভাগিনী মেয়েটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইত, তাহার পর এই নিষ্ঠুর উদাসীন সংসারে, ওই অনাথ অসহায় মেয়েটির জীবন পাপ ও গ্লানির কোন্ অন্ধকার অতলে তলাইয়া যাইত কে বলিতে পারে! কলুষের মধ্যে যার জন্ম, পাপের বীজ যাহার মধ্যে হয় ত সুপ্ত হইয়া আছে, সংসারের বিষতরু রূপে পল্লবিত হইয়া উঠিবার পূর্ব্বে এই নিষ্কলুষ শৈশবে বিধাতা যদি তাহাকে ডাকিয়া লন—তাহা হইলে দুঃখ করিবার সত্যই যে কিছুই নাই।

বাঁচিলে যখন তাহার অশেষ দুর্গতি, তখন বাতাসীর মরাই ভালো।

কিন্তু এত কথা ভাবা সত্ত্বেও মেলার বাজার হইতে ফিরিবার সময় দেখা যায় দাক্ষায়ণীর দুই হাত খেলনায় ও পুতুলে বোঝাই।

* *
*

বেলা যত বেশী বাড়িতে থাকে, দাক্ষায়ণী তত বেশী অস্থির হইয়া ওঠেন। এবং সমস্তক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মনের ভিতর যে আলোড়ন চলে, তাহার খবর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই বুঝি জানিতে পারে না। বাতাসীর মরাই ভাল। কিন্তু সে মরিতেছে ভাবিয়া তাঁহার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। তাঁহার বিশ্ব-সংসার ঐ মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া কখন হইতে ঘুরিতে সুরু করিয়াছে, তিনি জানিতেও পারেন নাই।

বিকাল হইতে না হইতেই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। সমস্ত সংস্কারের চাহিতে যাহা পুরাতন—সমস্ত ধর্ম্মের অপেক্ষা যাহা প্রবল, সেই মাতৃত্বের বিপুল আকাঙ্ক্ষার প্লাবনে তাঁহার মনের সমস্ত সঙ্কীর্ণ সীমার বেড়া তখন ভাঙিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। বিধাতার কাছে বার বার আকুল ভাবে বাতাসীর জীবন-ভিক্ষা চাহিয়া তিনি মনে মনে বলিয়াছেন—বাতাসী তাঁহার বাঁচুক, তাহাকে লইয়া সমস্ত সংসারের নিন্দা, অপবাদের বোঝা তিনি নির্ভয়ে মাথা পাতিয়া লইবেন। শ্বশুর-বাড়ীতে স্থান না হয় তিনি তাহাকে লইয়া তাঁহার বাপের বাড়ী বা যেখানে খুশী চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সে আগে বাঁচুক।

কিছুক্ষণ আগে বাতাসীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ভাবিয়াছিলেন বলিয়া নিজের প্রতি তাঁহার ঘৃণার আর সীমা থাকে না। পথে যাইতে যাইতে অনেক কথাই তাঁহার মনে হয়। বাতাসীর যে কলুষের মধ্যে জন্ম তারই বা প্রমাণ কি? গণিকারা নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য ভদ্র পরিবারের ছোট মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া আসে, এ কথা তিনি শুনিয়াছেন। বাতাসী যে তেমনি কোন সদ্‌বংশের মেয়ে নয়—তাই বা কে বলিতে পারে? সদ্বংশে জন্ম না হইলে এত শীঘ্র তাহার এমন পরিবর্ত্তন হইত না, এই কথাটাই বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে হয়। যে অপরাধ তাহার নয়, ভাগ্যের দোষে তাহারই শাস্তি তাহাকে সারা জীবন বহন করিতে হইবে, এ কথায় এখন দাক্ষায়ণীর মন আর কিছুতেই সায় দিতে পারে না। যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, হোক, বাতাসীকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করিয়া একাকী তিনি দেশে ফিরিবেন না, তাহাকে সঙ্গেই লইয়া যাইবেন এই তিনি সঙ্কল্প করেন।

প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলিয়া সাগরের যাত্রীদের হাসপাতাল বসান হইয়াছে। দাক্ষায়ণী তাহার আশে পাশে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করিয়াও কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পান না।

কি যে শুনিতে হইবে কে জানে। আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিতে থাকে। অবশেষে অনেক কষ্টে একজন স্বেচ্ছাসেবককে তিনি ভয়ে ভয়ে বাতাসীর কথা জিজ্ঞাসা করেন।

ছেলেটি সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। "আপনি দেখতে চান ত তাকে? একটু দাঁড়ান, আমি খোঁজ নিয়ে আসি" বলিয়া তার পর ছেলেটি চলিয়া যায়।

দাক্ষায়ণী কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করেন। কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়া যায়, ছেলেটির আর দেখা মেলে না। দাক্ষায়ণী ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্থির হইয়া ওঠেন। কেন তিনি ইহাদের কথা শুনিয়া হাসপাতালে পাঠাইতে রাজী হইয়াছিলেন ভাবিয়া তাঁহার আপশোষের আর সীমা থাকে না।

ডাক্তার বলিয়াছিল—দেখা করিবার কোন অসুবিধাই হইবে না। এখন এই দেরী দেখিয়া ইহাদের সমস্ত ব্যাপারের উপর তাঁহার গভীর অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। কে জানে হয় ত কোন শুশ্রূষাই ইহারা বাতাসীর করে নাই। হয় ত রুগ্ন মেয়েটাকে অবহেলায় কোন কোণে ইহারা ফেলিয়া রাখিয়াছে, তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল দিবারও সেখানে লোক নাই। দাক্ষায়ণীর মন রাগে দুঃখে দুর্ভাবনায় কেমন যেন করিতে থাকে। ইচ্ছা হয় এই কাপড়ের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া তিনি জোর করিয়া বাতাসীকে ছিনাইয়া লইয়া আসেন। বাতাসী ইহাদের ঔষধ না খাইয়াও বাঁচিবে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পান, ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সেই ছেলেটি তাঁহারই দিকে আসিতেছে।

তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবার আগেই তাহাদের মুখ দেখিয়া আর কিছু বুঝিতে বাকী থাকে না। কাঠ হইয়া তিনি কোন মতে দাঁড়াইয়া থাকেন। পাথরের মত নিস্পন্দ তাঁহার মুখ দেখিয়া তাঁহার বেদনার কোন পরিমাণই করা যায় না।

ডাক্তার আমতা আমতা করিয়া যাহা বলে, তাহার সব কথা তাঁহার কাণে যায় না, প্রয়োজনও নাই।

ডাক্তারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করেন। বাতাসীকে শেষ দেখা দেখিতে পর্য্যন্ত তিনি চাহেন না।

ডাক্তার তাঁহার সঙ্গে একটু আগাইয়া আসিয়া বলে—"আর একটু দরকার আছে আপনাকে। আপনার মেয়ের দাহ আমরাই করব। একটু পরিচয় তাই দিয়ে যেতে হবে।"

দাক্ষায়ণী ফিরিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—"পরিচয়?"

"হ্যাঁ, এই বয়স, বাপের নাম,—এই সব।"

দাক্ষায়ণী খানিক চুপ করিয়া থাকেন, তার পর সুপবিত্র মুখুজ্যে পরিবারের বড়বৌ, জীবনের সমস্ত সংস্কার ও শিক্ষা ভুলিয়া যাহা করিয়া বসেন তাহাতে তাঁহার শ্বশুরকুলের চতুর্দ্দশ পুরুষ সুদূর স্বর্গের সুখবাসে শিহরিয়া ওঠেন কি না জানি না, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে জীবন-দেবতার মুখ বুঝি প্রসন্নই হইয়া ওঠে।

বলেন,—"সব ত মুখে বলতে নেই। দিন লিখে দিচ্ছি।"

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ফিল্‌ম ব্যবসায়ে আমেরিকা ও য়ুরোপ

ব্যবসায়ের দিক দিয়ে আমেরিকার বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি একই স্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে কাজ করবার জন্য প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল ১৯২২ সালে। 'প্রকৃত-পক্ষে' বললুম এই জন্যে যে ১৯১৫ সালে নিউইয়র্কে একটি "মোশন পিক্‌চার বোর্ড অফ্ ট্রেড্" গঠিত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু তারা কোনো কাজই করতে পারেনি। তার পর ১৯১৭ সালে আবার "ন্যাশান্যাল এসোসিয়েশন অফ্ দি মোশন পিক্‌চার ইণ্ডষ্ট্রী" নাম দিয়ে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়, কিন্তু তারাও আগের বারের মতো নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেই পড়ে ছিল। তার পর বারম্বার যখন এই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে নানা জালজুয়াচুরী ও অপ্রিয় ঘটনা সব ঘটতে লাগ্‌লো তখন "মোশন পিক্‌চার প্রোডিউসার্স এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটার্স অফ্ আমেরিকা" নাম দিয়ে ১৯২২ সালে একটি পঞ্চায়েৎ গড়ে উঠলো এবং তার মোড়ল-পদে

নিযুক্ত হ'লেন মিঃ উইল্ হেজ্ (Will Hays)। শ্রীযুক্ত উইল হেজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের কাজ করছিলেন। এই উচ্চ পদে তিনি ইস্তফা দিয়ে উক্ত সমিতির কর্তৃত্বভার গ্রহণ ক'রলেন। তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানের গুণে এই সমিতি শীঘ্রই কার্য্যকরী ও শক্তিশালী হয়ে উঠলো। আমেরিকার সমস্ত চলচ্চিত্র সম্প্রদায় এই সমিতির নির্দ্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হ'লেন।

লিলিয়ান জিস্

কেবলমাত্র ব্যবসায়ের দিক দিয়েই নয়, চলচ্চিত্রের জন্য উপযুক্ত বিষয় নির্ব্বাচন, আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র কোম্পানীদের সঙ্গে এই ব্যবসায় সম্বন্ধে সম্পর্ক স্থাপন, চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, 'সেন্সার-শিপ্' অর্থাৎ কোন্ ছবি জনসাধারণকে দেখানো চলতে পারে এবং কোন্ ছবি বা কোন্ ছবির কোন্ কোন্ অংশ জনসাধারণকে দেখানো হ'তে পারে না এটা নির্দ্দেশ করে দেন যে কর্ত্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা, এবং চলচ্চিত্র কোম্পানীর ইনকম্ ট্যাক্স্ নিয়ে সরকারের সঙ্গে লড়া প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় দিক নিয়ে উক্ত সঙ্ঘ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য ক'রতে লাগলো।

১৯২৫ সাল থেকে চলচ্চিত্র ব্যাপারের আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ নিয়ে একাধিক গোলযোগের সৃষ্টি হ'তে সুরু হয়, চিত্রশিল্প ও ব্যবসায়ের স্বার্থের দিক ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক, ও সমাজনৈতিক সমস্যা নিয়েও গুরুতর গণ্ডগোল আরম্ভ হয়। বিভিন্ন দেশের গভর্মেণ্ট ও সংবাদপত্রসমূহও এই নিয়ে খুব হৈ চৈ ক'রতে থাকে। পটের উপর আমেরিকার ক্রমে একচেটে অধিকার দাঁড়িয়ে যাচ্চে দেখে য়ুরোপ এই সময় হঠাৎ সচকিত হ'য়ে ওঠে! আমেরিকার অধিবাসীদের স্বার্থের স্বপক্ষে এই চলচ্চিত্র ব্যবসায় যে কত দিক দিয়ে সাহায্য ক'রছে, ক্রমাগত তাদের জীবনী ও কার্য্যকলাপের বিবিধ চিত্তাকর্ষক পরিচয় বিজ্ঞাপিত ক'রে এই সব আমেরিকান্ ছবি য়ুরোপের জনসাধারণের মনের উপর যে কতখানি প্রভাব বিস্তার ক'রছে, এবং আমেরিকার অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যের কত বেশী সুবিধা ক'রে দিচ্ছে এটা বুঝতে পেরে য়ুরোপ শঙ্কিত হয়ে উঠলো। কেবলমাত্র য়ুরোপই বা কেন, এশিয়া, আফ্রিকার মত মহাদেশ এবং অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি উপনিবেশগুলিও সিনেমা-দূতীর মধুর আকর্ষণে মুগ্ধ হ'য়ে ধীরে ধীরে আমেরিকার প্রেমে আত্মোৎসর্গ ক'রছে দেখে চারিদিকে তুমুল আন্দোলন সুরু হ'য়ে গেলো! বহু বাক্‌বিতণ্ডা তর্ক ও বিচারের পর বিভিন্ন দেশের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই রফা করলেন যে প্রতি সপ্তাহে আমেরিকান ছবির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক 'ছবিঘর'-ওয়ালাকে, তাদের স্ব-স্ব-দেশের প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছবিও দেখাতে হবে। একে বলে 'কোটা' প্রথা

(Quota System)। আমেরিকা এই 'কোটা' প্রথার কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে য়ুরোপের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীদের আমদানী ক'রে ছবির কাজে লাগালে এবং নিজেদের সম্প্রদায়কেও বিদেশে কাজ ক'রতে পাঠালে যাতে তাদের ছবিগুলিকে আর নিছক্ আমেরিক্যান ব'লে কোনো দেশের কর্ত্তৃপক্ষ বাতিল ক'রতে না পারে। এই উপায়ে আমেরিকা তার চলচ্ছবির একটা আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা লাভ সম্ভব ক'রে তুলেছিল।

এরিফ ভন ষ্ট্রোহীম, তাঁহার পত্নী ও পুত্র

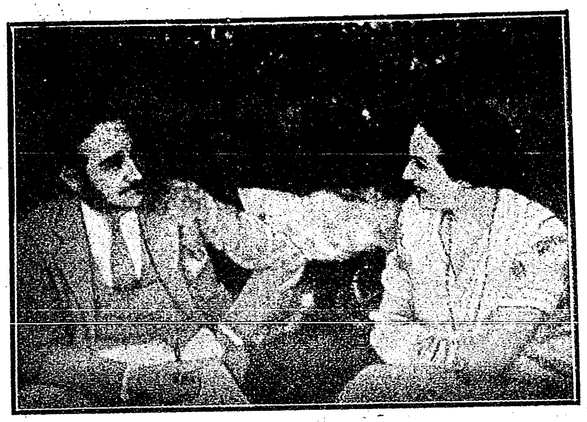

মিঃ ও মিসেস মেঞ্জু। শ্রীমতী মেঞ্জু চিত্রশিল্পে সুদক্ষা

এডল্‌ফ্—গৃহে

"কোটা প্রথা" প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপ আবার চলচ্চিত্র শিল্প গ'ড়ে তোলবার জন্য উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স্ ও জার্ম্মাণীতে আবার একে একে অনেকগুলি ছোট বড় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান ভূমিষ্ঠ হ'ল। কিন্তু অর্থ-সামর্থ্য কারুরই তেমন ভালো ছিলনা। যাই হোক্, কয়েক মাসের মধ্যেই য়ুরোপের তৈরী খানকয়েক চলনসই ছবি বাজারে দেখা দিলে। ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর কোন কোন ছবি প্রতিযোগিতায় আমেরিকার ছবির চেয়ে ভালই হ'য়েছিল বলা যেতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ ফিলম্ আমেরিকান্

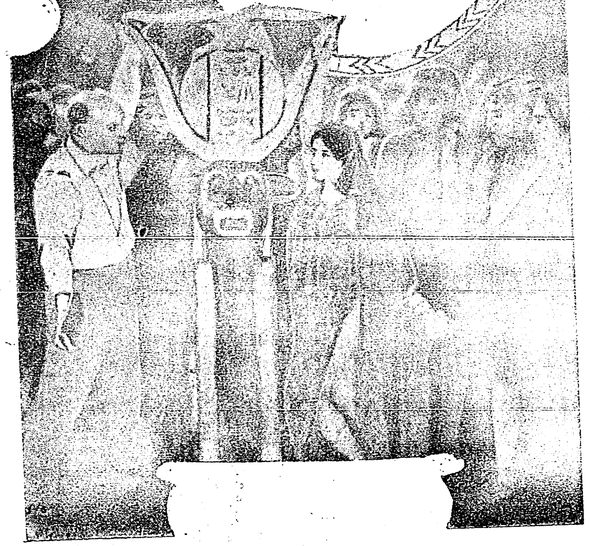

সিসিল বি, ডি মিলি স্বর্ণ-গোবৎসের কপট উপাসনার চাতুর্য্য সম্বন্ধে এষ্টেলি টেলরকে উপদেশ দিচ্ছেন

ছবির চেয়েও নিরেশ হ'য়ে পড়্‌লো। তার কারণ সেখানে কোনো চিত্র প্রতিষ্ঠানই বেশ চারি দিক গুছিয়ে নিয়ে কাজ

সুরু ক'রতে পারেনি। মাথাওয়ালা ভালো পরিচালকেরও তাদের একান্ত অভাব ছিল। তবু, ব্রিটিশ ফিল্মকে বাজারে সচল ক'রে তোলবার জন্য বিধিমতে ঢক্কা-নিনাদ সুরু করা হ'ল। কাগজে পত্রে ভালো ভালো নামজাদা লোকদের ধ'রে ব্রিটিশ ফিল্ম সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ লেখানো চ'লতে লাগলো।

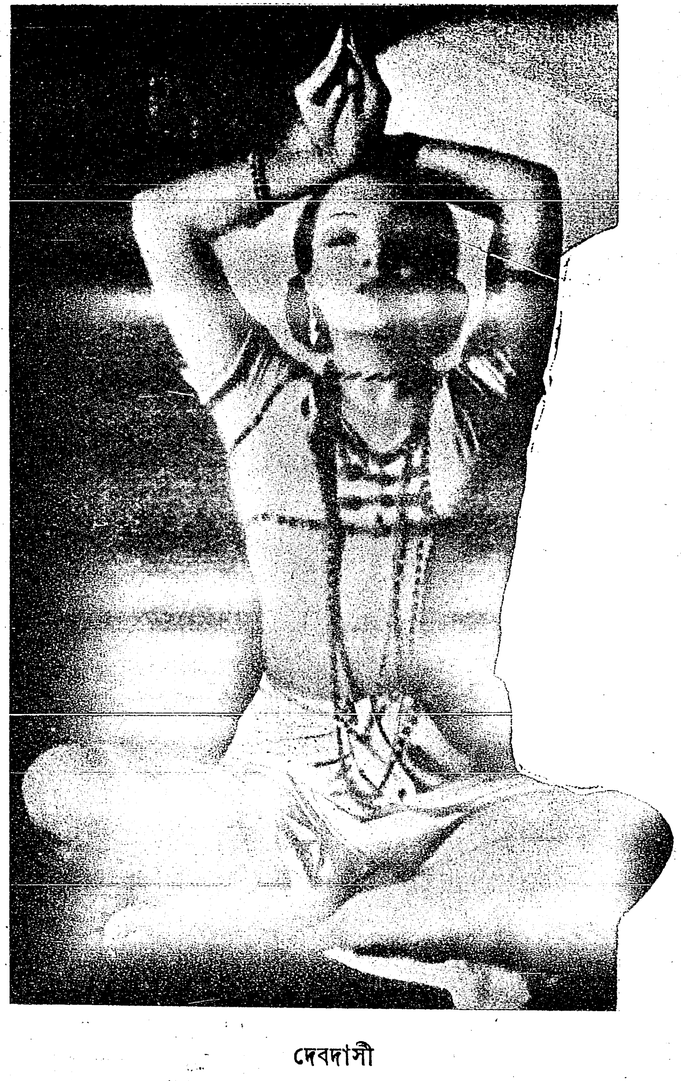

দেবদাসী

ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্যবসায় নিয়ে 'হাউস্ অফ্ লড্‌স্' ও 'হাউস অফ্ কমন্‌স্' উভয় সভায় একাধিকবার তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা করা হ'লো, বিদেশী ছবিওয়ালাদের ব্যবসা-সংক্রান্ত ঘৃণিত উপায়ে তীব্র নিন্দাবাদ চলতে লাগলো, আমেরিকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কুৎসা ও দুর্নামও প্রচার করা চলতে লাগলো, এবং দেশের ও জাতের কল্যাণ ও মঙ্গলের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে খুব একটা জোর আন্দোলন আরম্ভ করা হ'ল। মাসের পর মাস কাগজওয়ালারা জোর গলায় ব'লতে লাগলো, যে রকম আয়োজন উদ্যোগ করে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি ছবি তুলতে লেগেছে তাতে সে ছবি যে কী রকম উৎকৃষ্ট হবে সে কথা বলাই বাহুল্য!

এই রকম ধারাবাহিক বিপুল বিজ্ঞাপনের ফলে জনসাধারণে খুব একটা আশা ও আগ্রহের সঙ্গে ব্রিটিশ ফিল্মের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা ক'রেছিল। তার পর একে একে যখন ছবিগুলি পটের উপর দেখা দিতে সুরু ক'রলো, দর্শকেরা সে ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে এটা স্থির জেনেই ভীড় ক'রে ছবিঘরে ছুটলো, কিন্তু, ছবি দেখে তারা হতাশ হ'য়ে ফিরে এলো! বিরাট মিথ্যা বিজ্ঞাপনের স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্প বে-আবরু হ'য়ে প'ড়লো। ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট আইন করে এই বিধি প্রবর্ত্তিত করলেন যে প্রত্যেক ফিল্ম-ব্যবসায়ী ও 'ছবিঘর'ওয়ালারা অন্ততঃপক্ষে শতকরা পাঁচখানা ক'রে ব্রিটিশ ফিল্ম বেচ্‌তে ও দেখাতে বাধ্য হবে—তা' সে ফিল্ম্ যেমনই হোক্ না কেন, তাতে কিছু আসে যায়না। জার্ম্মাণী এবং ফ্রান্সও ততোধিক কড়া আইন-কানুন ও বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করলেন। যদিও জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের একটা মস্ত সুবিধা ছিল এই যে ওদের জনসাধারণ নিজেদের দেশের তোলা ছবি নিরেশ হ'লেও বিদেশী ছবির চেয়ে তারই আদর ক'রতো বেশী; তাছাড়া, জার্ম্মান্ ও ফরাসী ছবি ব্রিটিশ ফিল্মের চেয়ে অনেকগুণে ভালোও হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের 'ছবিঘর'ওয়ালারা কিন্তু ব্রিটিশ ছবি দেখিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। সে ক্ষতি তার পরের সপ্তাহে আমেরিক্যান ছবি দেখিয়ে তারা পূরণ করে নেবার চেষ্টা ক'রতো। কেউ

কেউ আবার 'কোটা-আইন' অমান্য করেই আমেরিক্যান ছবি দেখাতো, কারণ আমেরিক্যান ছবি দেখিয়ে আইনভঙ্গ করার অপরাধে তাদের যা জরিমানা হ'ত, সে জরিমানার টাকা জমা দিয়েও তাদের লাভ থাক্‌তো যথেষ্ট।

সিসিল বি, ডি মিলি ও শ্রীমতী বেষ্ট্

কাজেকাজেই কিছুদিন যেতে না যেতে ছোট ছোট ব্রিটিশ চলচ্চিত্র কোম্পানী গুলি লোপ পেয়ে গেলো।

রেক্স ইনগ্রাম ও এডওয়ার্ড শ্লোমান! ইঁহারা উভয়েই প্রসিদ্ধ ছবিঘর-পরিচালক

তখন যে ক'টি বড় দল অবশিষ্ট রইল, তারা সব ভালো ভালো বিদেশী অভিনেতা অভিনেত্রীদের আনিয়ে এমন সব ছবি তুলতে সুরু করলে যা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠতে পারে ও যা থেকে দু'পয়সা লাভ হ'তে পারে এবং তাদের কোম্পানী গুলিও দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

ঠিক এই সময়ে আমেরিকা তার নীরব চলচ্চিত্রকে সবাক্ ক'রে তোলবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। এই সুযোগে বড় বড় চারটি ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান—"ইণ্টারন্যাশানাল," "গ্যমণ্ট্ ব্রিটিশ," "ব্রিটিশ ইন্স্‌ট্রাক্‌শ্যানাল" এবং "গ্যেন্‌স্‌বরো ফিল্ম কোম্পানী" আমেরিকান পদ্ধতি অবলম্বনে ইংলণ্ডের বাজারে অনেকখানি জনপ্রিয় হ'য়ে উঠতে পেরেছিল।

ব্ল্যাঙ্কি সুইট ও টমাস ইন্‌স

অন্যান্য দেশেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটছিল! তাদের যে সব ভালো ভালো লোককে হোলিউড্ হরণ ক'রে নিয়ে গেছলো তারা সব একে একে তাদের চুক্তি শেষ ক'রে দেশে ফিরতে আরম্ভ করেছিল। তাদের ফিরে পেয়ে সে সব দেশে আবার নব উদ্যমে ছবি তৈরী সুরু হয়েছিল। কিন্তু, দর্শকের দল তখন সকল দেশেই ক্রমাগত একই রকম ছবি দেখে দেখে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। সিনেমা আর তেমন করে তাদের চিত্তাকর্ষণ করতে পারছিলনা। একটা কিছু নূতনত্ব ক'রতে না পারলে যে তাদের আর বেশী দিন ছবিঘরে টেনে আনতে পারা যাবেনা, এ কথাটা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা

ভাব্‌তে সুরু করেছিল। এমন সময় আমেরিকা এতদিনের মূকচিত্রকে মুখর ক'রে তুলে চলচ্চিত্র জগতে একটা নূতন সাড়া জাগিয়ে তুললে! আমেরিকার "ওয়ার্ণার্স ব্রাদার্স"

এরিক ভন ষ্ট্রোহীম ও মিস ডিউ পণ্ট
"নির্ব্বোধ স্ত্রী" নাটকের একটি দৃশ্য

সর্ব্বপ্রথম সবাক্‌চিত্র তুলে আশাতীত সাফল্যলাভ ক'রলে দেখে অবিলম্বে আমেরিকার অন্যান্য চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলিও

রেক্স ইনগ্রাম—প্রসিদ্ধ প্রযোজক

তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রলে। য়ুরোপের নীরব ছবির ব্যবসায়ীরা সবাক্ চিত্রের আর্বিভাবে আবার একবার ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়লো। প্রথম সবাক্ ছবি—"সিঙিংঙ্ যুল" দেখবার জন্য যেরকম বিপুল দর্শকের ভীড় হ'তে আরম্ভ হ'ল তাতে মূক ছবিঘরওয়ালারা একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লো! আমেরিকা এগিয়ে এসে তাদের এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ করলে। তাদের নীরব চিত্র-গৃহগুলিকে তারা নিজেদের 'সকাক্ যন্ত্র' ও ছবি দিয়ে একে একে মুখর ক'রে তুলতে লাগলো। এমনি ক'রে চলচ্চিত্র জগতে দ্বিতীয়বার আমেরিকা তার একাধিপত্য বিস্তার ক'রে নিলে।

বারবার তিনবার আঘাত পেয়ে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা এবার কোমর বেঁধে 'সবাক্ ছবি' তৈরি ক'রতে লেগে গেলো। 'সবাক্' ছবির আবির্ভাব ইংল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের নূতন করে আবার একটা মস্ত সুযোগ এনে দিলে! এবার এই ছবির কারবারে তাদের কৃতকার্য্য হবার আশা হল।—"ব্রিটিশ ইণ্টারন্যাশানাল্ পিক্‌চার্স কোম্পানী" 'শ্রীযুক্ত আলফ্রেড্ হিচ্‌ককের' পরিচালনায় তাদের প্রথম সবাক ছবি "ব্লাকমেল" তৈরী ক'রে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলে। নিউইয়র্কের কাগজেপত্রে সে ছবির প্রশংসা বেরুলো। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞেরা অভিমত দিলেন যে—হ্যাঁ এ ছবি প্রায় আমেরিকার ছবিরই সমকক্ষ হয়েছে বলা চলে; কিন্তু, এমনি মজা যে এই কাগজপত্রের প্রশংসা ও বিশেষজ্ঞদের অভিমত সত্ত্বেও নিউইয়র্কের কোনো ছবিঘরই সে ছবি কিনে বা ভাড়া নিয়ে দেখালে না। শেষে কোম্পানী বাধ্য হ'য়ে সেখানকার একটি থিয়েটার ভাড়া নিয়ে সেই ছবি নিউইয়র্কের জনসাধারণকে দেখাবার ব্যবস্থা করলে। অথচ, প্রকৃতপক্ষে "ব্ল্যাকমেল" ছবিখানি তখনকার তুলনায় আমেরিকার সবাক্ ছবির চেয়ে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ হ'য়েছিল! কিন্তু, আমেরিকার কোনো 'ছবিঘর' সে ছবি গ্রহণ করলে না ব'লে বাজারে তার কাট্‌তি হ'লনা। "ব্রিটিশ ইণ্টারন্যাশানাল পিকচার্স কোম্পানী" এজন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। এমন কি, উপনিবেশগুলিতেও এ ছবির চাহিদা হ'লনা। অষ্ট্রেলিয়ার 'সেন্সার্' কর্ত্তৃপক্ষরা এ ছবিখানির সে দেশে প্রবেশ নিষেধ ক'রে দিলে। পরে এ নিয়ে অনেক হাঙ্গামা করাতে তারা

সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিল বটে, কিন্তু কোম্পানীর তাতে ক্ষতিপূরণ হয়নি। আমেরিকার অসৎ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হ'ল, ব্রিটিশ সবাক্ ছবি প্রথম চোটেই মার খেয়ে গেলো।

আমেরিকা কিন্তু এখন আর সবাক্‌ছবির কথা ভাবছে না। স্বাভাবিক বর্ণ ও পূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন সবাক্ ছবি দেখাবার জন্য তার যে প্রবল ঝোঁক চেপেছিল, তাও সে এখন ছেড়ে দিয়ে, নিঃশব্দে সাধনা ক'রছে পৃথিবীর প্রমোদ ক্ষেত্র তার করতলগত করবার। এ ব্যাপার সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র নবউদ্ভাবিত 'টেলিভিশন্' বিজ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ —দেশান্তরে সংঘটিত ব্যাপারকে দূরান্তরে অবস্থিত নরনারীর লক্ষ্যগোচর করবার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে।

বর্ত্তমানে আমেরিকার দুটি কোম্পানী প্রধানতঃ পৃথিবীর সমস্ত সবাক্ ও অবাক্ প্রমোদ ব্যাপারের কর্ণধার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বলা যায়। একটি হচ্ছে R, C. A. বা "রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকা," আর একটি হ'চ্ছে "আমেরিক্যান টেলিফোন এণ্ড্ টেলিগ্রাফ কোম্পানী"। প্রথমোক্ত কোম্পানীর সঙ্গে যোগ রয়েছে "জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী," "পাথে ফিল্‌ম্ কোম্পানী" এবং "ভিক্টর্ গ্রামোফোন্ কোম্পানীর," তা ছাড়া, এ কোম্পানীর হাতে অসংখ্য নাট্যমঞ্চ সঙ্গীতশালা ও ছবিঘরও রয়েছে এবং 'রেডিও পিকচার্স' নাম দিয়ে এরা নিজেরাও এখন সবাক্ ছবি তোলার কারবার খুলেছে। নবউদ্ভাবিত 'ষ্টেরিয়োপটিকন্ (Stereopticon) যন্ত্র এরাই কিনে নিয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তা' বাজারে ছাড়বে। এই যন্ত্রের সাহায্যে 'টেলিভিশনে' ছবি দেখাবার জন্য তারা এখন থেকেই প্রস্তুত হ'চ্ছে।

এই R. C. A. কোম্পানী সবাক্ চলচ্চিত্র যন্ত্র নির্ম্মাণে বিশেষজ্ঞ ব'লে পরিগণিত হ'য়েছে। এদের সবাক্ যন্ত্র শুধু ইংল্যাণ্ডের নয়, য়ুরোপ ও এশিয়ারও অসংখ্য ছবিঘরেই স্থাপিত হয়েছে। ওদিকে, শেষোক্ত কোম্পানীও বড় কম শক্তিশালী নয়, কারণ, ওয়ার্ণার ব্রাদার্স, প্যারা-মাউণ্ট্, ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট্, ফক্স্, ইউনিভার্স্যাল, ফার্ষ্ট ন্যাশান্যাল ও মেট্রো-গোল্ড্‌উইন্-মেয়ার—আমেরিকার এই সবক'টি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানই এদের সঙ্গে সংযুক্ত। এদের সাহায্যে তারা পৃথিবীর অসংখ্য 'ছবিঘর' আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী এবং ওয়েষ্টার্ণ ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানীও এদের সঙ্গে বিজড়িত। এই W. E. C. কোম্পানীর সবাক্‌যন্ত্রও ইংল্যাণ্ড, য়ুরোপ ও এশিয়ার বহু ছবিঘরে ঢুকেছে। এই দুটি কোম্পানীই ব্যবসা হিসাবে উপস্থিত পরস্পর বিরোধী স্বার্থ হ'লেও একই উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছে, সে উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন্, রেডিয়ো এবং টেলিভিশন সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত প্রমোদ-প্রতিষ্ঠান জয় করে নিয়ে দিগ্বিজয়ী ও সার্ব্বভৌম আনন্দাধিপতি হওয়া! আমাদের বিশ্বাস যেমন অনেকগুলি ক'রে ছোট ছোট কোম্পানী পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে এক হ'য়ে এই দু'টি শক্তিশালী বৃহৎ কোম্পানী গড়ে উঠেছে, তেমনি ক'রে একদিন এই দু'দলেও মিলে গিয়ে এমন একটি বিরাট ও সুবৃহৎ কোম্পানী হ'য়ে উঠবে যে, অচিরে তারা জগতের সমস্ত দেশের সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ সরবরাহ করবার একচ্ছত্র অধিকারী হ'য়ে দাঁড়াবে।

ফিল্‌ম শিল্পের সবচেয়ে বড় শত্রু হ'য়ে উঠেছে 'সেন্সার্' কর্ত্তৃপক্ষ। একই ছবি বিভিন্ন দেশের সেন্সার্ কর্ত্তৃপক্ষের খেয়াল ও খুশীমত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। বার্লিনে যে ছবির অংশবিশেষ হয় ত সবচেয়ে বেশী প্রশংসা অর্জ্জন কোর্‌ছে, লণ্ডনে সে ছবির ঠিক্ সেই অংশটুকুই হয়ত সেন্সার্ প্রভুদের কৃপায় ছবি থেকে একেবারে কেটে বাদ দিয়ে দেখাতে হ'চ্ছে! এতে যে ছবির সুষমা ও সৌষ্ঠবের কতখানি ক্ষতি হ'চ্ছে সেদিকে তাঁদের কারুর দৃষ্টি থাকে না। এই উপদ্রবের হাত থেকে ফিল্‌ম শিল্পকে রক্ষা ক'রতে হ'লে বিভিন্ন দেশের 'সেন্সার' কর্ত্তৃপক্ষদের একত্র ক'রে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কানুন বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন, কারণ, তাহ'লে ফিল্‌ম কোম্পানীরা একটা সঠিক্ হদিশ পেতে পারে যে তাদের ছবিতে কী থাকা উচিত নয়, বা কী থাকলে তা 'সেন্সার' কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত হবেনা। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সেন্সার্ কর্ত্তৃপক্ষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও নীতিজ্ঞানের উৎপাতে এক একখানি ছবির সম্বন্ধে রকম রকম আপত্তি উত্থাপিত হ'তে দেখা যায়। অনেক সময় এইসব আপত্তি একান্ত অর্থহীন এবং হাস্যকর বলেও মনে হয়। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুইডিশ্ ছবি "নিরানন্দপথের"

(Joyless Street) উল্লেখ করা যেতে পারে। 'সেন্সার্' প্রভুদের অনুগ্রহে অনেক ভালো ভালো ফিল্ম যেমন তাঁদের অভিরুচিমত ছাঁটকাট হয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়, "নিরানন্দপথ" ছবিখানিরও ঠিক সেই দশা হয়েছিল। প্রতিদিন ষোল্লো ঘণ্টা ক'রে খেটে চৌত্রিশদিনে এই ছবি শেষ হ'য়েছিল। ছবিখানি আসলে দশ হাজার ফুট লম্বা ছিল, যেমন 'বেন্‌হুর্' কিম্বা 'বিগ্‌প্যারেড্'। প্যারিসের সেন্সারের দল এর দু'হাজার ফুট ছেঁটে দিলেন এবং যতগুলি 'পথের' দৃশ্য ছিল প্রত্যেকটি বাদ দিয়ে দিলেন। ভীয়েনায় দেখাবার সময় 'কসাইয়ের যতগুলি দৃশ্য ছিল সব 'কাটা' পড়েছিল। অথচ এই 'কসাইয়ের ভূমিকায় বিখ্যাত জার্ম্মাণ নট হ্বার্ণার ক্রাস্ (Weriner Krauss) অভিনয় করেছিলেন। রাশিয়া এই ছবির মার্কিন 'সৈনিক'কে 'ডাক্তার' করে নিলে এবং যে মেয়েটি খুন ক'রেছিল, তাকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে কসাইকেই খুনি ক'রে নিলে। জার্ম্মাণীতে এ ছবিখানি এক বছর চলবার পর হঠাৎ এই সেন্সার্ কমিটির কোপ দৃষ্টিতে পড়েছিল। আমেরিকায় এ ছবিখানি দেখানোই হ'লনা মোটে। ইংলণ্ডেও সেন্সার্ কর্ত্তৃপক্ষরা এ ছবিখানি পাশ করেনি। শুধু "ফিল্ম সোসাইটির" সভ্যগণের সামনে একবার মাত্র দেখানো হয়েছিল। অথচ, চিত্রকলা, অভিনয় নৈপুণ্য প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই এ ছবিখানি হয়েছিল একটি নূতন সৃষ্টি। "আউয়ার্ ড্যান্সিং ডটার্স" (আমাদের নৃত্যকুশলা কন্যারা) এবং "হট্ ফর প্যারিস্" (প্যারিসের পক্ষেও অসহ্য) ছবি দু'খানির মত অত বেশী নোংরাও নয় এ ছবি। তবু অরসিক সেন্সার্ কমিটি ও দু'খানি ছবি পাশ করেছিল, কিন্তু "নিরানন্দ পথ" তাদের হাতে নির্ম্মমভাবে নিহত হ'য়েছিল। সুতরাং ওদের বিচার-বিবেচনার উপর একটুও নির্ভর করা চলেনা।

(ক্রমশঃ)

গুরুবাদী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১)

কত পথ অতিক্রমি' গেছ গুরু ভাবি'—নমি
চরণে তোমার ভক্তিভরে
যবে হৃদে মেঘ লুটে তব সূর্য্য স্মরি' ফুটে
নবোদয় ভরসা অন্তরে।
মলিন ধূলিকা নিত্য করে চিত্ত গ্লানি-তিক্ত
ফুল্লমালা হয় সূত্রসার ;
থামে গতি, নামে নিশা মিলে না ত লক্ষ্য-দিশা
পঞ্জরের পিঞ্জর-মাঝার।
ঊর্দ্ধ রশ্মি হয় ম্লান ক্ষোভে করি খান খান
মরমের নির্দ্দেশ নিগূঢ়,
সে-ক্ষণে তোমার দীপ্তি করায় প্রত্যয় তৃপ্তি
তব প্রাপ্তি-নীলিমার সুরে।
যে-পথে কণ্টক ব্যথা সর্ব্ব আলো-সার্থকতা
করে ব্যর্থ তীক্ষ্ণ বেদনায়,—
যে পথে শৈবাল পঙ্ক রোধে নদী কলশঙ্খ
অমল তরঙ্গে আবিলায়,—
যে পথে সঙ্কটবৃষ্টি ঢালে লক্ষ অনাসৃষ্টি
সৃজি নিরাশার বিভীষিকা,—
সে-পথে মরুভূ ধূ ধূ পরে তব বরে শুধু
ভালে ফুল বৈজয়ন্তী টীকা।

(২)

পিপাসায় 'কাঙ্ক্ষি যারে না মিলিলে অশ্রুধারে
তিতি ধরা করি হায় হায়!
কত কী পাবার ছিল! অর্দ্ধপথে কে হরিল?—
মুহ্যমান পরাণ সুধায়।
সেক্ষণে দ্যুমণি তব বিনাশি' ত্রিযামা নব
প্রভাতীর বাজায় বাঁশরী ;
"যাহারে হারাও আজি মৃত্যুহীন রূপে সাজি'
দিবে দেখা"—গাহে সে অমরী।
"দিবে দেখা?—হায়! কবে?" পুছি যেই, বজ্ররবে
কালো গরজায় আলো দুরি',—
সে-ক্ষণে শিখর তব ধ্বান্ত করে পরাভব
স্বনি' অভ্রভেদী জ্যোতিতূরী।

সে-শৃঙ্গে বাজাও বাঁশি কাঁটা দলি' পুষ্পহাসি
ফুটায়েছ প্রাণ মধুকোষে—
জীবনের সর্ব্বনাশে রূপান্তরি প্রেমোচ্ছ্বাসে
লভিয়াছ শাশ্বত সন্তোষে।
সাধনে জেনেছ তুমি কোন্ কল্পতরু চুমি'
আবর্জ্জনা হয় স্বর্গফুল,
কী সে মন্ত্র যার বরে অয়সে স্বর্ণিমা ক্ষরে
আঁখিজলে ফুটে তারাফুল।

(৩)

শ্রান্ত জীবনের পথে যেদিন পুষ্পকরথে
নামে গুরু, তব অরুণিমা,
সে-মাহেন্দ্র সন্ধিলগ্নে কত না আদরে যত্নে
বিছাও উদয়-মধুরিমা।
তোমারে চিনেছি প্রাণে তাই দৈববাণী কানে
পরিচিত সম ঘোষে ভেরী ;
যবে তব পদধূলি গর্ব্বে লই শিরে তুলি'
অন্তরাগে আগমনী হেরি।
তব কোজাগর সাজে লুকায় ম্লানিমা লাজে
পাষাণেও বহে নির্ঝরিণী ;
তোমার ময়ূখ-কান্তি ঘুচায় কুহেলি-ভ্রান্তি
প্রভঞ্জনে রণিয়া কিঙ্কিনী।
তোমার মলয়-গন্ধে প্রবাহে ফল্গুর ছন্দে
চিত্তকুঞ্জে সুপ্ত শ্যামলতা
তব চরণারবিন্দ অর্চ্চি' শুনি সে-অনিন্দ্য
পরাগের কানে-কানে কথা।
তব রূপভেলা বাহি' অরূপ বেলায় চাহি
উত্তরিতে—নিহিত নির্ভরে ;
তব শুভাশীষে নিতি তরি ক্ষুব্ধ অম্বুনিধি,
তব ধ্রুবতারা আলো ধরে।

(৪)

স্বল্প-দৃষ্টি মুগ্ধ নর মদভরে নিরন্তর
কহে গুরু-দীক্ষা যে না চায় ;
রত্নাকরে পায়ে ঠেলে তৃপ্ত সে গোষ্পদ পেলে
এ কী প্রহেলিকা—বল, হায়!
ডাকিছে অলখ বীণা অন্তরে অন্তরলীনা
মূঢ় তারে শুনিতে না চাহে ;
আপনার আঁখি-ঠুলি বারেকো না ল'বে খুলি'
আঁধা-হ্রদে নন্দি' অবগাহে।
সংশয়-তুফানে আশা ডুবে, নিভে তারাভাষা
তবু সে না প্রার্থিবে পরাণে
তব বরাভয় বাণী ; রহিবে সে অভিমানী
আঁকড়িয়া অন্ধ অভিমানে।
মৃত পুঁথি-পাতে চায় চিন্ময় স্পন্দন তায়!
চিরন্তনে আকস্মিক মাঝে ;
জীবন্তে যে নাহি যাচে ধায় হর্ষে তারি পাছে
যেথা বিজ্ঞ বচন বিরাজে।
অহঙ্কারে নাহি মানে গুরুরূপে সদা প্রাণে
প্রাণাতীত উঠেন ধ্বনিয়া,
প্রদীপ্ত অমরা বাণী ব্যঙ্গভরে অপমানি'
দিশারীরে চলে সে হেলিয়া।

(৫)

গুরুবাদী তোমা ঘেরি' গাহে স্তব, নিত্য হেরি'
তোমার মুকুরে তাঁর ছায়া ;
হৃদয়ের ধূপাধারে পূজা রচি' বারে বারে
তিলে তিলে গড়ে স্বপ্নকায়া।
বলে না সে—ইন্দ্রধনু ক্ষণিকের ছায়াতনু
রূপায়ণ সকলি অসার
বলে না সে—রেখা-কায়া ক্ষণধ্বংসী মিথ্যা মায়া
বিদেহী কি খুঁজে দেহাগার?
বর্ণ-ডোরে মালা গাঁথি' হয় বর্ণাতীত—সাথী
নিত্য-নব বাসর-মিলনে
আরাধিত প্রতিমায় নিত্য নব ছন্দে পায়
জাগরণে শয়নে স্বপনে।
জানে সে—তোমার হাসি সর্ব্ব ঊষরতা নাশি'
অলক্ষ্যে বহায় সুধাধারা ;
মরত প্রেমের থালে অমর্ত্ত্য আরতি জ্বালে
যা'র লাগি' বিশ্ব আত্মহারা।
সান্ত জল কণা-ছন্দে বিন্দুরে সে নাহি বন্দে
সিন্ধু শুধু হিয়া তার ভরে ;
পল্বলে সান্ত্বনা নদী যাচে কবে? নিরবধি
তৃষা তার অসীমার তরে!

অনধিকার

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মেয়ের আদর দেখিলে গা জ্বালা করে। ঝি-চাকরেরাও আড়ালে-আবডালে নাক সিঁটকায়। বলে :

'দু'দিন বাদে যে পরের বাড়ী চলে যাবে তার আবার অত কেন ?'

কিন্তু মায়ের মন,—একটিমাত্র মেয়ে·· মানা মানে না।

ছেলেটি ছোট। বলে, 'ছেলে ত' চিরকালের বাছা, আদর-যত্ন মেয়েকেই করতে হয়।'

মেয়ের তখন আর মাটিতে পা পড়ে না। সোহাগে আহ্লাদে যেন থই-থই করে।

রং ফর্সা। চেহারা মন্দ নয়। গয়না-গাঁটিতে গা একেবারে বোঝাই। বয়স তেরোর চেয়ে বরং কিছু বেশি, কিন্তু দেখিলে মনে হয়—ষোলো-সতেরোর কাছাকাছি।

মেয়ে নাকে এখনও নোলোক্ পরে।

মা বলে, 'উঠে গেছে কি লা ? উঠে আবার যায় নাকি কিছু! কই, ছাখ্ ত' মা সুখদা!' বলিয়া চাকরাণীকে তাহার কাছে ডাকিয়া দেখায়। মেয়ের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলে, 'ছাখ্ ত' মা কেমন মানিয়েছে!'

ঘাড় নাড়িয়া সুখদা বলে, 'বেশ।'

মেয়ে এ-বেলার কাপড় ও-বেলায় আর পরে না। এ-বেলার গহনা ও-বেলায় অচল।

সৌদামিনী বলে, 'মেয়ে আমার রাজরাণী হবে।'

তা এমন বিচিত্র কিছু নয়। সৌদামিনী জমিদার-গৃহিণী। রাজরাণী হয়ত সে হইতেও পারে।

কিন্তু সঙ্কল্প মানুষের, সিদ্ধি বিধাতার।

রাজরাণী সে হয় নাই।

এখন সৌদামিনী বলে, 'ইচ্ছে করেই মল্লিকাকে আমি অমনি ঘরে দিলাম বাছা! না দিলে আমার যখন-খুশী দেখতে পেতাম না যে!'

লোকে ভাবে, হয়ত' তাই।

সৌদামিনী আবার তাহাকে কাছে ডাকিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়; বলে, 'অমন কুলীন আর এদেশে কোথাও নেই।'

তাহাও হয়ত' সত্য হইতে পারে।

কিন্তু গরীবের ঘরে বিবাহ দিয়াও মেয়েকে যখন-খুশী দেখিতে পাওয়া বড় শক্ত।

আমের সময় আম, কাঁঠালের সময় কাঁঠাল, লিচু লেবু, তরি-তরকারি, কাপড়-জামা, যখনকার যা—তত্ত্ব করিয়া মল্লিকার কাছে লোক পাঠানো হয়। মেয়ে-জামাইকে আসিবার জন্য অনুরোধের আর অন্ত থাকে না।

জামাইএর বাড়ীতে মাত্র বুড়া ঠাকুরদাদা আর এক বিধবা পিসি।

তত্ত্ব লইয়া মেয়ে-জামাইকে যে আনিতে যায়, বুড়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া বসায়; বসাইয়া বলে, 'বসেছ ?'

সাড়া পাইলে পর, হাত বাড়াইয়া বুড়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, 'চোখে আমি ভালো দেখতে পাইনে বাবা। দিদি-মণিকে তুমি আমার নিয়ে যেতে চাও। কেমন ?'

'হ্যাঁ কত্তা, দিন একবার পাঠিয়ে। ওদিকে মা নইলে কেঁদে কেঁদে সারা হ'লো।'

হো হো করিয়া হাসিয়া বুদ্ধ তাহাকে চুপ করাইয়া দেয়। বলে, 'আমরা বুঝি কাঁদব না ? আমরা কাঁদতে জানিনে; না ? বৌমা চলে গেলে আমাদেরও ঘর যে অন্ধকার বাবা! যাক্, ও-সব স্নেহ-মমতার কথা তুমি বুঝবে না। তুমি ছেলে-মানুষ।'

লোকটি বলে, 'তাহলে মাকে গিয়ে আমি কি বলব বলুন ? এই নিয়ে ত' অনেকবার হলো।'

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলে, 'অনেকবার হলো। না ?'

বলিয়াই মৃদু একটুখানি হাসিয়া বলে, 'আচ্ছা, ডাকো আমার বৌদিদিমণিকে ডাকো এইখানে।'

অদূরে দাঁড়াইয়া মল্লিকা বোধ করি সবই শুনিতেছিল, তৎক্ষণাৎ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল :

'ডাকছেন আমায় ?'

ঘাড় নাড়িয়া বৃদ্ধ বলিল, 'হ্যাঁ দিদি, ডাকছি। আচ্ছা, সেই যে, যে-কথাটা তোমার মাকে তুমি বলবে বলেছিলে এই নিয়ে ক'বার বলা হলো ?'

সে যে এ-প্রশ্ন করিবে তাহা সে ভাবে নাই। চুপ করিয়া হেঁটমুখ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মল্লিকা তাহার পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ বলিল, 'লজ্জা কিসের ? বল!'

ভয়ে-ভয়ে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে মল্লিকা কহিল, 'চার বার।'

বৃদ্ধ আবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, তুমি ভুল বললে দিদি! আমার ঠিক মনে আছে। চিঠি লিখে জানিয়েছ দু'বার, আর লোকের মুখে বলে' পাঠানো হয়েছে চার বার। এই নিয়ে ছ'বার হ'লো।' এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া বৃদ্ধ বলিল, 'আর তোমায় নিতে এসে ফিরে গেছে ক'বার ?'

মল্লিকা বলিল, 'তিনবার।'

বৃদ্ধের দন্তহীন মুখে আবার হাসি ফুটিল! সম্মুখে উপবিষ্ট ব্যক্তিটিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'হ'লো ত' ? শুনলে ত' বাবা ? সুতরাং এবারও তুমি বল গিয়ে যে, ওরে ক্ষ্যাপা মেয়ে, সংসার করতে হ'লে সব জিনিস ভুলে গেলে চলে না। মেয়ে যদি আব্দার করে' কিছু চেয়েই বসে ত' সেটা আগে তার দেওয়া উচিত। না দিলে মেয়ের রাগ হয়। মেয়ে যাবে কেন ? কিছুতেই যাবে না।'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, মল্লিকার বাপের বাড়ীর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল :

'কি চেয়েছিস্ রে মল্লিকা ?'

মল্লিকা বলিল, 'এক হাজার টাকা নায়েব-মশাই। আপনি বাবাকে গিয়ে বলবেন।'

শেষের কথাটা এম্‌নিভাবে মল্লিকার গলায় আট্‌কাইয়া গেল যে, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না, চোখে কাপড় চাপা দিয়া তৎক্ষণাৎ সে সেখান হইতে একরকম ছুটিয়াই পলায়ন করিল।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'এষ্টেটের নায়েব আপনি ? ও হো হো, তাহ'লে ত' আপনার উপযুক্ত সম্মান আমি করতে পারলাম না দেখছি! তা—তা আপনি যেন আমার অপরাধ আমি বুড়ো মানুষ, তার ওপর দেখতেই ত' পাচ্ছেন···আচ্ছা, দিদিমণি, টাকাটা তুমি কি-জন্যে চেয়েছিলে, তাও ত' ওঁকে শুনিয়ে দিতে পার!'

নায়েব বলিল, 'মল্লিকা চলে' গেছে।'

বৃদ্ধ বলিল, 'দেখলেন ? মা-বাপের ওপর কি রকম রেগেছে দেখলেন ? ছি-ছি, টাকাটা এতদিন ওঁদের পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ব্যাপারটা শুনবেন তবে ? শুনুন। শোনা আপনার উচিত।—কথায়-কথায় সেদিন মাছের কথা উঠলো। বললাম, 'আমার ত' দিদি পুকুর নেই, মাছ হয়ত তোমায় আমি সবদিন খেতে দিতে পারব না। এই না শুনে' দিদিমণি আমার বলে' উঠলো, পুকুর আমি কিনব। তারপর আমি আর কোনও খবর রাখিনি। ভেতরে ভেতরে বৌমা যে এত কাণ্ড করেছেন তাও জানতাম না। হঠাৎ একদিন শুনি, রায়েদের পুকুরটা নাকি দিদিমণি কেনবার সব ঠিক্‌ঠাক্ করে' ফেলেছেন। দাম পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে—হাজার টাকা। দিদিমণি বলে, আমার গয়না বিক্রি করে' পুকুর কিনুন। জমিদারের মেয়ে কিনা, বিষয়-সম্পত্তির মর্য্যাদা ঠিক বোঝে। বললাম, রামঃ, গয়না কি আর বিক্রি করতে আছে দিদি ? লোকে বলবে কি ? তার চেয়ে, কথা যখন ওদের দিয়েছ দিদি, টাকা তোমার মা-র কাছে চেয়ে পাঠাও। এক হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ তিনি পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু চাওয়া ত' এই নিয়ে হলো ছ'বার।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধ খানিক্ থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, 'মনে ওর বড় আঘাত লেগেছে, বুঝলেন ? রায়েরাও বার-বার তাগাদা দিচ্ছে, দিদিও আমার লজ্জায় তাদের মুখ দেখাতে পারে না। তাই ও মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—টাকা যতদিন না পাঠাবে, বাপের বাড়ী ততদিন ও যাবে না। আমি অনেক করে' বুঝিয়ে দেখেছি নায়েব-মশাই, কিন্তু·····'

বলিয়া বৃদ্ধ তাহার মাথাটি বার-কতক্ নাড়িয়া বলিল, 'কিছুতেই না। হাজার হোক্, বনেদি ঘরের মেয়ে ত! আর-কিছু না থাক্, আত্মসম্মান জ্ঞানটুকু ওর পুরো মাত্রায় আছে।'

নায়েব উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তাহ'লে আসি আমি।' বলিয়াই হাত বাড়াইয়া বৃদ্ধের দু'টি পায়ে হাত দিয়া সেই হাতটি আবার মাথায় ঠেকাইল।

বৃদ্ধ বলিল, 'মঙ্গল হোক্!·····কই, দিদিমণি কি আমার চলে' গেছে?'

নায়েব বলিল, 'হ্যাঁ।'

বৃদ্ধ তখন অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় বলিতে লাগিল, 'দিদিটি আমার ভারি চাপা, মুখ ফুটে সহজে কোনও কথাই বলতে চায় না। আমি বলি কি, তা যদি তুমি নিজের নামে বলতে লজ্জা কর দিদি, টাকা তুমি আমার নাম করেই চেয়ো। আমি বুড়োমানুষ, দু'দিন বাদে মরে' যাব; আমার আর কি বাবা, ওদের জন্যেই সব।···যাও তাহ'লে, যাবার সময় একবার দেখা করে' যাও দিদিমণির সঙ্গে।'

মল্লিকার সঙ্গে নায়েব দেখা করিতে গেল।

সদর দরজাটা বন্ধ না করিলে বৃদ্ধ রসিকলালের ঘুম হয় না।

অথচ স্বামী ঘরে না ফিরিলে দরজা বন্ধ করিতে মল্লিকার একটুখানি বাধে।

কিন্তু রসিকলাল ছাড়িবার পাত্র নয়। বারে-বারে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া বলিয়া যখন হায়রাণ হইয়া ওঠে, তখন সে চেঁচাইতে সুরু করে। বলে, 'কই গো, মা-লক্ষ্মীরা, কথা কি আমার শুনবে না? নাত-বৌ বন্ধ করতে না পারে, কামিনী কি করছিস্?'

কামিনী তাহার বিধবা মেয়ে। কোথায় কোন্ তীর্থে গিয়া মাথার চুলগুলা কাটিয়া দিয়াছে, কম-বয়সেই দাঁত ভাঙ্গিয়াছে, রোগে শোকে জরাজীর্ণ হইয়া দিবারাত্রি একরকম চুপ করিয়া বসিয়াই থাকে। এবং তাহার এই চুপ করিয়া বসিয়া থাকার কথাটা কেহ উল্লেখ করিলেই তাহাকে সে বাক্যবাণে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে। বাপ তাহার একে বুড়া, তায় অন্ধ, বারে-বারে কথার যন্ত্রণা দেওয়া তাহাকে উচিত নয়, অথচ কথা না বলিয়াও সে থাকিতে পারে না। অতিকষ্টে উঠিয়া গিয়া দরজাটা সে সশব্দে বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়াই বাপের একখানা হাত ধরিয়া চড়্ চড়্ করিয়া তাহাকে সজোরে টানিয়া তুলিতে তুলিতে বলে, ওঠো, চল, শোবে চল!'

রসিকলাল বলে, 'থাম্। অত জোরে জোরে টানিস্‌নে। হাতটা যে গেল।'

কামিনী বলে, 'যাক্। কথা শুনলে গা জ্বালা করে! মা-লক্ষ্মী যাকে বলছ, তাকেই বল, আমাকে কেন?'

রসিকলাল উঠিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'তা বই-কি! এত রাত পর্য্যন্ত দরজায় খিল্ দিবিনে, শেষে কোন্‌দিন চুরি-ডাকাতি হয়ে যাক্।'

কামিনী বলে, 'যায় ত যাবে, যার যাবে তার যাবে, আমার কি! তোমার টাকাকড়ি থাকলেও যা আমার না থাকলেও তাই। বাবা রে বাবা, হে ভগমান, মেয়ে হয়ে যেন কেউ না জন্মায়!'

কামিনীর চিরকাল ওই এক নালিশ!—ছেলে হইলে সে বিষয়-সম্পত্তির ভাগ পাইত, মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া বাপের বিষয়ে তাহার আর কোনও অধিকার নাই!

রসিকলালেরও সেই এক কথা! চুপি চুপি বলে, 'থাম্ পাগ্‌লী থাম্। তোর আমি সব ব্যবস্থাই করে' দিয়ে যাব।'

কামিনী বিশ্বাস করে না। বলে, 'সে আমি জানি।'

বলিয়াই এদিক-ওদিক তাকাইয়া কামিনী অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে বলিতে থাকে, 'দরজা বন্ধ করতে যে বলছ, কিন্তু তোমার সে নাতিটি যে এখনও···'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে হয় না, রসিকলাল চেঁচাইয়া ওঠে, 'আসেনি? না? শালাকে আমি হাজার দিন বারণ করি, বলি, যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে মেতে থাকলে ত' আর দিন চলবে না, তার চেয়ে বরং জমি-জায়গাগুলো ছাখ্, রায়েদের পুকুরটা যাতে···বৌটা রয়েছে নাকি এখানে?'

কামিনী তাহার বাবার হাতে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দিয়া বলে, 'হ্যাঁ চুপ কর।—এই যে, এইদিকে এসো, চৌকাঠ্‌টা ডিঙিয়ে—'

বাপকে ঘরে শোয়াইয়া দিয়া কামিনীও ঘুমাইয়া পড়ে।

নিস্তব্ধ গ্রাম। কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই।

মল্লিকা শুধু একলা ঘরে জাগিয়া বসিয়া আছে। স্বামী তাহার কখন আসিবে কে জানে।

সহসা ধুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইতেই মল্লিকা উঠিয়া

দিল। দরজা তাহার খোলাই ছিল। জুতাজোড়াটা হাতে লইয়া যোগীন ঘরে ঢুকিয়া চাপা-হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া বলিল, 'চুপ্! আজও তেম্‌নি পাঁচিল্ টপ্‌কে এসেছি।'

বৃদ্ধ রসিকলালের ঘর হইতে চীৎকার শোনা গেল, 'ও কিসের শব্দ র‍্যা!'

ভাদ্র মাস। বাড়ীর কাছাকাছি এদিক-ওদিক কয়েকটা তালের গাছ আছে। সময় অসময় অম্‌নি ধুপ্‌ধাপ্ করিয়া তাল পড়ার শব্দ শোনা যায়। মল্লিকা বলিয়া দিল, 'কোথায় যেন তাল পড়লো।'

রসিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'যোগীন এসেছে?'

মল্লিকা একবার তাহার স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'দরজা কে খুলে দিলে?'

মল্লিকা বলিল, 'আমি।'

'কই, শব্দ পেলাম না যে?'

মল্লিকা চুপ করিয়া রহিল। দাঁত কিস্‌মিস্ করিয়া যোগীন বলিল, 'শালা।'

মল্লিকার হাসি যেন আর ধরে না! হাসিতে হাসিতে জল গড়াইয়া আসন পাতিয়া খাবার ঢাকা খুলিয়া দিয়া বলিল, 'এসো।'

যোগীন খাইতে বসিল। মল্লিকা পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

যোগীন জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাপের বাড়ীর সেই নায়েব না কে—চলে' গেছে?'

মল্লিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'বুড়ো টাকার কথা বলেনি?'

'বলেছিল।'

যোগীন বলিল, 'আচ্ছা ছাখ ত' বুড়োর আক্কেল, বলে কিনা পুকুর কিনে মাছের চাষ করার মত লাভ নেই। ধেৎ তেরি, তার হাঙ্গামা কত! এত টুকু টুকু পোনা, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, চোর ডাকাতের হাত থেকে আগলাও, কেউ ছিপ্ ফেললে কি না দেখে এসো, তারপর বড় হবে পঁচিশ বচ্ছর পরে। ততদিন কে মরবে কে বাঁচবে তার ঠিক নেই?' বল ঠিক কিনা?'

মল্লিকা ঈষৎ হাসিল।

দু'এক গ্রাস খাইয়া যোগীন আবার বলিতে লাগিল, 'তার চেয়ে ওই এক হাজার টাকা দাও আমার হাতে, মাসে হাজার টাকা না কামাতে পারি ত' কী! পাঁচশ' টাকা ত' ফেলে-ছড়িয়ে! কলকাতার সেই নির্ম্মলা অপেরা পার্টির লাভ কত জানো? বাপ্‌রে বাপ্! ভাবলে গালে হাত দিতে হয়।···আমাদের ধরো সুবিধে কত! মেন্ এ্যাক্টার্স্ ত' নিজে, ম্যানেজারও নিজে, বাকি যে-ক'জন থাকবে দু'দশটাকা ক'রে দিলেই—ব্যস্! ছ'মাস বাইরে ঘুরে বেড়াব, ছ'মাস ব'সে থাকব। ভাল যাত্রার দলের ডিম্যাণ্ড্ কত!'

বলিয়া সে মল্লিকার মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

খাওয়া শেষ হইলে বলিল, 'টাকাটা এসে গেলে তুমি আমার হাতে দিয়ো, তারপর আমি দেখে নেবো বুড়ো কেমন করে' পুকুর কেনে।'

মল্লিকা একটি কথাও বলিল না, হাত হইতে পাখাটা নামাইয়া পানের বাটায় পান আনিতে গেল।

হাজার টাকার আশায় নাতি-ঠাকুরদাদা দু'জনেই বসিয়া আছে, এমন দিনে রাধানগর হইতে দারুণ এক দুঃসংবাদ আসিয়া উপস্থিত!

মল্লিকার যে একটিমাত্র ভাই ছিল, তিন দিনের জ্বরে তাহার সে-ভাইটি হঠাৎ মারা পড়িয়াছে।

মল্লিকা ত' কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির! তাহাকে চুপ করানো দায়।

জামা-জুতা পরিয়া যোগীন তাহাদের যাত্রার রিহার্স্যাল্ দিতে বাহির হইতেছিল, কামিনী বলিল, 'বাবা তোকে ডাকছে যোগীন!'

বৃদ্ধ রসিকলাল তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া তামাক টানিতেছিল, বলিল, 'কে, যোগীন? আয়, বোস্।'

যোগীনের বসিবার অবসর ছিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিল, 'কি বলছ বল।'

রসিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌদিমণি কি করছে?'

যোগীন বলিল, 'কাঁদছে, আবার কি করবে?'

মাথা নাড়িয়া বৃদ্ধ বলিল, 'কাঁদুক্। কাঁদ্‌লে আমাদের দুঃখের অনেকটা লাঘব হয়।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া বলিল, 'কিন্তু এই আমি বলিহারি যাই যোগীন, যা ভাবলাম, শেষ পর্য্যন্ত ঠিক সেই রকমটিই হয়ে গেল! তোর বাবা যখন মারা গেল, মা গেল,—সবাই বলতে লাগল—ছেলেটা বড় অপয়া ছেলে। একমাত্র আমি তার পিতিবাদ করলাম; বললাম, না। তার কারণ কি জানিস্? রতু স্যাকরা একবার আমার কাছে পঁচিশটি টাকা ধার নেয়, তারপর দেবো দেবো করে' দিতে আর কিছুতেই পারে না, শেষকালে যায় মরে'। ভাবলাম, টাকা আমার গেল। লেখাপড়া নেই, হ্যাণ্ডোলোট্ নেই, টাকার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। তারপর—তোর যেদিন জন্ম হ'লো, আমার ঠিক মনে আছে, চোখে আমি তখন দেখতে পেতাম; বর্ষাকাল, ঝম্ ঝম্ করে' বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ দেখি জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে ঘোম্‌টা টেনে একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললাম, 'কে মা? কি জন্যে এসেছ?' মেয়েটি তার আঁচলের একটি গিঁট খুলে' তিরিশটি টাকা আমার পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে ধীরে-ধীরে বললে, 'সতুর বাবার কাছে পঁচিশটি টাকা আপনি পেতেন। পাঁচটি টাকার বেশি সুদ আমি আর দিতে পারব না বাবা, ওই নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।' হিসেব করে' দেখতে গেলে সুদ হয়েছিল পঞ্চাশ টাকার ওপর। তা দিলাম ছেড়ে। কিন্তু ওই যে তিরিশটে টাকা পেলাম, সেও কি আর তুই না জন্মালে পেতাম ভেবেছিস? কখ্‌খনো না।' বলিয়া বৃদ্ধ একবার ঘাড় নাড়িয়া গড়গড়ার নলটা হাত হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'সেই থেকে আমি জানি যে, তোর অর্থভাগ্য প্রবল।…নানান্ জায়গা থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এলো, কিন্তু সব ভেঙ্গে-চুরে' অনেক ভেবেচিন্তে দিলাম শেষে রাধানগরে—'

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দ পাইয়া রসিকলাল বলিয়া উঠিল, 'কে?'

কামিনী একটা পাথরের খল্-নুড়ি হাতে লইয়া তাহার ঔষধ দিতে আসিয়াছিল, বলিল, 'আমি।'

রসিকলাল বলিয়া উঠিল, 'এখানে ঘুর্-ঘুর্ করছিস্ কেন মা দিনরাত? আমাদের নাতি-ঠাকুরদাদার দুটো মফঃস্বলী কথা হচ্ছে, তাও হ'তে দিবিনে?'

কামিনী বলিল, 'তোমারই পিণ্ডি ওষুধ দিতে এসেছিলাম। ওই রইলো ওইখানে, খেতে হয় খেয়ো।' বলিয়া নাক সিঁট্‌কাইয়া বিরক্ত হইয়া হন্ হন্ করিয়া সে চলিয়া গেল।

'থাক্।' বলিয়া বাঁ-হাত দিয়া হাত্‌ড়াইয়া খল্-নুড়িটা একবার স্পর্শ করিয়া, এইবার অত্যন্ত নিম্নকণ্ঠে কহিল, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম…তারপর…বিয়ে যখন দিলাম ওখানে, আমার তখনই কেমন যেন মনে হয়েছিল, রাধানগরের জমিদারী…ও আমার নাতির হাতে এলো-বলে'। তারপর এই দ্যাখ্ না ভাই, হাতে-হাতে ফলে' গেল কিনা দ্যাখ্। অবিনাশবাবুর এমন ছেলে, জ্বর নেই জ্বালা নেই, তিনটি দিনের দিনেই কেমন ধড়ফড়িয়ে—'

বলিয়া কথাটা শেষ না করিয়াই ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'হাজার টাকা হাজার টাকা করছিলাম, এখন কত হাজার টাকা তুমি কত লোককে দান করবে ভাই! তাই বলছিলাম কি জানো?'

যোগীন তখন তাহার যাত্রার দলের স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, চুম্‌কি-দেওয়া রাজার পোষাক পরিয়া, কোমরে তলোয়ার বাঁধিয়া, মাথায় মুকুট দিয়া, বুকে একবুক্ মেডেল্ ঝুলাইয়া, সে তখন আসরের মাঝখানে বক্তৃতা করিতেছে, চারিদিকে নীরব নিস্তব্ধ মুগ্ধ জনতা, চিকের আড়ালে মেয়েরা বসিয়া আছে, ছেলেরা পর্য্যন্ত টুঁ শব্দটি করিতেছে না… এমন সময় নিদ্রোত্থিতের মত নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে সে তাহার বৃদ্ধ পিতামহের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ?'

রসিকলাল বলিল, 'দিদিমণিকে এতদিন পাঠাইনি, কিন্তু এবার হচ্ছে গিয়ে আমাদের নিজের গরজ। ওরা নিতে আসবার আগে, কাল্‌কেই তুমি ওকে সঙ্গে নিয়ে চলে' যাও। বুঝলে ভায়া, সেই জন্যেই ডেকেছিলাম।'

মল্লিকাকে লইয়া যোগীন রাধানগরে আসিতেই জমিদার-বাড়ীতে আবার একবার নূতন করিয়া কান্নার রোল উঠিল। মা কাঁদিল, মেয়ে কাঁদিল, বাবা কাঁদিল, এবং তাহাদের দেখাদেখি দাসী-চাকরেরাও কাঁদিতে লাগিল।

মা-বাবা যদিই-বা পথে আছে, মল্লিকার সে চীৎকার করিয়া ধূলায়-মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া ভীষণ কান্না আর কিছুতেই থামে না।

পুত্র-শোকে কাতর ম[illegible]কেই শেষে বলিতে হইল, 'চুপ কর্ মা, তোর কান্না [illegible]খে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। কি আর করি বল, [illegible]তা বড় নিষ্ঠুর।'

[illegible] তাহাতে আর কোনও সন্দেহই নাই। একটি নিষ্ঠুর [illegible]—দস্যুর মত তাহাও ছিনাইয়া লইয়া কি সুখ যে [illegible]রি হইল কে জানে!

সৌদামিনী বলিল, 'তোকে কিন্তু আমি আর চোখের আড়াল করব না বাছা, তুই এইখানেই থাক্। যোগীনকেও বলেছি।'

থাকিতে পাইলে মল্লিকা বাঁচে, কিন্তু উহারা রাখিবে কি?

দু'চারদিন পরে শোকের মাত্রাটা একটুখানি কমিয়া আসিলে মল্লিকা একদিন রাত্রে তাহার স্বামীকে বলিল, 'দ্যাখো তোমার কাজকর্ম্ম ত' কিছু নেই, মা আমাদের এইখানেই থাকতে বলছেন; থাকো না!'

যোগীন বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান্, কালো কুচ্‌কুচে গায়ের রং, লেখাপড়া ভাল জানে না, গলার আওয়াজটাও রুক্ষ।

'ধেৎ!' বলিয়া মল্লিকাকে সে এমন জোরে এক ধমক্ দিল যে, মল্লিকা সহসা চমকিয়া উঠিল। তাহার চুপ করিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া সে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যোগীন ভাবিয়াছিল, ছেলে যখন মরিয়াছে, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াই দেখিবে, শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি একেবারে তাহার হাতের মুঠার মধ্যে। কিন্তু এখানে আসিয়া হাল-চাল দেখিয়া সে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বুঝিয়াছে, তাহার এখনও অনেক দেরি। শ্বশুর-শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে সে-আশা খুব কম। তবে শেষ পর্য্যন্ত একদিন আসিবেই। সে কথা যখন স্থির-নিশ্চিত, তখন মল্লিকাকে এমন করিয়া তিরস্কার করা তাহার উচিত হয় নাই।

বলিল, 'বা-রে, আবার কান্না দ্যাখো মেয়ের! ভাল করে' না বুঝে-সুঝেই কথা বল, তাইতে বড় রাগ ধরে। কাজকর্ম্ম আমার নেই কি রকম? 'সুভদ্রা-হরণের' রিহার্স্যাল্ চলছে, আর এইখানে—শ্বশুর বাড়ীতে ধন্না দেবো বুঝি? মাইরি আর কি!'

মল্লিকা কোনও কথা বলিল না। উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া যেমন কাঁদিতেছিল তেমনি কাঁদিতেই লাগিল।

যোগীন কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চোঁ চোঁ করিয়া একটা সিগারেট টানিয়া মনে-মনে কি যেন ভাবিল। বলিল, 'আচ্ছা, থাকো তুমি। বুড়োকে আমি বুঝিয়ে বলে' দেবো।'

তাহার পর মল্লিকার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'বাপের বিষয়-সম্পত্তির ত' এখন তুমিই মালিক। না কি বল? আপদ যেটা ছিল সেটা ত' ফর্সা হয়ে গেল।'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া মল্লিকা একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া শুইয়া শুইয়াই খানিক্‌টা সরিয়া গেল।

যোগীন বলিল, 'সরে গেলে কি হবে? যা সত্যি, সেই কথাই বলছি। তবে তার এখনও অনেক দেরি।'

ভাবিয়াছিল, স্ত্রীর কাছ হইতে জবাব একটা সে নিশ্চয়ই পাইবে, কিন্তু জবাবের পরিবর্ত্তে তখনও সে কাঁদিতেছে দেখিয়া যোগীনের রাগ আবার চড়িয়া গেল। বলিল, 'ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে' কেঁদো না বাপু, ভাল লাগে না—ধেৎ!'

মল্লিকা চুপও করিল না, কিছু বলিলও না।

পরদিন মল্লিকাকে কাছে ডাকিয়া মা জিজ্ঞাসা করিল, 'জামাই বড় রাগীদার মা, বার-বার কথা বলতে ওকে আমার বড় ভয় করে। তোর এখানে থাকবার কথা বলেছিলি? না, তোর বাপকে দিয়ে একবার বলাব?'

মল্লিকা বলিল, 'না মা, বলাতে হবে না। আমি থাকলাম।'

মা'র ভয় হইল। বলিল, 'না মা, জামাই যদি বকে? যদি রাগ করে?

মল্লিকা বলিল, 'করুক্।'

দেখা গেল, যোগীন রাগ-অভিমান কিছুই করে নাই। পরদিন সকালে সে জুতা পরিয়াই তাহার শাশুড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'শুনছেন? আমি আজ চললাম।'

সৌদামিনী বসিয়া বসিয়া মল্লিকার চুল আঁচ্‌ড়াইয়া দিতেছিল। মুখ তুলিয়া বলিল, 'আজই চল্‌লে বাবা? আবার কবে আসবে?'

মল্লিকা তখন তাহার মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া দূরে একেবারে জানালার কাছে সরিয়া গেছে। যোগীন একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল ঃ

'কবে আসব? তার কিছু ঠিক নেই। তবে ঘুড়ির লাটাই রইলো এইখানে, ঘুড়ি আর যাবে কোথায়? তাকে আসতেই হবে।'

শাশুড়ী লজ্জায় মরিয়া গেল। রাগে তখন মল্লিকার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জানালার কাছ হইতেই কট্‌মট্‌ করিয়া সে তাহার এই নির্ব্বোধ স্বামীটির মুখের পানে তাকাইয়া চোখের ইসারায় সেখান হইতে তাহাকে সে চলিয়া যাইতে বলিল।

কিন্তু যোগীন তাহার সে নীরব চোখের মিনতি বুঝিল না। স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া সে বেশ জোরে-জোরেই প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'কেন? কি হয়েছে কি?'

মল্লিকা কথা বলিবে কি, লজ্জায় একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, মাথা হেঁট করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই শক্ত সিমেন্টের মেঝের উপর পায়ের বুড়ো আঙুলটা ঘষিতে লাগিল।

সৌদামিনী ভাবিল, তাহার এখানে দাঁড়াইয়া থাকা অন্যায়। মেয়ে-জামাই নিশ্চয়ই দু'টা কথা বলিবে। তাই সে ধীরে-ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু সেখান হইতেও শুনিতে পাইল, জামাই বলিতেছে, 'টাকা আনতে গেল বুঝি?'

অপরাধের মধ্যে মল্লিকা তাহার দুই ঠোঁট দিয়া এক-প্রকার শব্দ করিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'আ-মর্‌!' বলিয়াই সে ছুটিয়া গিয়া ভিতর হইতে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

যোগীন বলিয়া উঠিল, 'কি বল্‌লি? মর্‌? কেন, আমি কেন মরব? একটা আপদ ত' বিদেয় হয়েছে, এইবার তুই হ'না! জ্বালা-জঞ্জাল চুকে যায় তাহ'লে!'

মল্লিকা ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

যোগীনের রাগ তখনও পড়ে নাই। সশব্দে খিল্‌ খুলিয়া সে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

জুতার শব্দে সৌদামিনী বুঝিল, জামাই চলিয়া যাইতেছে। পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া সে অনুচ্চকণ্ঠে ভয়ে-ভয়ে ডাকিল, 'শোনো বাবা যোগীন!'

যোগীন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কী!'

সৌদামিনী দশ টাকার এক[illegible]নি নোট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, 'আবার এসো যে[illegible]বা, রাগ কোরো না। মল্লিকা ছেলেমানুষ।'

নোটখানি পকেটে পুরিয়া যোগীন বলিল, 'আ[illegible]'

বলিয়াই সে চলিয়া গেল। নিস্তব্ধ বাড়ীর মধ্যে সি[illegible] উপর জুতার খট্‌ খট্‌ শব্দটা মা ও মেয়ে দু'জনেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

যোগীন যে রকম ভাবে গেল, মনে হইল সে যেন আর সহজে ফিরিবে না। কিন্তু সপ্তাহ পার হইতে না হইতেই যোগীন আসিয়া হাজির!

রাত্রে সেদিন মল্লিকা অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে তাহার ঘরে ঢুকিয়া সর্ব্বাগ্রে দরজা-জানালাগুলা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

জিজ্ঞাসা করিল, 'হ'লো সুভদ্রাহরণ?'

যোগীনের মুখখানা কেমন যেন ভার-ভার। বলিল, 'নাঃ! মান্‌কেটার জ্বর হয়ে গেছে। তাছাড়া—'

বলিয়া চুপ করিয়া একটা বিড়ি টানিতে টানিতে ধোঁয়াটা মল্লিকার মুখের উপরেই ক্রমাগত ছাড়িতে লাগিল।

চোখে মুখে নাকে ধোঁয়া লাগিতেই খুক্‌ খুক্‌ করিয়া কাশিয়া মল্লিকা একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তা ছাড়া কি—?'

যোগীন বাঁ-হাত বাড়াইয়া তাহার শাড়ীর এক প্রান্তভাগ ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কাছে সরাইয়া আনিয়া বলিল, 'তাছাড়া শত খানেক্‌ টাকার দরকার। দিতে পার?'

মল্লিকা বলিল, 'আমি টাকা কোথায় পাব?'

যোগীন বলিল, 'তোমার ভাবনা কি আজকাল। তুমিই ত' মালিক।'

স্বামীর মেজাজ ভাল ছিল, তাই ভরসা পাইয়া মল্লিকা বলিল, 'কী যে বল ছাই চব্বিশ-ঘণ্টা! ও-কথা বোলো না, ছি! মা যদি শুনতে পায়, কি মনে করবে বল দেখি?'

যোগীন বলিয়া উঠিল, 'থাম্‌, থাম্‌, আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তুই চুপ কর্‌।'

মল্লিকা বলিল, 'উপদেশ [illegible]ই কি সাধে? কথা বলতে জানো না যে!'

এবার যোগী[illegible] আত্মসম্মানে আঘাত লাগিবারই কথা। ব[illegible] 'কি, কি বললি? কথা বলতে জানি না? [illegible]মি? আচ্ছা, কথা বল্‌তে জানি কি না ত্যাখ্‌' বলিয়া বিড়ির শেষ অংশটুকু হাত হইতে ঘরের কোণের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঁচু খাট হইতে যোগীন নামিয়া পড়িয়া জামাটা লইবার জন্য দেওয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটের দিকে হাত বাড়াইল।

রাগ করিয়া সে চলিয়া যাইতেছে ভাবিয়া মল্লিকা তাড়াতাড়ি তাহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—তুমি···'

বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

এই অন্ধকার রাত্রে যোগীন যাইবেই বা কোথায়? ধীরে ধীরে আবার সে খাটের উপর উঠিয়া গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সারারাত্রির মধ্যে মল্লিকা আর ভয়ে তাহাকে একটি কথাও বলিতে পারিল না।

পরদিন নায়েবের কাছে মল্লিকা তাহার গলার এক ছড়া সোনার হার দিয়া বলিল, 'এইটে কোথাও বন্ধক রেখে আমায় একশ টাকা এনে দিতে পারবেন নায়েব-মশাই?'

নায়েব বলিল, 'কেন মা, বন্ধক রেখে টাকা আনতে কেন হবে মল্লিকা? বাবুকে না বল্‌তে পার, মাকে বল না! জামাইবাবুকে দিতে হবে বুঝি?'

শেষের কথাটার জবাব না দিয়া মল্লিকা বলিল, 'না, আপনি যেখান থেকে হোক এনে দিন।'

নায়েব হার-ছড়াটি ফেরত দিয়া বলিল, 'এটি তুমি নিয়ে যাও মা, এমনিই আমি এনে দিতে পারব বোধ হয়।'

মল্লিকাকে বাধ্য হইয়া তাহাতেই রাজি হইতে হইল।

এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় দেখা গেল, একশ টাকার একখানি নোট হাতে লইয়া নায়েব মশাই মল্লিকাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

নোটখানি হাতে লইয়া ঈষৎ আনন্দের হাসি হাসিয়া মল্লিকা তাহাকে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কৃতজ্ঞতার অত্যধিক আবেগে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল, মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

দিনকয়েক পরে দোতলার একটা ঘরের মধ্যে বাবা ও মা'র তুমুল ঝগড়া শুনিয়া মল্লিকা হঠাৎ দরজার আড়ালে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ঝগড়াটা কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে; প্রথম হইতে কথাগুলা সে শুনিতে পায় নাই, তবু তাহার বুঝিতে কিছু আর বাকি রহিল না।

অবিনাশবাবু বলিলেন, 'একশ ছেড়ে তুমি এক-হাজার নাও, তার জন্যে ত' কিছু বলছিনে, বলছি শুধু ওই জামাইটাকে দেওয়ার জন্যে।'

সৌদামিনী বলিল, 'থামো। তা কেন বলবে তুমি? তুমি বলছ—আমার জন্যে। ওই যে আমি নিয়েছি, আর তোমার সহ্য হচ্ছে না। বেশ গো বেশ, তোমার সংসারে আমার কোনও অধিকার নেই, তা আমি জানি।'

অবিনাশবাবু বলিতে লাগিলেন, 'না গো না,—আমি শুধু এইজন্যে বলছি যে, ওকে যত দেবে, ও ততই পেয়ে বসবে। দেখলে না, হাজারটা টাকার জন্যে কি কাণ্ডটা করলে ওরা। মেয়েটাকে তার জন্যে কত গঞ্জনাই না সইতে হয়েছে। তবু দিলাম না। দিলাম না শুধু পেয়ে বসবে বলে'। তোমার জন্যে নয়।'

সৌদামিনী বলিল, 'দেবে না তা আমি অনেকদিন থেকেই জানি। ও যে মেয়ে! গরীব লোকের ঘরে বিয়েও দিলাম, তার পর মেয়ে যদি আমার খেতে পাচ্ছি না বলে' হাত পেতে কিছু ভিক্ষা করে ত'—'

বলিতে বলিতে সৌদামিনীর চোখে জল আসিল।

কান্নায় গলাটা তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু সে বলিতে লাগিল, 'অমন জামাইএর হাতে দেখে শুনে তাহ'লে তুমি দিলে কেন,—কেন দিলে? বিয়ের সময় যা দেবার তাই দিয়ে তুমি তাহ'লে ব'লে কেন দিলে না যে, এই শেষ; আর যদি তুই কোনদিন কিছু চা'স্‌ ত' তোর অপরাধ হবে! বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের কোনও অধিকার নেই তা আমি জানি—জানি—জানি। কিন্তু অত আদরে মানুষ-করা মেয়ে আমার,—ভাবি যখন যে, শ্বশুর-বাড়ীতে বাছা আমার দু'বেলা পেট ভরে খেতেও পাচ্ছে

না, তখন তোমার বাড়ীর রাজভোগে যে আমার অরুচি ধরে' যায়···তা জানো? তখন মনে হয়—'

বলিয়া কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না, পালঙ্কের উপর স্বামী বসিয়াছিলেন, সৌদামিনী তাঁহার পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

অবিনাশবাবু তাহার হাতে ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। সৌদামিনীর কান্না তাহাতে দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আজ যদি আমার ছেলেটা বেঁচে থাকতো! বাপ হয়ত' মেয়েকে অবহেলা করতে পারে, কিন্তু ভাই করতো না।'

অবিনাশবাবু এইবার তাহাকে অনেক রকম করিয়া বুঝাইলেন। বলিলেন, 'ছি! এই সামান্য কথা নিয়ে··· বেশ হয়েছে একশ' টাকা জামাইকে দিয়েছ, তার জন্যে এত কেন? আমি শুধু এই কথাই বলছি যে, ও-টাকায় আমার মেয়ের কোনও কাজে লাগবে কি? জামাইটা হয়েছে হতচ্ছাড়া হতভাগার একশেষ, যাত্রার দলে বক্তৃতা করে' আর বাজনা বাজিয়ে ঘুরে' বেড়াচ্ছে, যত টাকাই দাও ওকে, ফুর্ত্তি করে' দু'দিনে ফুঁকে দেবে।'

সৌদামিনী সজল চক্ষে মুখ তুলিয়া তাহার স্বামীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'ওগো থামো তুমি—চুপ কর, তোমার পায়ে পড়ি। মল্লিকা যদি শোনে ত' তার দুঃখের কিছু বাকি থাকবে না।'

অবিনাশবাবু চুপ করিলেন। সৌদামিনীও চোখ মুছিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিল। দেখিল, জানালার পাশ হইতে মল্লিকা তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতেছে। যা' ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। সবই যখন সে শুনিয়াছে, তখন আর বলিতে দোষ কি!

সৌদামিনী ডাকিল, 'মল্লিকা, শোন্!'

লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া মল্লিকা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে অবিনাশবাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়াই সৌদামিনী বলিল, 'ছাখ্ মল্লিকা, ওই হতচ্ছাড়া জামাইটাকে দেবার জন্যে আর যদি কোনোদিন কিছু তোর বাবার কাছে কি আমার কাছে চাস্ ত' তোকে আমার দিব্যি রইলো।'

বলিয়াই সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং তাহার সেই উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিবার জন্য হন্ হন্ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। এবং একাকী সেই আধো-আলোকিত আধো-অন্ধকার বারান্দার মধ্যে মল্লিকা শুধু গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু কথাটা বোধ করি রাগের মুখে বলা সৌদামিনীর উচিত হয় নাই। মেয়ে না-জানি কি মনে করিয়াছে এই কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সারারাত্রি সৌদামিনীর চোখে ঘুম আসিল না। এবং তাহার ফল হইল এই যে, কথাটা মল্লিকাকে ভুলাইয়া দিবার জন্য পরদিন হইতে আদর যেন তাহার আরও শতগুণে বাড়িয়া গেল।

চাকর-দাসী সৌদামিনীর ধম্‌কানির চোটে একেবারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এবং এই কথাই তাহারা সেদিন হইতে খাঁটি জানিল যে, এ-বাড়ীতে চাকরি বজায় রাখিতে হইলে মল্লিকার সেবা-যত্ন করাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

সারা দিবারাত্রির মধ্যে একটি দণ্ডের জন্যও মল্লিকা চোখের আড়াল হইলে সৌদামিনীর চলে না। তৎক্ষণাৎ অম্‌নি চারিদিকে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। বাবুর জন্য মাছ যদি নির্দ্দিষ্ট হয় দু'খানা ত' মল্লিকার চারখানা; বাবু খান একসের দুধ, মল্লিকা খায় দু'সের।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই সৌদামিনী তাগাদা দেয়,—'বলি ও বামুন-মা, লুচি হ'লো?'

বামুন-মা তাড়াতাড়ি লুচি-কয়টি ভাজিতে ভাজিতে বলে, 'এই যে মা, হয়ে গেল।'

লোকজনকে তিরস্কার করা সৌদামিনীর স্বভাব নয়, তবু সে বলিতে ছাড়ে না। বলে, 'মেয়ে সেই কখন চারটি খেয়েছে, তোমাদের বেশ আক্কেল যা-হোক্, দাও তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে—দাও।'

বামুন-মা তাড়াতাড়ি হাত চালাইয়া লুচি ভাজিয়া দেয়। থালার চারিদিকে পঞ্চোপচার ব্যঞ্জন সাজাইয়া সৌদামিনী ডাকে, 'আয় মল্লিকা, খাবি আয়।'

বৈকালে একদফা খাইবার পর এত তাড়াতাড়ি খাইবার ইচ্ছা তাহার না হওয়াই স্বাভাবিক। বলে, 'না মা, এত সকাল-সকাল···'

'সকাল-সকাল কি লা!' বলিয়া মা তাহার আঁচল

ধরিয়া টানিয়া বসায়। বসাইয়া ঠিক ছোট মেয়ের মত আদর করিয়া বলে, 'খা লক্ষ্মী মা আমার, খাইয়ে দিই, নইলে এক্ষুণি বসে আর উঠবে।'

এই বলিয়া মা তাহার নিজের হাতে লুচি ছিঁড়িয়া ছোট মেয়েকে খাওয়াইয়া দিতে থাকে।

ঝি-চাকরেরা দূর হইতে দেখে, আর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে।

বিধাতা হাসেন কি না জানি না।

প্রথমবার যোগীন আসিয়াছিল সপ্তাহ পার হইতে না হইতে, এবার আসিল মাস-দুইএক্ পরে।

সৌদামিনী ঘরের মধ্যে একাকী বসিয়াছিল, অবিনাশবাবু প্রবেশ করিলেন।—'কি গো, জামাই এসেছে?'

এমন ভাবে ঘাড় নাড়িয়া 'হুঁ' বলিয়া কথাটার সে জবাব দিল, দেখিয়া মনে হইল, জামাই আসা সৌদামিনী তেমন পছন্দ করে না।

অবিনাশবাবু বলিলেন, 'কেমন? আমার কথাই ঠিক কি না?'

সৌদামিনী বুঝিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'কী তোমার কথা?'

অবিনাশবাবু ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, 'এবার সে দু'মাস পরে এলো, না? টাকাগুলি সব খরচ করে' তার পর এসেছে। কিছু না দিলে সে আরও আগেই আসতো।'

সহসা পাশের একটা ঘর হইতে হারমোনিয়ামের শব্দ শোনা গেল।

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কে? হারমোনিয়াম কে বাজাচ্ছে?'

সৌদামিনী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলিবার প্রয়োজন হইল না, হারমোনিয়ামের আওয়াজের সঙ্গে যোগীনের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল,—

'পুঞ্জে পুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে চললো সঙ্গিনী, চললো রঙ্গিণী!—'

অবিনাশবাবু লজ্জায় সেখান হইতে অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিলেন। যাইবার সময় স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, 'শোনো!'

গান শুনিয়া মল্লিকা ঘরে ঢুকিল। দেখিল, খাটের মাঝখানে বসিয়া ফুট্‌ হারমোনিয়ামটির উপর একটা বালিস চাপা দিয়া যোগীন তন্ময় হইয়া চোখ বুজিয়া গান গাহিতেছে। কাছে গিয়া বলিল, 'ওগো, ওটা তুমি রাখো। ও ভাল বাজছে না।'

শেষের কথাটা তাহার একেবারেই মিথ্যা। হারমোনিয়াম্ বাজার ভাল-মন্দ সে বোঝে না। বলিল, 'সেরে আসুক্ আগে, তার পর তোমার যত খুশী বাজিও।'

যোগীন জিজ্ঞাসা করিল, 'নায়েব-মশাই তোমাদের কবে কলকাতা যাবে জানো কিছু?'

মল্লিকা বলিল, 'না।'

যোগীন বলিল, 'কাল একবার জিজ্ঞেস্ কোরো ত'! যাবার সময় আমার সঙ্গে যেন দেখা করে' যায়—হারমোনিয়াম্‌টা সারতে দেবো, আর একটা পিক্‌লু বাঁশীর দাম জেনে আসবে।'

মল্লিকা বলিল, 'কেন, তুমি জিজ্ঞাসা করতেও ত' পারো। আমার বাপু লজ্জা করে।'

যোগীন বলিল, 'লজ্জা? আ হা হাহা, লজ্জাবতী লতা গো—!'

মল্লিকা দেখিল, আর খানিকক্ষণ থাকিলেই যোগীন হয়ত বাড়াবাড়ি সুরু করিবে, তাই সে 'আসি' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন মল্লিকার শরীরটা ভাল ছিল না, দুপুর হইতে মাথা ধরিয়াছে, সন্ধ্যায় সৌদামিনী তাহাকে চারটি খাওয়াইয়া দিয়া, মাথাটা তাহার কোলের উপর রাখিয়া টিপিয়া দিতে দিতে বলিল, 'আজ আর ও-ঘরে গিয়ে কাজ নেই মল্লিকা, তুই আমার কাছে শো।'

মল্লিকা কোনও কথা বলিল না, লজ্জায় চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

শেষ পর্য্যন্ত হইলও তাহাই। মল্লিকাকে সৌদামিনী সেদিন আর যোগীনের কাছে যাইতে দিল না।

কিন্তু এম্‌নি মজা, সৌদামিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙিতেই অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া দেখে, মল্লিকা নাই। ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আলো জ্বালিয়া তৎক্ষণাৎ সে এদিক্-ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঝি সুখদাকে উঠাইয়া বলিল, 'ভাখ্ মা, মল্লিকা কোথায় গেল ভাখ্।'

সুখদা বলিল, 'যাও মা ঘুমোও গে যাও!'

কথাটা সৌদামিনী বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'কেন বল্ দেখি ?'

সুখদা বলিল, 'জামাইএর কাছে গেছে, তুমি অমন করছ কেন মা ?'

সৌদামিনী বলিল, 'শরীরটা যে ওর আজ বড্ডো খারাপ করেছে মা, মাথা ধরেছে বল্‌ছিল।'

সুখদা বুঝাইয়া বলিল, 'তুমি অমন কোরো না মা, মেয়ে তোমার মনে-মনে রাগে।'

সৌদামিনী চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, 'তা ত' বুঝি বাছা, কিন্তু আমার বড় ভয় করে। জামাইটে বদ্-রাগী, তার ওপর মেয়ের আমার শরীরটে বড় খারাপ। ওইটিই এখন পুঁজি বাছা, কি ভয় যে আমার হয়, তা তোরা বুঝবি কেমন করে ?'

এই বলিয়া সুখদাকে আর বিরক্ত না করিয়া সৌদামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লণ্ঠনটা নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়াও পড়িল, কিন্তু ঘুম তাহার কিছুতেই আসিল না। হঠাৎ এক সময় দেখা গেল, অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া সে তাহার মেয়ে-জামাইএর ঘরের কাছে জানালার পাশটিতে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জানালায় কোথাও কোনও ছিদ্রপথে কিছু দেখা যায় কি না সৌদামিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক রকম করিয়া প্রথমে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিল। দেখিল, সে সুযোগ কোথাও নাই। তবে, মনে হইল যেন ভিতরে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন চলিতেছে। মল্লিকার উপর সৌদামিনীর রাগ হইল। এমন করিয়া রাত্রি জাগিলে মানুষের অসুখ করিবে না ত' কি! জামাইটা গোঁয়ারের একশেষ, দেখিতেছে, মল্লিকার অসুখ, তবু তাহাকে অনর্থক বক্ বক্ করিয়া রাত্রি জাগাইয়া কি লাভ!

হঠাৎ তাহাদের কথাবার্ত্তার সুর যেন চড়িয়া উঠিল। বাহির হইতেই স্পষ্ট প্রত্যেকটি কথা শোনা যায়। সৌদামিনী কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

মল্লিকা বলিতেছে, 'হারমোনিয়াম্ সারতে তোমার কত লাগবে শুনি ?'

যোগীন বলিল, 'না তোমার আর শুনে কাজ নাই। অমন কথা যখন বলতে পার...'

'তবু শুনিই না!'

'তা দশ-পনেরো টাকা।'

'আর টিক্‌লু বাঁশী না কি বললে ?'

'হ্যাঁ, টিক্‌লু নয়—পিক্‌লু, পি—ক্‌লু।'

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করিল, 'তার দাম ?'

'ঠিক জানি না, তা—আন্দাজ সত্তোর-আশী টাকা হবে।'

মল্লিকা বলিল, 'তাহ'লে ফের্ আর-একশ'।—কেমন ?'

যোগীন কি বলিল শোনা গেল না। বোধ করি ঘাড় নাড়িয়া হ্যাঁ বলিয়াছে।

মল্লিকা একটুখানি থামিয়া জবাব দিল।—'টাকা আমি এবার নিজে চাইতে ত' পারবই না, তুমিও যদি চাও ত' আমার মাথা খাও।'

যোগীন রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'বটে! তাহ'লে ও-সব আমার হবে না? অত দূর থেকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে এলাম হারমোনিয়াম্‌টা...'

মল্লিকা বলিল, 'আনতে কে বলেছিল তোমায়? না আনলেই পারতে!'

যোগীন বলিল, 'ভারি যে ট্যাঁক্ ট্যাঁক্ ক'রে কথা বলতে শিখেছ দেখ্‌ছি।'

মল্লিকা বলিল, 'হ্যাঁ শিখেছি। সেই কথাই বলতে এসেছিলাম, নইলে আজ আর আসতাম না তোমার কাছে।'

যোগীন বলিল, 'আহ্লাদে' মেয়ের ভারি যে দেমাগ্ হয়েছে দেখি!'

মল্লিকা বলিল, 'হ্যাঁ, হয়েছেই ত'! তাই ব'লে বার-বার টাকা তোমার জন্যে আমি চাইতে পারব না বাপু!'

যোগীন বলিয়া উঠিল, 'পারবে না ত' বেরোও এখান থেকে, বেরোও বলছি! আমিও কাল চ'লে যাব, আর কখ্‌খনো আসব না।'

মল্লিকা চুপ!

সৌদামিনী ভাবিয়াছিল, রাগিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিবে নিশ্চয়ই, কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিল, সে আসেও না, কথাও বলে না। অথচ ব্যাপার কি সেখান হইতে কিছু বুঝিবার উপায় নাই। এতদিনের পুরানো জানলা কপাট,—এতটুকু একটা ফুটাও ত' থাকা উচিত!

সে কি আর করিবে, অন্ধকারে কানের কাছে মশা ভন্ ভন্ করিতেছিল, রাত্রি অনেক, ঘুমও পাইয়াছে, অমন করিয়া চোরের মত কতক্ষণই-বা দাঁড়াইয়া থাকে,—সৌদামিনী ধীরে-ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া আবার তাহার নিজের বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

মল্লিকার কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল জানে না, প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখে, মল্লিকা ঠিক তাহার পাশে, সন্ধ্যায় যেমন করিয়া ঘুমাইয়াছিল, তথনও ঠিক তেম্‌নি করিয়াই ঘুমাইতেছে। মনেমনেই ঈষৎ হাসিয়া মেয়ের গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে সৌদামিনী শয্যাত্যাগ করিল।

সকালে জামাইকে চা দিতে গিয়া সুখদা-ঝি চায়ের বাটি হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

চা পাঠাইয়া দিয়াই সৌদামিনী কাপড় কাচিতে গিয়াছিল, মল্লিকা তখন সবেমাত্র বিছানা ছাড়িয়া চাবি-বাঁধা কাপড়ের আঁচলটা মেঝের উপর দিয়া টানিতে টানিতে ঘর হইতে বাহির হইতেছে, সুখদা জিজ্ঞাসা করিল, 'জামাই কোথা গেল মল্লিকা ?'

ধরা-ধরা গলায় মল্লিকা জবাব দিল, 'তা আমি কি জানি!'

বলিয়াই সে কাপড়টা তাহার ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া চোখে-মুখে জল না দিয়াই এক-পা এক-পা করিয়া আগাইতে আগাইতে যোগীন যে-ঘরে শুইয়াছিল, সেই ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরে কেহই নাই। তাহার পর ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে দেওয়ালের ব্র্যাকেট্‌টার দিকে তাকাইয়া দেখে তাহার জামা নাই, জুতা যেখানে থাকে, দেখিল সেখানে জুতা নাই; এদিক-ওদিক তাকাইয়া, খাটের নীচে একবার তাল করিয়া দেখিয়া, দেওয়ালের গায়ে-লাগানো বড় আলমারিটা খুলিয়া ভাঙ্গা হারমোনিয়াম্‌টারও কোনও সন্ধান করিতে পারিল না। বুকের ভিতরটা তাহার ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তবে কি সে সত্যই রাগ করিয়া চলিয়া গেছে? চোখ দুইটা তাহার তৎক্ষণাৎ জলে ভরিয়া আসিল। কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার হাতের উপর দিয়া গড়াইয়া বিছানায় পড়িল। ভাবিল,—যাক্, আবার আসিবে। ভাবিয়া সে তাহার আঁচল দিয়া ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবে, সহসা তাহার চোখে পড়িল, সুমুখের সাদা ধপধপে দেওয়ালের উপর বড় বড় অক্ষরে পেন্সিল দিয়া লেখা—'তোমার নিকুচি করেছে। আমি চললাম। আর আসছি না বাবা।'

মল্লিকা তাড়াতাড়ি তাহার কাপড় দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া দেওয়ালের দাগ উঠাইতে লাগিল।

পেন্সিলের দাগ তখনও সম্পূর্ণ মুছে নাই, এমন সময় দরজায় তাহার মা আসিয়া ডাকিল, 'মল্লিকা!'

আচম্‌কা মল্লিকা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'কি ?'

'জামাই কোথায় রে ?'

মল্লিকার মুখ দিয়া সহজে কথা বাহির হইতেছিল না। ধীরে-ধীরে বলিল, 'চ'লে গেছে।'

'যাক্-গে, আয়।' বলিয়া সৌদামিনী তাহাকে একরকম জোর করিয়াই সে-ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া আনিল।

যোগীনের রাগ বোধ হয় আর ভাঙ্গে না।

এক মাস যায়, দু'মাস যায়, তিন মাসও পার হইতে চলিল, যোগীনের আসিবার নাম নাই।

মল্লিকা চিঠি দেয়, কিন্তু জবাব আসে না।

তিন মাস পর্য্যন্ত কোনো রকমে সে ধৈর্য্য ধরিয়াছিল, এবার ধীরে-ধীরে তাহার ধৈর্য্যের মাত্রা অতিক্রম করিতেছে।

মা তাহাকে কত রকম করিয়া বুঝায়। বলে, 'আমার মত অদৃষ্ট যেন আমার কোনও শত্রুরও না হয় মা! একটা ছেলে ছিল সেও গেল, একটা মাত্র মেয়ে—তাকেও যে কোনো রকমে সুখে রাখব তারও উপায় নেই।'

মল্লিকা আজকাল ভাল করিয়া খায় না, সাজ-সজ্জা এক রকম পরিত্যাগ করিয়াছে, একা থাকিলেই পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে।

মায়ের মন,—জামাইএর উপর যতই বিরূপ হোক্, শেষ পর্য্যন্ত মেয়ের কষ্ট দেখিয়া তাহাকে একটা-কিছু করিতেই হয়।

অবিনাশবাবু একখানা চিঠি লিখিয়া সঙ্গে কিছু আম, সন্দেশ দিয়া জামাইএর বাড়ী লোক পাঠাইয়া দিলেন।

পরের দিন লোক ফিরিয়া আসিল। বুড়া রসিকলালের চিঠিখানি সৌদামিনীর হাতে দিয়া বলিল, 'পড়ে' দেখুন।'

চিঠিখানি সৌদামিনী মল্লিকার হাতে দিয়া বলিল, 'পড়্ ত' মা, শুনি কি লিখেছে।'

অন্য সময় হইলে চিঠি সে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত, কিন্তু এখন আর সে অবস্থা তাহার নয়। চিঠিখানি সে মনে-মনেই পড়িয়া বলিল, 'বুড়োর চিঠি।'

সৌদামিনী বলিল, 'দাদা-শ্বশুরের? কি লিখেছে শুনি!'

'তুমিই পড় না মা!' বলিয়া মল্লিকা কহিল, 'কানা বুড়ো নিজে ত' লিখতে পারেনি, কাকে দিয়ে লিখিয়েছে। লিখেছে, উনি বাড়ী নেই। কল্‌কাতার কোন্ একটা যাত্রার দলে গিয়ে ঢুকেছে। তাদের সঙ্গে বক্তৃতা করে' ঘুরে বেড়ায়। মাঝে একবার এসেছিল। এবার এলে তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে লিখেছে।'

সৌদামিনী বলিল, 'ছি, ছি, ছ্যাথ্ দেখি মা জামাইএর কাণ্ড! যাত্রার দলটা যদি এই দিক পানে কোথাও বায়না-টায়না নিয়ে আসে! লোকে বলবে ত'—অমুক লোকের জামাই!'

এবার মল্লিকার রাগ হইল। বলিল, 'কেন মা, ও-কথা কেন বলছ? এতই যদি লজ্জার ভয় ত' তোমাদের মুখ যাতে না পুড়ে তার ব্যবস্থা ত' করে' দিলেই পার।'

এমন কথা মল্লিকা কোনোদিন বলে না। আজ যে কেন বলিল কে জানে।

সৌদামিনী সেই কথাটাই সারাদিন ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে সেদিন সন্ধ্যায় মল্লিকাকে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া বলিল, 'সেজন্যে তুই দুঃখু করিস্‌নে মল্লিকা, তোর বাবাকে ব'লে সে-ব্যবস্থা আমি করে' দেবো দেখিস্।'

অথচ এতদিন ধরিয়া মুখে না বলুক, মনে-মনে মল্লিকা ঠিক ভাবিয়া রাখিয়াছে যে, বাপের বিষয়-সম্পত্তি এখন সবই তাহার। সংসারে বাজে-খরচ হইলে মল্লিকার রাগ হয়, এক একদিন ইচ্ছা করে, জমিদারী সেরেস্তায় দু'একজন মাত্র ভালো লোক রাখিয়া বাকি সব অকর্ম্মচারী-গুলাকে ছাড়াইয়া দিয়া খরচ কমাইয়া দেয়, বাড়ীতে মাত্র এই তিনজন লোকের জন্য পাঁচজন দাস-চাকরের কোনও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার মা তাহাকে এমন কথা বলিল কেন? বাবাকে বলিয়া তাহার একটা-কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিবার অর্থ সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

কথাটা সেইদিন হইতে মল্লিকার বুকের মধ্যে কেমন যেন সদা-সর্ব্বদাই কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

কিন্তু সে আর কতদিন!

যোগীনের না-আসার দুঃখটাই তাহার কাছে দিনে-দিনে এত বড় হইয়া উঠিল যে, সে-দুঃখটা তাহার আর মনেই রহিল না।

* * *

মাসের পর মাস পার হইয়া যায়—

যোগীন আর আসে না।

মল্লিকার ইচ্ছা, আর একবার সেখানে লোক পাঠায়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সেকথা কাহাকেও বলিতে তাহার লজ্জা করে।

এম্‌নি যখন তাহার মনের অবস্থা, তখন একদিন সে হঠাৎ একটা বড় গোপনীয় তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

আবিষ্কার করিল, সৌদামিনী সন্তান সম্ভবা!

মা'ও আর সে কথা মেয়ের কাছে গোপন রাখিতে পারিল না।

মল্লিকা তাহার দু'চোখ বুজিয়া মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে বসিল। ভাবিল—ছেলে হয়ত' তাহার নাও হইতে পারে, হয়ত' বা তাহার একটা বোন্ হইবে।.....

* * *

যাত্রার দলের সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহুদিন পরে যোগীন বাড়ী ফিরিল—ম্যালেরিয়া ধরাইয়া। অমন

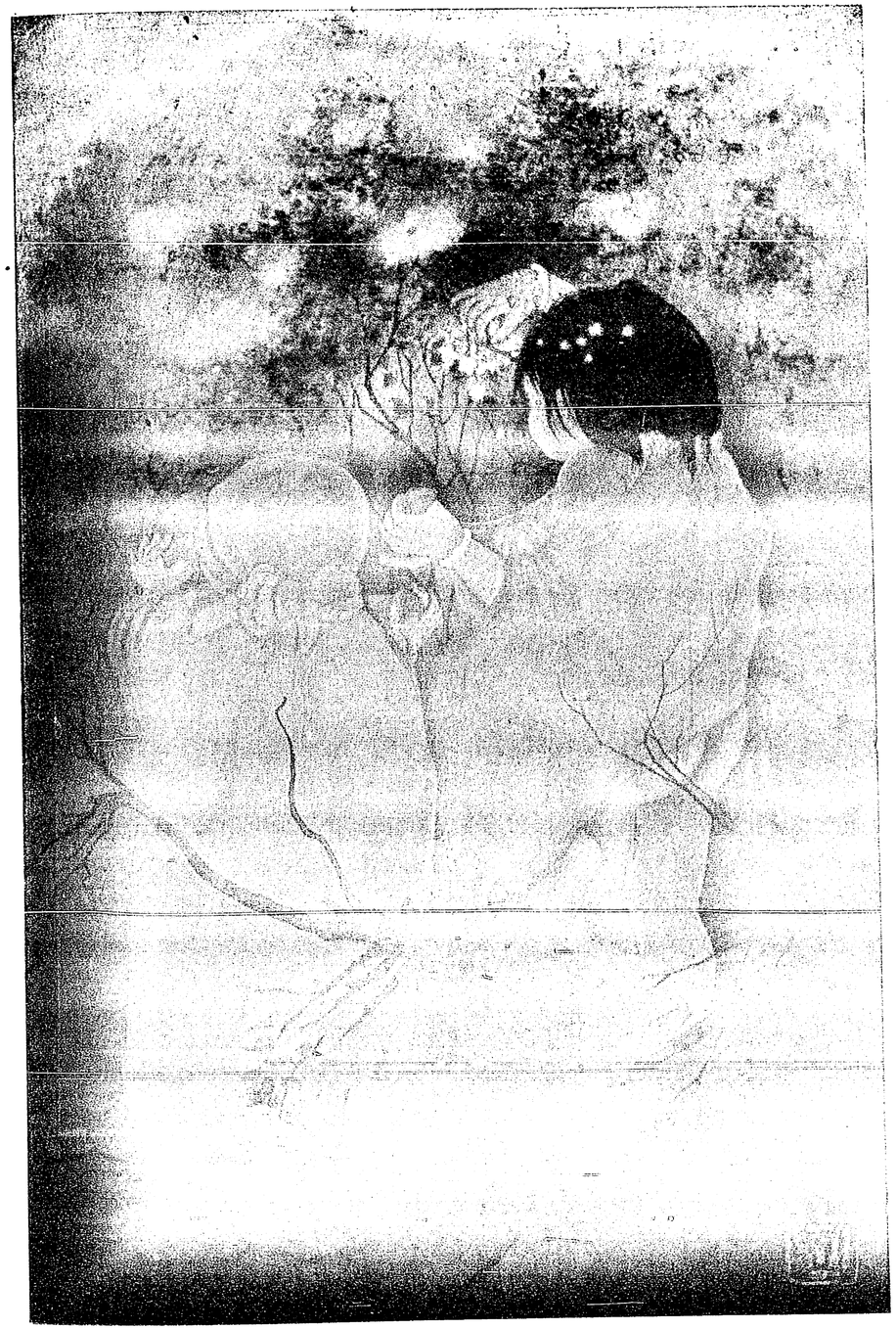

শেফালি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

জোয়ান্ চেহারা তাহার মাসখানেক্ জ্বরে ভুগিয়াই কঙ্কাল-সার হইয়া গিয়াছে।

কামিনী বলিল, 'আচ্ছা হয়েছে! আর যাবি যাত্তার দলে?'

যোগীন বলিল, 'যাব বেশ করব, তোর কি?'

বৃদ্ধ রসিকলাল তাহাকে কাছে ডাকিয়া বুঝাইতে লাগিল, 'বলি ওরে গর্দ্দভ, আমি না তোকে এখন রাগ করতে বারণ করেছিলাম!'

যোগীন বলিল, 'না, করবে না! শ্বশুর-শাশুড়ী কবে মরবে তার ঠিক নেই, তারপর বিষয়-সম্পত্তি পাব কি পাব না—তার জন্যে এখন থেকে আমি ওদের 'চন্নামেত্ত' খাই! মাইরি আর-কি! না খেলেই নয়!'

বৃদ্ধ হিসাবী মানুষ; বলিল, 'না রে দাদাভাই, মাথা গরম করিস্‌নে। বিষয়-সম্পত্তি সামান্য জিনিস নয়, এক কাঠা জমির জন্যে কত লোক জীবন দিয়ে দেয়—তা জানিস? আমার কথা শোন্! অনেকদিন যাস্‌নি, শ্বশুর-শাশুড়ী ভেবে ভেবে খুন হচ্ছে। তুই একবার যা। আর……অম্‌নি পারিস্ ত' কথায়-কথায় রায়েদের পুকুরের কথাটা পেড়ে দেখিস্। শাশুড়ীর কাছে; বুঝলি? আর কারও কাছে নয়। আমি তোকে হদিস্ শিখিয়ে দিচ্ছি।'

অনেকদিন সে মল্লিকাকে দেখে নাই, নিম্‌রাজি সে হইয়াই ছিল, তাহার উপর বৃদ্ধ রসিকলালের বচন; অবশেষে রাগ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য রাজি তাহাকে একদিন হইতেই হইল।

যোগীন 'আজ যাই' 'কাল যাই' করিতেছে, এমন দিনে মল্লিকার এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত!

চিঠিখানি খুলিয়া পড়িতেই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। আর-একবার ভাল করিয়া পড়িল। তাহার পর আর একবার!…বৃদ্ধ রসিকলালের কাছে গিয়া বলিল, 'এই ছাখো, কি সব্বনাশ হয়েছে শোনো!'

রসিকলাল বলিল, 'সব্বনাশ কিসের যোগীন? কার সব্বনাশ?'

যোগীন বলিল, 'কার আবার! বৌএর চিঠি এলো। শাশুড়ীর আবার একটা ছেলে হয়েছে।'

শুনিয়াও রসিকলাল বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, 'ছাখ্ আবার, কার চিঠি বলে' কার চিঠি খুলেছিস্ হয়ত'! লেখাপড়া ত' আর তেমন শিখ্‌লিনে হতভাগা… ছাখ্ আবার, কি পড়তে কি পড়লি ছাখ্।'

যোগীন ভেংচি কাটিয়া বলিল, 'তোমার মাথা! বল্‌ছি মাসখানেক্ আগে শাশুড়ীর একটি ছেলে হয়েছে, তা বুঝি বিশ্বেস্ হচ্ছে না?'

রসিকলাল কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা হাই তুলিয়া হাতের দুই আঙুলে চুট্‌কি দিতে দিতে বলিল, 'মায়া, মায়া, সবই মায়া! সবই পরীক্ষা! তা হোক্, তুই যা। গিয়ে বলবি, বৌকে নিতে এলাম। অনেকদিন যায়নি, ঠাকুরদার বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই আমি বলে' রাখছি যোগীন, এ-ছেলেও টিঁক্‌বে না। তখন বলিস্ যে, হ্যাঁ, বুড়ো বলেছিল।'

বলিয়াই বুড়া একটা বড় রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হেঁটমুখে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বলিল, 'তা হোক্। তুই ভাবিস্‌নি যোগীন, যেমন করে' পারিস্ বৌকে নিয়ে আসবি, তারপর আমি দেখে' নেবো।'

রাধানগর যাইতে যোগীনের দু' চারদিন দেরি হইল।

গিয়া দেখে, জমিদার-বাড়ীতে আনন্দের ঘটা পড়িয়া গেছে। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে যে এই বাড়ীতেই একদিন শোকাচ্ছন্ন ভয়াবহ অন্ধকার নিবিড়ভাবে ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা এখন আর কাহারও মনে নাই।

আহারাদির পর একটুখানি রাত্রি করিয়াই মল্লিকা যোগীনের সঙ্গে দেখা করিল।

যোগীন চুপ করিয়া খাটের উপর বসিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। মল্লিকা ঘরে ঢুকিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার কাছে গিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যোগীন কথা কিছুতেই কয় না, ভাবিল, মল্লিকাই আগে কথা কহিবে।

কিন্তু মল্লিকার কান্না যখন আর কিছুতেই থামে না, যোগীন তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওগো থামো, থামো, জানি, সব জানি। তুমি এক কাজ কর, তার চেয়ে নিয়ে এসো কাল একবার ছেলেটাকে আমার কাছে। দিই টুটি টিপে মেরে'। তারপর মরা ছেলেটাকে তেম্‌নি

শুইয়ে দিয়ে আস্‌বে ধীরে-ধীরে। কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। বুঝ্‌লে?'

যেই কথাটা বলা, জানালার বাহিরে ধুপ্ করিয়া একটা শব্দ শোনা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কে যেন অস্পষ্টভাবে গোঙানি সুরু করিয়াছে।

ব্যাপারটা কি, দেখিবার জন্য যোগীন ও মল্লিকা দু'জনেই লণ্ঠন হাতে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

আসিয়াই দেখে, সৌদামিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া জানালার কাছে পড়িয়া আছে।

ইহার কারণ আর বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে যে স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াছে, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। যোগীন মাথা হেঁট করিয়া পুনরায় ঘরে গিয়া ঢুকিল, মল্লিকা তাহার হাতের লণ্ঠনটা সেইখানেই নামাইয়া দিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া দাসী চাকরকে ডাকিয়া লোক জড়ো করিয়া বাড়ীতে তৎক্ষণাৎ হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিল।

কি একটা মোকর্দ্দমার জন্য অবিনাশবাবু শহরে গিয়াছিলেন তাই রক্ষা।

সুখদা বহুকালের পুরাণো ঝি; সে-ই তাড়াতাড়ি জল আনিয়া সৌদামিনীর চোখে-মুখে ঝাপ্‌টা দিয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার করিল এবং নিজেই তাহাকে সেখান হইতে উঠাইয়া হাতে ধরিয়া ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল।

মল্লিকা তাহার শিয়রের কাছে গিয়া ডাকিল, 'মা!'

কথা বলা দূরে থাক্, মা একবার সেদিক পানে ফিরিয়াও তাকাইল না, তৎক্ষণাৎ পাশ ফিরিয়া সে তাহার নবজাত শিশুপুত্রটিকে হাত বাড়াইয়া আগ্‌লাইয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

মল্লিকা তখন তাহার উদ্‌গত অশ্রুর ধারা আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে ধীর পদক্ষেপে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে, দেখা গেল, লজ্জায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া যোগীন সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে।

বাড়ীর চারিদিকে কেমন যেন একটা ভয়াবহ স্তব্ধতা! যে-মল্লিকার সুখ-সুবিধা আদর-যত্নের জন্য আঁতুড় ঘরেও সৌদামিনীর স্বস্তি ছিল না, সেই সৌদামিনীই আজ নীরব!

মল্লিকা কতবার কতরকম করিয়া মাকে তাহার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে, ইহাতে দোষ তাহার বিন্দুমাত্রও নাই এবং তাহার স্বামীও যে অপরাধী তাহাও নয়। কথাটা সে বলিয়াছিল মাত্র হাসি-রহস্য করিয়া।

কিন্তু সৌদামিনী বোধ হয় সে কথা বিশ্বাস করে নাই। বলিয়াছে, 'হ্যাঁ লো হ্যাঁ আমি জানি, তুই চুপ কর্।'

তাহার পর মল্লিকার সঙ্গে সে যে একেবারেই কথা কয় নাই তাহা নয়, স্নানের সময় স্নান করিতে বলিয়াছে, খাইবার সময় খাইতে ডাকিয়াছে, দু'একটা অন্য কথাও হয়ত' কহিয়াছে, কিন্তু সবই যেন কি রকম করিয়া।

অথচ মল্লিকা নির্দ্দোষ।

সেও আর কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলে না। মুখ ভার করিয়া একাকিনী চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মা'র কাছে বড়-একটা যায় না। যোগীন সেদিন যে-জায়গাটায় বসিয়া নবজাত শিশুটিকে চলা করিবার কথাটা বলিয়াছিল, সেইখানে গিয়া সে খাটের গায়ে ঠাই ঠাই করিয়া মাথা ঠোকে, তাহার পর মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে সুরু করে।

সে-কান্না কেহই তাহার থামাইতে আসে না; নিজেই শেষে এক সময় উঠিয়া বসে, ভাবে, তাহার প্রতি সৌদামিনীর এই যে ভাবান্তর, যোগীনের ওই একটিমাত্র কথাই হয়ত তাহার যথেষ্ট কারণ নয়। ভাবে, হয়ত ওই ভবিষ্যৎ বংশধরটি জন্মাইবার পর হইতেই মা'র মনে তাহার প্রতি বিরাগের সঞ্চার হইয়াছে; তাহার স্বামীর মুখের ওই দুষ্টু কথাটা একটা ছুতা মাত্র।

যে-মেয়ের আদর-সোহাগের একদিন সীমা ছিল না, সেই মল্লিকাই আজ সৌদামিনীর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে—একেবারে দু' চক্ষের বিষ!

দাসী-চাকরেরা ভিতরের ব্যাপার জানে না। তাহারা অবাক হইয়া শুধু দেখে আর ভাবে—জগতে ইহাও সম্ভব।

সৌদামিনীর শিশু-পুত্রের নাম রাখা হইয়াছে—টুকুন্। টুকুন্ ওই অতটুকু ছেলে; মাথায় এক-মাথা কালো-

কালো চুল, গায়ের রং ফর্সা, চোখ দুইটি বড়, মুখের চেহারা দেখিতে অনেকটা মল্লিকারই মত,—মানুষ দেখিলেই সে তাহার কচিকচি হাত-পাগুলি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে! হাসিবার সময় দুই গালে দুটি টোল্ পড়ে, দেখিলেই কোলে লইয়া চুমা খাইয়া আদর করিতে ইচ্ছা করে।

মল্লিকা ভয়ে-ভয়ে সেই ঘরে গিয়া ঢোকে। ছেলেটার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আদর করিতে যায়, মা তাহার মুখখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বলে, 'কেন ওকে বিরক্ত করছিস্ বাছা, ওর ঘুম পেয়েছে।'

বলিয়া সৌদামিনী তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া তাহার কচি শিশুর গায়ে-মাথায় থুপ্ থুপ্ করিয়া চাপ্‌ড়াইতে থাকে। বলে, 'আর হাসতে হয় না,—ঘুমো।'

ক্ষুণ্ণমনে মল্লিকা সেখান হইতে সরিয়া গিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এমন করিয়া বেশি দিন চলে না।

মাস-দুইএর ভিতরেই কথাবার্ত্তা আবার সবই হয়।

মা ও মেয়ের গুমোট্ ভাবটা যেন কাটিয়া গেছে। সৌদামিনী আবার আগের মতই মেয়ের খাওয়া-দাওয়ার সুখ-সুবিধার খোঁজ-খবর সবই রাখে। মল্লিকার ভারি-ভারি মুখ আবার যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

সৌদামিনী সেদিন সকালে বোধ করি খিড়্‌কির বাঁধানো পুকুরে কাপড় কাচিতে গিয়াছিল। টুকুন্ হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

কাঁদিয়া উঠিতেই মল্লিকা ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া টুকুন্‌কে তাড়াতাড়ি তাহার বিছানা হইতে দুইহাত দিয়া বুকে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া চুমা খাইয়া তাহার কান্না চুপ করাইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় ভিজা কাপড়েই ছুটিতে ছুটিতে সৌদামিনী আসিয়া হাজির!

আসিয়াই আর কোনও কথা নাই বার্ত্তা নাই, মল্লিকার কোল হইতে টুকুন্‌কে একেবারে ছিনাইয়া কাড়িয়া লইয়া সৌদামিনী বলিল, 'থাক্।'

বলিয়া ক্রন্দনরত ছেলেটাকে সে আবার তাহার বিছানার উপর শোয়াইয়া দিয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিল।

মল্লিকার দুঃখ হইবারই কথা। দুর্দ্দমনীয় ক্রন্দনের বেগ তখন তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়াছে। লজ্জায় মাথা হেঁট্ করিয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল এবং নিজের ঘরে গিয়া আপন মনেই ফুলিয়া ফুলিয়া খানিক্‌টা কাঁদিয়া সে তাহার স্বামীকে চিঠি লিখিতে বসিল।

—বোকার মত কি কাণ্ড যে করিয়া গেলে। আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। লজ্জা না করিয়া শীঘ্র এখানে আসিয়া আমাকে লইয়া যাও। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর আমার উপর রাগ করিও না।—

* *
*

কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা সহসা একদিন নিজের হাতে সব যেন ভাঙিয়া-চুরিয়া তছ্‌নাছ্ করিয়া দিল!

স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় মল্লিকা এদিকে পথ চাহিয়া বসিয়া আছে, ওদিকে রাধানগরের জমিদারীর উপর বৃদ্ধ রসিকলালের লোভ!..

অবিনাশবাবু সেদিন তাঁহার কাছারী-বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় কোথা হইতে একটি লোক আসিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া একখানি চিঠি তাঁহার পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'ভারি জরুরী চিঠি বাবু।'

চিঠিখানি খুলিয়া অবিনাশবাবু দেখিলেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তাক্ষর। প্রায় ক্রোশ-পাঁচেক্ দূরের বেনাচিতি গ্রাম হইতে চিঠিখানি আসিয়াছে। ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—

যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে নিবেদনমেতৎ—

আমাদের গ্রাম্য বারোয়ারী উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্ব-অঞ্চল হইতে একদল যাত্রাগানওয়ালাদিগকে আনা হয়। গত কল্য রাত্রি হইতে তাহাদের দলের এক ব্যক্তি হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ব্যক্তিটির নিকট বিশেষ সংবাদ লইয়া অবগত হইলাম, আপনার কন্যাকে সে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে, আপনি তাঁহার শ্বশুর। অতএব মহাশয় যদি এবম্প্রকারই হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনি নিজে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সমভিব্যাহারে ত্বরায় আমাদের গ্রামে আগমন করিয়া তাঁহার নিরাময়ের ব্যবস্থা করুন। আমরা গ্রামবাসীরা আমাদের যথাসাধ্য করিতেছি। জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিতি।

যশংবদ
শ্রীজনার্দ্দন দেবশর্ম্মণঃ

চিঠির কথা অবিনাশবাবু কাহাকেও জানাইলেন না। নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, 'চল, আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। সঙ্গে একশ' টাকা নাও।'

বেনাচিতি যাইতে হইলে ট্রেণে চড়িয়া যাইতে হয়। যাইবার পথে গঞ্জে নামিয়া ভাল একজন ডাক্তার সঙ্গে লইয়া বেনাচিতি গ্রামে যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নিস্তব্ধ পল্লীগ্রামের অন্ধকার পথ। সঙ্গের লোকটি পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। বারোয়ারী-তলায় প্রতিমার সুমুখে টিম্ টিম্ করিয়া একটি আলো জ্বলিতেছে। যাত্রার জন্য প্রাঙ্গণের উপর প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছিল। সামিয়ানাটা এখনও তেম্‌নি টাঙানোই রহিয়াছে। লাল নীল নানারঙের কাগজের তৈরী শিকলি-গুলা গ্রামের ছেলেরা বোধ করি টানিয়া ছিঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। সামিয়ানার নীচে গ্রাম্য কয়েকটা কুকুর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সুমুখে এতগুলা লোক দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটা একবার একটুখানি খেউ খেউ করিয়া চীৎকার করিবার চেষ্টা করিয়াই লেজ গুটাইয়া সরিয়া গেল। বারে বারে পিছন্ ফিরিয়া তাকাইতে তাকাইতে কয়েকটা কুকুর ছুটিয়া পলায়ন করিল। বাকি যাহারা শুইয়া ছিল, নিতান্ত নির্ব্বিকার-চিত্তে মুখ তুলিয়া একবার তাকাইয়া দেখিয়াই আবার তেম্‌নি মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াই রহিল।

কিছু দূরে বহুদিনের পুরাতন পোড়ো একটা ভিটের পাশে কয়েকটা আলো দেখা যাইতেছিল। গ্রামের যে লোকটি তাঁহাদের আনিতে গিয়াছিল, আঙুল বাড়াইয়া সেইখানটা সে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'ওইটে সাজ-ঘর। ওইখানেই আছে।'

দেখা গেল, জনকয়েক লোক লণ্ঠন লইয়া ভিটের মাঝখানে চক্রাকারে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। এতগুলি লোক দেখিয়া তাহারা প্রায় সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, 'গোবিন্দ, এলি?' বলিয়াই সে এই আগন্তুক তিনজনের মুখের পানে তাকাইয়া ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, 'বিকেল পর্য্যন্ত কোনো-রকমে রেখেছিলাম মশাই, তারপর আর পারা গেল না।'

বৃদ্ধ-গোছের মোটা-সোটা একজন লোক আগাইয়া আসিলেন, কাঁধে গামছা, গলায় যজ্ঞোপবীত; বলিলেন, 'আমার চিঠিখানা তাহ'লে পেয়েছিলেন ঠিক। আমি ত' মশাই সেই থেকে আর বাড়ী ঢুকিনি, এইখানেই পড়ে' আছি চব্বিশ ঘণ্টা। কি আর করি বলুন, ব্যাটাদের এত করে' বললাম, তা হাজার হোক্ তোদের দলেরই ত' একজন আসামী, বিপদে যখন পড়েছে বেচারা, তা একজন থাক্!' বলিয়াই মুখখানা বিকৃত করিয়া ঘাড় নাড়িয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, 'কেউ থাকলো না। অধিকারী থেকে আরম্ভ করে' মায় সেই বাচ্চা রাধিকাটি পর্য্যন্ত প্রাণের ভয়ে সব পালালো। সাজের বাক্সগুলো এই এতক্ষণে আমি গরুর গাড়ী করে' বিদেয় করে' দিলাম। বললাম, 'যা বেটারা, আমরা ত' আর পালাতে পারিনে, বিশেষ করে' যখন শুনলাম গিয়ে···আমাদের রাখালনগরের···তা আর এখন কেঁদে কি করবেন বলুন, নিয়তি, নিয়তি! যার যেখানে মাটি তাকে সেইখানে···আসুন, ভেতরেই আসুন একবার। ওরে ও বিনোদ, আলোটা ধর্ বাবা ভাল করে'—'

দু'জন লণ্ঠন দেখাইয়া আগে আগে চলিল।

ঘরের চৌকাঠের কাছে কেরোসিনের একটা কুপি জ্বলিতেছিল। চারিদিকে ভ্যাপ্‌সা মাটি ও কাঁচা হলুদের একটা অস্বস্তিকর গন্ধ! শুক্‌নো কতকগুলো খড় ইতস্ততঃ ছড়ানো। দরজার পাশেই মাটির একটা কলসি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে, আর তাহারই পাশে শুক্‌নো খড়ের শয্যায় যোগীনের মৃতদেহ। দয়া করিয়া গায়ে একটা কাপড়ও কেহ ঢাকা দিয়া দেয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার যন্ত্রণার বোধ করি অবধি ছিল না। মুখখানা বিকৃত কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া উঠিয়াছে, হাত-পা কাঠের মত সোজা! তাহার উপর সর্ব্বাঙ্গে হলুদের দাগ।

মল্লিকার কথা ভাবিয়া অবিনাশবাবুর চোখের জল আর কোন প্রকারেই বাধা মানিতেছিল না।

নায়েব-মশাই তাঁহার হাতে ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে বাহিরে আনিলেন।

সৎকারের ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নেই সব প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

গ্রামপ্রান্তে শুষ্ক একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে শ্মশান। প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষের তলায় চিতা রচিত হইল এবং

সেইখানেই দাহকার্য্য সমাধা করিয়া, নায়েব-মহাশয় গ্রামের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন, 'যা-কিছু করতে হয় আপনার ওপরেই ভা দিয়ে আমরা—'

কিন্তু তাহা নাকি হইবা নয়। সকলেই একসঙ্গে হৈ-চৈ করিয়া কথাটা তাঁহাকে শেষ করিতে দিল না। জনার্দ্দন শর্ম্মা টাকাগুলি তাঁহার কাপড়ের খুঁটে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিতে লাগিলেন, 'একে কলেরার রোগী, তার ওপর এখান থেকে ফিরে' গেলে যে গ্রামের অকল্যাণ হবে বাবা, একবারটি সকলে মিলে গ্রামে ঢুকে—বাস্, তারপর তোমরা চলে' যেয়ো।'

গ্রামে ফিরিয়া আর-এক বিপদ বাধিল। একে অজানা পথ, তাহার উপর ঘোর অন্ধকার রাত্রি, ষ্টেশন পর্য্যন্ত আলো লইয়া কেহই তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল না, কাজেই বারোয়ারী-তলায় রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্মশানযাত্রী সকলকেই অপেক্ষা করিতে হইল।

পরদিন একেবারে অতর্কিতে অকস্মাৎ যে দুঃসংবাদ অবিনাশবাবু তাঁহার স্ত্রী-কন্যার কাছে বহন করিয়া আনিলেন, তাহা একেবারে নিদারুণ!

মেয়েকে জড়াইয়া ধরিয়া সৌদামিনী কাঁদিয়া আকুল হইল। মল্লিকার যে কি হইল সে-কথা আর বলিয়া কাজ নাই।

এ ধাক্কা সাম্‌লাইতে তাহাদের অনেক দিন লাগিল।

হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া, নোয়া ভাঙ্গিয়া, কপালের সিঁদুর মুছিয়া, সাদা থান্ পরিয়া শুষ্ক ম্লান মুখে মল্লিকা ঘুরিয়া বেড়ায়। সৌদামিনী দেখে আর কাঁদে। কাহারও মুখে একটি কথা নাই! মনে হয়, এত বড় বাড়ীতে লোকজন কেহ যেন আর বাস করে না। শোকাচ্ছন্ন একটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতায় দিবারাত্রি চারিদিক থম্ থম্ করিতে থাকে।

মল্লিকার ঠিক পাগল হইবার মত অবস্থা।

কাহারও সঙ্গে একটি কথা বলে না, একটা কথা দু'বার বলিতে হইলেই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে, রাগিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে।

খাইবার সময় সৌদামিনী তাহাকে ডাকাডাকি করে, এক ডাকে আজকাল আর তাহার সাড়া পাইবার উপায় নাই, ডাকিয়া ডাকিয়া হায়রাণ হইয়া গেলে পর মল্লিকা হয় ত' মুখ তুলিয়া বলে, 'উঁ!'

সৌদামিনী বলে, 'অমন করলে আর ক'দিন বাঁচবি বাছা?'

মল্লিকা বলে, 'নাই-বা বাঁচলাম।'

সৌদামিনী আর দ্বিতীয় কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করে না। জানে, সে তাহা হইলে এখনই হয় ত' বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে বসিবে। ঘরে খিল্ বন্ধ করিয়া আর সহজে বাহির হইতে চাহিবে না।

সৌদামিনীর শিশু-পুত্রটিকে যোগীন একদিন হত্যা করিতে চাহিয়াছিল, সে-কথা আজ আর তাহার মনে থাকিবার কথা নয়; কিন্তু তাহার ওই অত সাধের পুত্র-সন্তানটির অত বড় অমঙ্গলের কথাটা মনের মধ্যে তাহার এম্‌নি দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে সে ভুলিতে কিছুতেই পারে না। মল্লিকাকে সে তাহার টুকুনের কাছে দেখিলে এখনও আতঙ্কে চমকিয়া ওঠে।

অথচ মল্লিকার সে কথা মনে কিছুতেই থাকে না।

ছেলেটা কাঁদিলে মল্লিকা তাহাকে কোলে করিতেও যায়, হাসিলে সে তাহার যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া নিজেও একটু-খানি হাসিবার চেষ্টা করে।

মা সেদিন খাইতে বসিয়াছিল। খাওয়া শেষ হইলে ঘরে আসিয়া দেখে, টুকুনের শয্যা শূন্য, টুকুন নাই!

থাকো-ঝি বারান্দায় বসিয়া পান সাজিতেছিল, সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলে কোথায় রে থাকো?'

থাকো বলিল, 'দিদিমণি নিয়ে গেলেন হাঁস দেখাতে।'

সৌদামিনীর বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। বলিল, 'কোথায় নিয়ে গেছে?'

'পুকুরের ঘাটে।'

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'নিয়ে আয় বাছা, যা দৌড়ে যা, যা বলছি, যা যা!'

বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া সৌদামিনী তাহার পিছু পিছু সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলে লইয়া ঝি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসিল ততক্ষণ তাহার স্বস্তি রহিল না।

ঝির কাছ হইতে হাসিয়া টুকুন্‌কে নিজের কোলে লইয়া চুমা খাইয়া সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'সে কি করছে?'

থাকো বলিল, 'কি আর করবে মা, কাঁদছে বসে বসে।'

'কেন, পুকুরের ঘাট ছাড়া কাঁদবার আর জায়গা হোলো না?'

বলিয়া সে উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ছেলেকে আদর করিতে লাগিল।

ঘাট হইতে ফিরিয়াই মল্লিকা সেদিন কাঁদ-কাঁদ মুখে মা'র কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও মা!'

সৌদামিনীর মনের অবস্থা ভাল ছিল না। বেশ একটু রাগ করিয়াই বলিল, 'সেখানে কে আছে তোর যে, শ্বশুরবাড়ী যাবি?'

মল্লিকা তাহার কান্নাটা কোনোরকমে এতক্ষণ চাপিয়া ছিল, এইবার সে আবার কাঁদিয়া ফেলিয়া বেশ জোরে-জোরেই বলিল, 'যেই থাক্, সেইখানেই আমি যাব।'

'কেন?'

মল্লিকা বলিল, 'কেন? যাব না ত' কি এইখানে তোমাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে আমায় থাকতে হবে?'

সৌদামিনী অত্যন্ত রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কে তোকে লাথি-ঝাঁটা মারলে লা শুনি?'

ঠোঁটে ঠোঁটে একরকম শব্দ করিয়া মল্লিকা বলিল, 'শুনতে চাও? কেন, জানো না?'

সৌদামিনী চুপ করিয়া রহিল।

মল্লিকা প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না না না, পারব না—পারব না তোমাদের কাছে থাকতে, ওই ছেলে যে বড় হ'য়ে আমায় লাথি-ঝাঁটা মারবে, আর আমি দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্যে···না না তা হবে না, তা হবে না, আমায় পাঠিয়ে দাও।'

বলিয়া চোখে আঁচল চাপা দিয়া মল্লিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছেলের কথায় মা তখন রাগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ও, তাই বুঝি তুই এ ছেলের গলা টিপে মারতে চেয়েছিলি? ও, তাই বুঝি তোরা দু'জনে ষড়যন্ত্র করে' টুকুন্‌কে আমার—'

মল্লিকার চোখ দিয়া তখনও দর্‌দর্ করিয়া জল গড়াইতেছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। চেয়েছিলামই ত!'

বলিতে বলিতে গলাটা তাহার বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া সেখান হইতে সে চলিয়া যাইতেছিল, দেখিল, পশ্চাতে তাহার বাবা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সর্ব্বনাশ! লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মল্লিকা একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়াই দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

শুনিল, বাবা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'কি, হলো কি তোমাদের?'

মা বলিয়া উঠিল, 'ওগো, তাড়াও, তাড়াও, তোমার ওই শত্রুকে তাড়াও বাড়ী থেকে, নইলে তোমার এ ছেলেকে একদিন ও হিংসেয় খুন ক'রে ফেলবে।'

বলিয়া ছেলেকে তাহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া সৌদামিনী কাঁদিতে লাগিল।

এবং এই সামান্য ব্যাপারের ফল দাঁড়াইল এই যে, রাত্রে খাবার সময় ডাকিতে গিয়া মল্লিকাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বাড়ী ছাড়িয়া কখন সে যে চলিয়া গিয়াছে কেহ দেখে নাই।

চারিদিকে খোঁজ্ খোঁজ্ পড়িয়া গেল।

সৌদামিনী সেই যে মেয়েকে তিরস্কার করিয়া ঝির কোলে ছেলে দিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছিল, সে-কান্না তাহার তখনও থামে নাই। মল্লিকাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়াও সে তেম্‌নি পড়িয়াই রহিল। মাত্র সুখদা-ঝিকে একবার কাছে ডাকিয়া বলিল, 'বাবুকে বল্।'

অবিনাশবাবু তাহার পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছেন।

পাইয়া অবধি তাঁহার ছুটাছুটির আর বিরাম নাই।

গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী, প্রত্যেকটি স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও তাহাকে যখন পাওয়া গেল না, তিনি তখন জেলেদের ডাকিয়া পাঠাইলেন।—প্রত্যেকটি পুকুরে জাল ফেলিয়া দেখুক্ সে মনের দুঃখে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে কি না!

কিন্তু কোনও পুকুরেই মল্লিকার মৃতদেহের সন্ধান মিলিল না।

তৎক্ষণাৎ লোক ছুটিল তাহার শ্বশুরবাড়ীতে।

সেখানেও নাই!

তবে সে গেল কোথায়?

অবিনাশবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সৌদামিনী কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু একে জমিদারের বাড়ীর মেয়ে, তায় আবার বিধবা যুবতী।

মান গেল, মর্য্যাদা গেল, অথচ বেশি গোলমাল করিবার উপায় নাই।

* *
*

গল্পের যবনিকা আমরা এইখানেই টানিয়া দিয়াছিলাম। বলিবার আর আছেই বা কি!

বাংলাদেশে মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছে। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সে নয়। লোভ করিয়া যেমন সে সেদিকে হাত বাড়াইয়াছিল, তেমনি উপযুক্ত শাস্তিই তাহার হইয়াছে। উহার জন্য দুঃখ করা আমাদের অন্যায়।

যাই হোক্, সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর আমরা আর কাহারও কোনও সংবাদ রাখি নাই।

কুড়ি বৎসর পরে দেখা গেল, ছোট্ট একখানি গ্রামের প্রান্তে লাল কাঁকরের 'গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডে'র পাশে একটা বটগাছের তলায় কালো রঙের একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে। কোথাকার কোন্ এক বাবু নাকি বন্দুক লইয়া পাখী শীকার করিতে আসিয়াছেন।

বন্দুকের শব্দ পাইয়া দলে দলে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা শীকারী দেখিতে যাইতেছিল। কাহারও বাপ-মা হয়ত' ছেলেমেয়েদের জোর করিয়া ধরিয়া রাখিলেন।—'খবরদার যাস্‌নে বলছি, একটা গুলি যদি ধাঁ করে' এসে' লাগে ত'—বাস্।'

কিন্তু কৌতূহলী ছেলের দলকে আট্‌কাইয়া রাখা দায়!

দেখিতে দেখিতে গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল,—যিনি আসিয়াছেন, তিনি রাধানগরের জমিদারের ছেলে, কোট-প্যাণ্ট্-পরা সাহেবের মত চেহারা!

ছোট্ট গ্রামের ততোধিক ছোট এক জমিদারের ছোট একটি ঠাকুর-বাড়ী। ঠাকুর-বাড়ীর পাশেই ঘাট-বাঁধানো পুকুর। পুকুরের পাড়ে বড় বড় অনেকগুলি তেঁতুলের গাছ।

হঠাৎ সেই তেঁতুলগাছের তলায় দুড়ুম্ করিয়া একবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। ঠাকুরের ভোগ-মন্দিরে বিধবা যে-মেয়েটি রান্না করিতেছিল, সংবাদটা তাহারও কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে; গুলির আওয়াজে চমকিয়া উঠিয়া মেয়েটি তৎক্ষণাৎ খিড়্কির দরজা খুলিয়া পুকুরের পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, চমৎকার একটি ছেলে, সাদা ধপ্‌ধপে সাহেবদের মত গায়ের রং, মাথায় টুপি, হাতে বন্দুক, উপরের দিকে তাকাইয়া তেঁতুলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছে।

অতিকষ্টে বার-কতক্ ঢোক্ গিলিয়া এদিক-ওদিক্ তাকাইয়া মেয়েটি ডাকিল, 'টুকুন্!'

ডাকিবামাত্র অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল। চোখ দুইটি ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল।

কে ডাকিল বুঝিতে না পারিয়া ছেলেটি আচম্‌কা পিছন্ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ডাকছেন?'

মল্লিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না। যে-মেয়ে আজ বিশ বৎসর বাড়ী হইতে পালাইয়া আসিয়াছে, সে-হতভাগীর পরিচয় দিয়া আর কাজ নাই।

হেঁটমুখে চোখের জল গোপন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'না।···ডাকিনি।'

বলিয়াই সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পিছন্ ফিরিয়া চলিয়া আসিল।

ডাক্-নাম ধরিয়া কে কোথায় তাহাকে পিছু ডাকিল তাহার সন্ধান লইবার মত অবসর তখন টুকুনের নাই। যে-পাখীর সন্ধানে সে এতদূর ছুটিয়া আসিল, সেই ঘুঘু আবার আকাশে উড়িয়াছে। তাহারই সন্ধান করিতে

করিতে সে বন্দুক হাতে লইয়া কয়েকটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পুষ্করিণীর পাষাণ-চত্বরে দাঁড়াইয়া মল্লিকা চোখ মোছে আর দেখে,—আবার চোখের জল গড়াইয়া আসিয়া দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা করিয়া দেয়।

তবু দেখা যেন তাহার শেষই হয় না।

এদিকে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া খিড়্‌কির দরজায় তখন পাড়ার দু'জন বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মল্লিকা ফিরিয়া আসিতেছিল, একজন বলিল, 'কিলা, সায়েব দেখতে গিয়েছিলি নাকি? ইদিকে তরকারি যে তোর পুড়ে গেল।'

মল্লিকা বলিল, 'সায়েব কেন হবে দিদি, আমার ভাই।'

'ভাই?' বলিয়া মেয়েটা মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া পাশের মেয়েটির গায়ে একটা ঠেলা দিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'জমিদারের ছেলে তোর ভাই? মা'র পেটের ভাই নয় ত?'

'ভাই' বলা তাহার উচিত হয় নাই। মল্লিকা তাড়াতাড়ি ভোগ-মন্দিরে গিয়া ঢুকিল।

খুন্তি দিয়া কড়াইএর তরকারিটা একবার নাড়িয়া তাহারই শব্দে নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া ধীর মৃদুকণ্ঠে মল্লিকা আপন মনেই প্রশ্ন করিল, 'ভাই টুকুন, আমার মা বেঁচে আছে ত? বাবা?'

বলিতে বলিতে বুকের ভিতরটা তাহার মোচড়্ খাইয়া উঠিতেই সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হাতের উল্টাপিঠে চোখের জল মুছিয়া সে উনান হইতে তরকারি নামাইবার জন্য সাঁড়াশীটা তুলিয়া লইল। সহসা বহুদূরে আবার একটা বন্দুকের আওয়াজ হইতেই আচম্‌কা চমকিয়া উঠিয়া কড়াইসুদ্ধ গরম তরকারি তাহার পায়ের উপর উল্‌টাইয়া ফেলিয়া মল্লিকা ভাল করিয়াই কাঁদিতে বসিল।

নামের ভাষ্য

রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্বেতকেতু বলিলেন, নামই সার। সংসারে নাম বই আর কিছুই নাই।

কালকেতু সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন: প্রভো, কথাটি খুব সত্য। মানুষ শুধু নামের কাঙ্গাল। নাম কিনিবার জন্য পাগল। সংসারে নামের মত আর একটি জিনিষও দেখি না।

ধূমকেতু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল: পিতঃ! আপনার কথা শিরোধার্য্য। কিন্তু আমার মনে হয়, অর্থ না থাকিলে নাম মিথ্যা। অর্থই সব। সংসারে নাম যশঃ প্রতিষ্ঠা সব অর্থের অনুগামী।

কালকেতু তাহাকে ঈষৎ একটু ধাক্কা দিয়া বলিলেন: না, না, অর্থ না থাকিলেও নামের সার্থকতা আছে। মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত দেখ না! অর্থনাই, কিন্তু জগৎ-যোড়া নাম। বিলাতের নরনারী চক্ষুতারকা ললাটে তুলিয়া তাঁহার পথপানে চাহিয়া আছে।

ধূমকেতু বলিল,—আমাকে মাফ করিবেন পিতঃ। অর্থ ব্যতীত যে নাম, সে নাম নিরর্থক। আজ আছে, কাল নেই। হাঁ কি না, গুরুদেব বলুন।

এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্বেতকেতু কিছুক্ষণের জন্য নয়ন নিমীলিত করিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। তার পরে ধীরে ধীরে প্রথমে বামচক্ষুর অর্দ্ধেক ও পরে দক্ষিণ চক্ষুর এক তৃতীয়াংশ উন্মীলিত করিয়া বলিলেন:

'ঠিক বলিয়াছ, বৎস। অর্থশূন্য নাম ব্যর্থ। নামের সহিত অর্থ থাকিলে, তাহাই যথার্থ।'

ধূমকেতু উৎফুল্ল হইয়া বলিল,

অতএব—

কালকেতুও পরম নির্ভরের সহিত বলিল:

অতএব।

গুরুদেব এইরূপ একটি জটিল বিষয়ের সর্ব্ববাদিসম্মত

মীমাংসা করিতে সক্ষম হওয়ার আনন্দে বলিয়া ফেলিলেন 'অতএব—'

কালকেতু বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে বলিলেন 'অতএব?—অতএব বলিলেই হইল? এই দেখুন না, শত শত লোক একটু নামের জন্য রাশি রাশি অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেছে! রে মূর্খ! ইহাতেও কি চৈতন্য হইল না যে, নামই সব!' নামের তুলনায় অর্থ তুচ্ছ, অসার, বাজে!

শেষোক্ত বাক্যগুলি কালকেতু পুত্রের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন।

ধূমকেতু আধুনিক পুত্রোচিত বিনয়ের সহিত বলিল, "মানি। অবশ্যই মানি। কিন্তু আপনার কথা হইতেই কি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয় না পিতঃ (অনুপ্রাস ক্ষমা করিবেন।) যে সে ক্ষেত্রে অর্থ না থাকিলে নাম কখনও সার্থক হইতে পারিত না?"

কালকেতু এই মৃদু প্রতিবাদ যেন শুনিয়াও শুনিতে পাইলেন না! তিনি উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন:

'পৃথিবীতে নামের মত কিছু নাই। কোনও জিনিষ জানিতে হইলে আমরা আগে চাই তার নাম। শিশু জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে তাহার একটি নাম হওয়া চাই। তার পর শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় যখন শিশু দিনে দিনে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার নামেরও বেশ পসার বাড়ে। মাসী রাখিলেন নাম ভজু কিম্বা দাসু। পিসি রাখিলেন নাম পটোল কিম্বা পশু। ঠাকু'মা রাখিলেন নাম বংশের প্রদীপ। পিতা মাতা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া এমন কি দুই একদিন দাম্পত্য কলহের পর অনাহারে কাটাইয়া নাম দিলেন হয়ত 'ভুজঙ্গমেন্দু'। রে পাপিষ্ঠ! (পুত্রের প্রতি) কোথায় ইহার অর্থ? যাক্! নামের অন্ত নাই। সব সময়ে নামের কোনও সঙ্গত কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু নামই সর্ব্বস্ব। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই নাম-ই বস্তু ডাকটিকিটের মত লট্‌কাইয়া থাকে। আমি কে? কালকেতু। কালকেতু কে? আমি।'

শ্বেতকেতু জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন: 'নাম নামী অভেদ। যেই নাম, সেই নামী।'

কালকেতু। শুধু তাই নয়, গুরো। নামের সহিত নামীর উত্থান, পতন, স্থিতি ও লয়। একবার নাম করিয়া লইতে পারিলে আর চিন্তা থাকে না। তুমি দেশের নেতা—একবার নাম হইলে, শেষে যা খুসী করিয়া যাও, তোমার নেতৃত্ব অটুট থাকিবে। এইখানে, মূঢ় (পুত্রের প্রতি) নামের সহিত অর্থের সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। জাতীয় ভাণ্ডার হউক, দুঃস্থ ভাণ্ডার হউক, বন্যা-সাহায্য-ভাণ্ডার হউক, সব ভাণ্ডার তোমার দক্ষিণ হস্তের নিকট উন্মুক্ত। দক্ষিণ হস্তে তাহা তুমি আত্মীয়-পরিজনকে দিলে বাম হস্ত তাহা জানিতে পারিবে না। নাম স্থির থাকিবে, অথচ অর্থ উধাও হইবে। আবার এমনও ভাগ্যদোষে ঘটে যে, অর্থ স্থিরই রহিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে দোষ ঘটিয়া নাম উধাও হইল। অতএব, সাবধান।'

শ্বেতকেতু বলিলেন:

'বৎস, অর্থ-বিত্ত যায়, যাউক। নাম ছাড়িও না। দুর্ল্লভ মানবজীবন সার্থক হয় নামের মহিমায়—এ কথায় কোনও সংশয় করিও না।'

'শুন্‌লি, রে দুরাত্মন্?' কালকেতু পুত্রকে পুনরপি বলিলেন। 'অর্থ যায়, বিত্ত যায় যাউক, 'নলিনী দলগত জলমতি তরলং' রূপ জীবের জীবনে নামের ন্যায় কিছু আছে? অর্থ গেলেও যদি নাম থাকে, তবে আবার অর্থ আসিতে কতক্ষণ? বেঙ্গল কেমিক্যাল কোম্পানীর কাশকুসুম তৈলের নাম পড়িয়া গিয়াছে। যতদিন নাম থাকিবে, ততদিন অর্থাগমেরও বাধা নাই। তা সরগুজার তৈলই দিক্ বা কাঁকরোলের তৈলই দিক্। ব্যারিষ্টার ভীষণচরণ দস্তিদারের নাম খুব। সুতরাং এখন আর তাঁহাকে পায় কে? একবার শুধু হাকিমের এজলাসে গিয়া হাজির হইলেই হইল। নামের কৃপায়ই এমন হয়। সুতরাং নামকে প্রণাম কর।'

শ্বেতকেতু বলিলেন: নামের গুণে আপনি নত হইবে, কোনও চিন্তা নাই।

কালকেতু। হাঁ, সোণার উপর মিনা করার মতো নামের সঙ্গে নত হওয়া শোভন হয়, নাম হইলে সঙ্গে সঙ্গে বুক ফুলিয়া উঠে, মাথা শালতাল তরুর ন্যায় উন্নত হয়। কিন্তু চাপিয়া রাখিলে ভাল দেখায়। পাণ্ডিত্যের

জন্য তোমার চারি দিকে নাম পড়িয়া গিয়াছে, তখন ধরাখানা তোমার নিকট নিতান্ত একটুখানি মধুপর্কের বাটীর মত ঠেকিলেও সে ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। কেন না হয় ত কোনও দিন তোমার বিদ্যা ধরা পড়িয়া যাইবে। কাজেই আগে থেকে একটু নত হইলে মন্দ হয় না।'

ধূমকেতু ঈষৎ হাসিল। বলিল, গুরুদেব সূত্রাকারে যাহা বলিয়া দিলেন, পিতৃদেবের প্রাঞ্জল ভাষ্যে তাহা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, শুধুই নাম। আর কিছু নাই। নাম দেখিয়া জিনিষ কিনিলাম, পয়সা গেল জলে। বিজ্ঞাপন দেখিয়া ঔষধ কিনিয়া খাইলাম, সে রোগ ত সারিলই না, উপরন্তু অন্য রোগে ধরিল। সুতরাং বারো হাত শশার তেরো হাত বীচি। এসব ক্ষেত্রে নামই সর্ব্বস্ব, আর কিছু নাই।'

শ্বেতকেতু প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন: নামই সব। নামী হইতে নাম বড়—এ সম্বন্ধে সংশয় নাই। ইহা নিশ্চিত, ইহা সত্য। রাম স্বয়ং সাগর-জলে পাষাণ ফেলিয়া দিলে, তাহা তলাইয়া গেল অতল তলে। কিন্তু বানরেরা 'জয় রাম' বলিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর ফেলিয়া দিলে, তাহা রহিল ভাসিয়া।

আরও দেখ, সত্যভামা যখন শ্রীকৃষ্ণের সমান ওজনে সোণা মাপিয়া দিলেন, তখন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ ভারী। আর তুলসী দলে তাঁহার নাম লিখিয়া দিলে সেই নাম ভারে নামিয়া গেল নিম্নে, আর শ্রীকৃষ্ণ হালকা হইয়া উঠিলেন ঊর্দ্ধে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার নাম হইল বড়। বৎস, নাম কর, নাম কর।

কালকেতু হাই তুলিতে তুলিতে তন্দ্রালু হইতেছিলেন। নাম করিবার প্রসঙ্গ উঠিতেই বলিলেন:

'আমিও সেই কথা বলি, গুরুদেব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারি যুগেই নাম সত্য। জন্ম-পত্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তিম যাত্রা পর্য্যন্ত নামেরই সম্বন্ধ। আমরা বাল্যকালে যে নাম পিতা মাতা মাসী পিসী হইতে প্রাপ্ত হই, তাহার বহর বাড়াইয়া লই যৌবনে। পরীক্ষা পাশ করি, অনারারি কর্ম্ম করি বা রাজ-সরকারে উপাধি পাই, নামের দৈর্ঘ্য অল্পে অল্পে বাড়িয়া যায়। এই দৈর্ঘ্য যত বাড়ে তত অভিমানের গোড়া স্ফীত হয়। বক্ষ স্ফীত হয়। মস্তিষ্ক স্ফীত হয় এবং সম্ভবতঃ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের হিসাবও স্ফীত হয়। এইরূপ নাম যদি তুলাদণ্ডের এক দিকে চাপাইয়া দেওয়া যায় এবং সেই নামধারীকে অপর দিকে চাপানো যায়, তাহা হইলে সত্যভামার হস্তে শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটে। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

ধূমকেতু কিছুক্ষণ ভাবিল, তার পরে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল 'শুধু নাম আর অর্থে হইলেই হয় না!—তার সঙ্গে যদি একটু রূপ থাকে—'

ধূমকেতুর ঐ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভাব ছিল। ধূমকেতুর কথায় তাহার পিতার মুখখানি অর্দ্ধ সেকেণ্ডের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র মলিন হইল।

শ্বেতকেতু তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া বলিলেন: বৎস, ঠিক বলিয়াছ। নামরূপ লইয়াই জগৎ। ঘটের একটি নাম আছে, একটি বিশেষ রূপ আছে; পটেরও একটি নাম আছে, একটি রূপ আছে। এই ঘটপটাদির দ্বারা আমাদের সংসার।

ধূমকেতু হতাশভাবে নিজের কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল—যাহাদের নাম নাই, তাহাদেরই রূপ হয় কেন? বিধাতার উচিত ছিল একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেওয়া। নামও থাকিবে, রূপও থাকিবে, তবেই ত সোণায় সোহাগা। সে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল:

গুরুদেব, সংসারে বেশীর ভাগ কুরূপেরই নাম দেখা যায়। বলুন, মিথ্যা কথা?

শ্বেতকেতু এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ধূমকেতু জানিত যে গুরুকে প্রশ্নের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া অনধীত বিদ্যা লাভ করা যায়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। ধূমকেতু উপর্য্যুপরি প্রশ্নের দ্বারা গুরুদেবের নিকট হইতে বিদ্যা লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। কারণ পঠদ্দশায় ধূমকেতু ঘুমে বারো আনা সময় অতিবাহিত করিয়া দিয়াছিল।

শ্বেতকেতু ধূমকেতুর শুশ্রূষা বা শুনিবার ইচ্ছা বলবতী দেখিয়া নিম্নোক্ত বাক্যগুলি বলিয়াছিলেন:

হে বৎস, নাম সত্য। অরূপের নাম আছে বই কি? যিনি অরূপ, অস্পর্শ, অব্যয়, তাঁহার নামই সত্য।'

ধূমকেতু, আপনার হেঁয়ালি কথা বুঝিতে পারা কঠিন।

এই বলিলেন, নাম রূপ লইয়াই জগৎ। আবার বলিতেছেন যাহার রূপ নাই, অর্থাৎ কদাকার, অস্পর্শ অর্থাৎ যাহাকে ধরিবার ছুঁইবার উপায় নাই, অব্যয় অর্থাৎ যাহার ব্যয় নাই,—কৃপণ, তাহারই নাম সত্য। এ ব্যাপার বুঝিতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পূর্ণ অপারগ।

কালকেতু হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—

'অরে বাচাল! গুরুদেবের তত্ত্বকথা তুই বুঝিতে পারিবি? আমার অনেক সময়ে মাথা বিঘূর্ণিত হয়, আর তুই এত সহজে, এত অল্প আয়াসে সবটুকু বুঝিয়া ফেলিবার স্পর্দ্ধা করিস? গুরুদেবের চরণ সার কর। বুঝিস্, চাই না বুঝিস্। তবেই বাঁচিতে পারিবি। বাঁচিতে হইলে জানিবি, নামই সত্য—যেমন গুরুদেব বলিতেছেন, অবিকল সেইরূপ।'

ধূমকেতু একটু অপমানিত বোধ করিয়া কিঞ্চিৎ পরুষ ভাবে, অথচ বিনয়ের মাত্রা লঙ্ঘন না করিয়া বলিল, 'শুধু বাঁচিতে হইলে কেন, মরিতে হইলেও নাম সত্য। আপনি কি দেখেন নাই পিতঃ যে এক শ্রেণীর লোক মরিলে শব বাহকেরা 'রাম নাম সত্য হ্যায়, রাম নাম সত্য হ্যায়' বলিয়া চীৎকার করে?

শ্বেতকেতু বলিলেন: 'হ্যাঁ বৎস, জীবনেও নাম, মরণেও নাম। জীবের অন্য গতি নাই।'

ধূমকেতু বলিল, 'বুঝিলাম। কিন্তু মরণের পরে নাম যে সত্য এ অভিজ্ঞতাটুকু বড় বিলম্বে আসে।'

কালকেতু স্বীয় বিশাল উরু দেশ চাপড়াইয়া বলিল, 'না, আমি এ কথা স্বীকার করি না। নাম যদি কখনও সত্য হয়, তবে তাহা মরণের পরেই। জীবিত থাকিতে হয় ত ছেলেরা একবারও পিতার নাম করে না, শ্রাদ্ধের সময় চৌদ্দপুরুষের নাম না করিয়া উপায় নাই। আদালতে নাম পত্তন করিবার সময়ও নাম চাই। উইল থাকিলে ত কথাই নাই। মরণেই ত নামের মহিমা বাড়ে।'

ধূমকেতু ভাবিল, তাহার পিতা কবে এই মহিমা অর্জ্জন করিবেন! সে জানিত তাহার পিতা মিতব্যয়ী।

শ্বেতকেতু পিতা-পুত্রের কলহ-সম্ভাবনা দেখিয়া আতঙ্কিত হইলেন এবং উপদেশের ছলে বলিলেন:

'বৎসগণ, কলহে নৈব নৈব চ। প্রেম চাই। নাম হইতেই প্রেম হয়।'

ধূমকেতু চক্ষু-তারকা সঙ্কুচিত করিয়া বলিল, 'প্রেম! বলেন কি, গুরুদেব? প্রেম! অহহ! এ অতি অপূর্ব্ব কথা আপনার মুখে!—

কালকেতু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'ওহে বাপু, চমকাও কেন? কথাটা ভাল করে' তলিয়ে বুঝে নাও। নাম থেকেও প্রেম, বুঝলে, বাপু। এ নাম থেকে প্রেম। কঠিন খেজুর গাছ থেকে রস। কাটারি চাই, দড়ি চাই, পাত্র চাই, গাছে উঠতে জানা চাই, তবে ত রস। সেই রকম, নাম আগে তার পরে প্রেম।'

ধূমকেতু করযোড়ে বলিল, 'আমায় মাফ করবেন, পিতঃ। আপনার ভাষ্য ঠিক এ স্থলে তেমন প্রাঞ্জল হচ্ছে না। গুরুদেবের কথা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। প্রেম!—প্রেম! প্রেম না হ'লে শোভা হয় না। ধোপ দেওয়া কাপড়ে ইস্ত্রীর মত নামের সঙ্গে প্রেম। উজ্জ্বল হবে কেন, তা নইলে?

কালকেতুর বদনমণ্ডল তৎকালে আসন্নবর্ষণ আকাশের ন্যায় ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে মৃদু সঙ্গীতের ধ্বনি কর্ণগোচর হইয়াছিল। বর্ষাকালের নির্ঝরের কুলুকুলু নাদের ন্যায় উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলে শ্বেতকেতু সস্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন: 'মধুর! মধুর। সংকীর্ত্তনের ধ্বনি ধীরে ধীরে কর্ণগোচর হইতেছে না? এইবার নামের প্রভাব বুঝিতে পারিবে।

কালকেতু বলিলেন: প্রভো। এ বোধ হয় কোনও ঝড়-বাদল-নিবারিণী সভার কেত্তন বাহির হইয়াছে। চাই চাঁদা। আমিও অপ্রস্তুত নহি। পকেটে তিন আনার পয়সা আছে। সমস্ত উজাড় করিয়া দিব। নাম করিতে হইলে মুক্তহস্ত হওয়া দরকার। আর বলুন না, রাখিয়া যাইব কাহার জন্য? বাপধন ত প্রেমের নাম শুনিয়াই অজ্ঞান।'

সংকীর্ত্তন আরও নিকটবর্ত্তী হইল। ধূমকেতু চাপা গলায় বলিয়া উঠিল: আঃ—এ আর কেহ নয়, হতভাগা চন্দ্রকেতুর কাজ। পাড়ার যত বয়াটে ছোঁড়াদের জুটিয়ে নিয়ে নাম বিলাতে লেগেছেন।'

সংকীর্ত্তন যখন নিতান্ত নিকটে আসিয়া পড়িল, তখন শ্বেতকেতু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কালকেতু চোখে একটুখানি জল আনিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ধূমকেতু অপর দিকের দরজা দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগের ইংরেজীনবীশগণের মধ্যে কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত ছিল। তৎকালীন ইংরেজী ও বাঙ্গলা সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি ও সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে কাশীপ্রসাদের বহুমুখী প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ দেখা যাইত।

সন ১২১৬ সালের ২২এ শ্রাবণ (ইংরেজী ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট) কাশীপ্রসাদ খিদিরপুরে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আলয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপ্রসাদের পিতৃপুরুষগণের আদি নিবাস হাবড়া জেলার অন্তর্গত পৈতাল গ্রামে ছিল। তাঁহার পিতামহ মুন্সী তুলসীরাম ঘোষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ-কুঠীর দেওয়ান বা খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মসূত্রে ঢাকায় বাস করিতেন। এই কার্য্যে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। ১২০৫ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া শ্যামবাজারে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তুলসীরামের দুই পুত্র—শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ। শিবপ্রসাদের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নীর গর্ভে কাশীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে কৈলাসনাথ, তারকনাথ ও শম্ভুনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত কাশীপ্রসাদ খিদিরপুরে মাতামহালয়ে লালিত-পালিত হন। মাতামহের অতি আদরে এই সময়ে তাঁহার শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। কেবল কিছু কিছু বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ফার্সি তাঁহার পড়া হইয়াছিল। অবশেষে পিতৃ শাসনে ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মে। রামনারায়ণ জামাতাকে অনুরোধ করিয়া কাশীপ্রসাদের ইংরেজী শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কালেজে তিন শত টাকা জমা দেওয়াইলেন (হিন্দু কালেজে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল)। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর কাশীপ্রসাদ হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহার শিক্ষালাভের সময় অনেক নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিভার লক্ষণ এই যে, সাধারণ লোকে যে সময়ে যতখানি কার্য্য করিতে পারে, প্রতিভাবান লোকরা তদপেক্ষা অনেক কম সময়ে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারেন। কাশীপ্রসাদের প্রতিভার অভাব ছিল না। তিনি সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া তিন বৎসরের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। হিন্দু কালেজে তিনি সর্ব্বসমেত আট বৎসর ছিলেন। প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিনি এই আট বৎসরে সর্ব্বসমেত তিনটি সুবর্ণ-পদক, পাঁচটি রৌপ্য-পদক, তিন শত পঞ্চাশখানি পুস্তক ও নগদ ছয় শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

ছাত্রাবস্থাতেই—১৮২৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে অধ্যাপক এইচ, এইচ, উইলসনের উৎসাহে কাশীপ্রসাদ 'তরুণ কবির প্রথম প্রচেষ্টা' শীর্ষক একটি ইংরেজী কবিতা, এবং জেমস মিল রচিত ভারতের ইতিহাসের প্রথম চারি পরিচ্ছেদের সমালোচনা করিয়া একটি ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী কাশীপ্রসাদ কালেজ ত্যাগ করেন। ঐ বৎসর ১৬ই জানুয়ারী লাটপ্রাসাদে পারিতোষিক বিতরণ সভায় বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টের সমক্ষে ঐ সমালোচনা-প্রবন্ধটি পঠিত হয়। ইহা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সরকারী গেজেটে (অথবা Monthly Register for British India and its Dependency) সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ আংশিক ভাবে মুদ্রিত হয়, এবং পরে এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সম্মান বালক কাশীপ্রসাদের প্রতিভার পুরস্কার। ঐ বৎসরই তিনি লাটপ্রাসাদে মার্চ্চেণ্ট অব ভেনিস নাটকের সাইলকের ভূমিকা এমন সুন্দরভাবে অভিনয় করেন যে, লাটসাহেবের অতিথিগণ পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া

কাশীপ্রসাদ তৎকালীন হিন্দু কালেজের অধ্যাপক সুবিখ্যাত কাপ্তেন রিচার্ডসন, ডিরোজিয়ো, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট সম্মান, সমাদর ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে—তাঁহার সহৃদয়তা-গুণেও তিনি কালেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। একবার কালেজের প্রিন্সিপ্যাল বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হন, এবং তাঁহার সেবা করিতে যাইয়া একজন অধ্যাপকও ঐ রোগে আক্রান্ত হন। এরূপ অবস্থায়, উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষার অভাবে তাঁহাদের প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, কাশীপ্রসাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করেন। ঈশ্বর কৃপায় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক উভয়েই রোগমুক্ত হন। তখন তাঁহারা কাশীপ্রসাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলে কাশী-প্রসাদ সবিনয়ে হিন্দুদার্শনিকোচিত ভাষায় যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া ডেভিড হেয়ার বলেন—The spiritual sermon which Babu Kasi Prosad preached on that day appealed to my heart. I do not remember to have heard any such thrillingly eloquent and soul-stirring sermon from any Hindoo, not even from any Christian preacher of Calcutta.

অর্থাৎ, সেইদিন বাবু কাশীপ্রসাদ যে অধ্যাত্ম ভাব-পূর্ণ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। আমি কোন হিন্দুর মুখে এরূপ রোমাঞ্চকর ভাবসমুজ্জ্বল মর্ম্মভেদী উপদেশ শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। কলিকাতার কোন খৃষ্টান পাদরীর মুখেও এরূপ বক্তৃতা কখনও শুনি নাই।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Hope নামক ইংরেজী কবিতা, ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে Shair and other Poems প্রকাশিত হয়। এই বইখানি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে Minstrel নামে ইহা রচিত হয়; পরে ইহার নাম পরিবর্ত্তিত হয়। কাব্যখানির আখ্যান-বস্তু একটী পার্শী দরবেশের করুণ কাহিনী। দরবেশ অর্থ Shair; সেই জন্য বইখানির এইরূপ নাম রাখা হয়। ভারতবাসীর রচিত ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ এত সুন্দর হইয়াছিল যে ইংল্যাণ্ডেও তাহা প্রশংসিত হইয়াছিল। তাঁহার The Hindu Festival গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজী খণ্ড-কাব্যের সমষ্টি। এক একটি হিন্দু পর্ব্ব উপলক্ষ করিয়া এক একটি কবিতা রচিত। কবিতাগুলি প্রথমে Calcutta Literary Gazetteএ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে The Shairএর সহিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। অধ্যাপক কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন তাঁহার Selections from British Poets নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে ইহা হইতে "The Boat man's Song to Ganga" বা বাঙ্গাল মাঝির সারি গান" শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করেন। আর টি, ডি, ডান সাহেব তাঁহার The Bengali Book of English Verse নামক গ্রন্থে "দশহরা" এবং To a Young Widow কবিতা দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে তিনি কাশীপ্রসাদের The Shair, রাজনারায়ণ দত্তের ওসমিন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের Captive Lady নামক পুস্তকগুলির সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই সকল ইংরেজী কাব্যে বাঙ্গালী জাতি ইংরেজ সমাজে অপূর্ব্ব মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

কাশীপ্রসাদের তৃতীয় ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ The Poems। ইহাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ-গ্রন্থ। কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন তাঁহার Selections from British Poets নামক গ্রন্থে এই The Poems গ্রন্থ হইতে The Boatman's Song to Ganga শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া কাশীপ্রসাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন—

"Let some of those narrow-minded persons, who are in the habit of looking down upon the native of India with an arrogant and vulgar contempt, read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign langnage but even in their own."

অর্থাৎ, যাঁহারা ভারতের অধিবাসীদিগের প্রতি ঔদ্ধত্য-পূর্ণ এবং প্রাকৃতজনোচিত অবজ্ঞা সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত, সেই সকল সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিগণের মধ্যে কতক লোক এই ক্ষুদ্র কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং নিজেদের জিজ্ঞাসা করুন যে, কোন বিদেশীয়

ভাষায় নয় তাঁহাদের নিজেদের মাতৃভাষাতেই ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কবিতা রচনা করিতে পারেন কি না।

তৎকালীন হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসনের এই প্রশংসাপত্র কাশীপ্রসাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। যাহা প্রশংসার বিষয়, সহৃদয় ব্যক্তি-মাত্রেই তাহার প্রশংসা করিতে কৃপণতা করেন না। রিচার্ডসনের ন্যায় অর্ম্মণ্ড ইলিয়ট নামক আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোক Views from India and China নামক গ্রন্থে ইংরেজী ভাষায় কাশীপ্রসাদের অসাধারণ অধিকারের উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদুষী কুমারী এম্মা রবার্টস তাঁহার Scenes and characteristics of Hindusthan নামক গ্রন্থে কাশী-প্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কাশীপ্রসাদের সমসাময়িক 'বেঙ্গল হরকরা', 'লিটারারী গেজেট', 'জনবুল' 'বেঙ্গল এ্যান্নুয়েল' প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত ভাবে কাশীপ্রসাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় সমৃদ্ধ হইত। সেই সকল রচনা এখন দুষ্প্রাপ্য, এমন কি, কিছু কিছু হয় ত বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই সকল রচনা যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে কাশীপ্রসাদের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত হইতে পারে। কাশীপ্রসাদের আত্মীয় স্বজনের পক্ষে যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদেরই সমবেত ভাবে এইটি করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

কাশীপ্রসাদের গদ্য-পদ্য যে সকল রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি এই—

(১) Memoirs of Indian Dynasties containing (a) The Scindhiah of Gowaliior, (b) King of Lucknow, (c) The Holkar of Indore, (d) The Nowab of Hydrabad, (e) The Gaekwar of Baroda, (f) The Bhonslah of Nagpore, (g) The Nawab of Bhoupal ; (২) Sketches of Ranjit Sing ; (৩) Sketches of King of Oudh ; (৪) On Bengalee Poetry ; (৫) On Bengalee works and writers ; (৬) The Vision—a Tale, প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে তিনখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আজকাল ইতিহাস উদ্ধারের দিকে বাঙ্গলার সাহিত্য-সেবিগণের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে—অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণাও হইতেছে। সেই সকল গবেষণার ফল স্বরূপ যে সকল প্রবন্ধ বাঙ্গলা সাময়িক সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে কাশীপ্রসাদের ইতিহাস-গ্রন্থগুলির কোন reference দেখা যায় না—কিন্তু দেখিতে পাওয়া উচিত। সম্ভবতঃ বইগুলি দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তাহা সম্ভব হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত তালিকার পঞ্চম গ্রন্থ On Bengalee Works and Writers গ্রন্থে কাশীপ্রসাদ বাঙ্গলার জাতীয় কবি ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু প্রভৃতির কবিতা ও কাব্যগুলির সমালোচনা এবং ইংরেজী কবিতায় অনেক বাঙ্গলা কবিতার সুন্দর প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদেশী ভাষার মাতৃভাষায় অনুবাদ করাই শক্ত। গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অনুবাদ—বিশেষতঃ কবিতায়—আরও শক্ত। মাতৃভাষা হইতে বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করা—তাও আবার সেই বিদেশী ভাষার কবিতায়—কতখানি যে শক্ত তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ইংরেজী ভাষা কাশীপ্রসাদের এমন আজ্ঞাবহ ছিল যে ভারতচন্দ্র, নিধুবাবুর কবিতার ঠিক মূলানুযায়ী অনুবাদ তিনি ইংরেজী কবিতায় করিয়াছিলেন। ইহা সাধারণ শক্তিমত্তার পরিচায়ক নহে।

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে The Hindu Intelligencer নামক সাময়িক পত্রের reference প্রায় দেখা যায়। কাগজখানি কাশীপ্রসাদ বাহির করিয়াছিলেন। ইহা ছিল সাপ্তাহিক পত্র। ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা হইত। কাশীপ্রসাদ ইহার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইবার পর—সিপাহী-বিদ্রোহের পর সংবাদপত্রের অধিকার সঙ্কোচার্থ যে নূতন মুদ্রাযন্ত্র বিধান প্রণীত হয়, তাহার দরুণ কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাগজখানি বর্ত্তমান ছিল।

কাশীপ্রসাদের সাহিত্য-প্রতিভা কেবল ইংরেজী সাহিত্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। তৎকালীন যুবকগণের নিকট কেবল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেরই সমাদর ছিল, ইহার আলোচনাই তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন—প্রিয়জনদিগকে বা বন্ধুবান্ধবগণকে পত্র লিখিতে হইলে ইংরেজীতেই পত্র লিখিতেন, বৈঠকী আলাপ-পরিচয়ও বোধ হয় ইংরেজীতেই হইত। (এখনও এই ভাবটা

কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে—সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই।) যাঁহারা ইংরেজী জানিতেন না, তাঁহাদিগকে শিক্ষিত যুবকরা কৃপাপাত্র বিবেচনা করিতেন। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহাদের কাছে হেয়, অবজ্ঞেয় ছিল। কিন্তু কাশীপ্রসাদ যেমন ইংরেজীতে, তেমনই বাঙ্গলা রচনাতেও সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত প্রায় তিন শত সঙ্গীতের কথা শুনা যায়। তবে তিনি তখনকার কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই—সঙ্গীতগুলি প্রায় আদিরসাশ্রিত ও পরকীয়া প্রেম বিষয়ক ছিল। তাহা নিধুবাবুর টপ্পার ন্যায় সরস ও সুমধুর ভাবপূর্ণ ছিল। কতকগুলি ভগবৎ-প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতও যে ছিল না তাহা নহে। তাহার মধ্যে একটি গান এইরূপ—

ভৈরবী আড়া

কি দিয়ে তুষিব তাঁরে বলে' আপনার
ফল ফুল যত দেখি সকলি তাঁহার।
প্রচণ্ড প্রতাপী বীর কীটের ক্ষুদ্র শরীর
জীবনে, পতনে যিনি সদা নির্ব্বিকার।

বাঙ্গালীর দেবদেবীর সম্বন্ধে কাশীপ্রসাদ যে সকল ইংরেজী কবিতা রচনা করেন, তন্মধ্যে দেবী সরস্বতীর বন্দনা-গীতি-কবিতাটি এইরূপ—

Goddess of every mental grace,
And virtue of the soul,
Which high exalt the human race
And lead to glory's goal
'Tis thou who bidst the infant mind
Its growing thoughts display,
Which lay within it undefined
In regular array.

ডাক্তার T. D. Dunn সাহেব কাশীপ্রসাদের ইংরেজী সরস্বতী বন্দনার সপ্রশংস সমালোচনা উপলক্ষে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, Sir Alfred Layll ও Sir Edwin Arnold তাঁহাদের কাব্য লিখিবার কালে কাশী-প্রসাদ প্রমুখ বাঙ্গালীর হিন্দু দেবদেবীর উদ্দেশে রচিত কবিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

এই সঙ্গে কাশীপ্রসাদের বাঙ্গালা সরস্বতী-বন্দনাটিও পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি—

শ্বেত শতদলোপরে শ্বেতাম্বর কলেবরে
শ্বেতমালা গলোপরে বিরাজে শ্বেতবরণী
বেদ বেদান্ত তন্ত্র নৃত্য-গীত বাদ্য যন্ত্র
সকলের মূলমন্ত্র ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চরণের কিবা শোভা মধুলোভে মধুলোভা
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়,
সারদা শুভ বরদা অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা
বিধাতার ধ্যেয় সদা বেদমাতা নারায়ণী ॥

কাশীপ্রসাদ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের যেমন অনাদর করেন নাই, তদ্রূপ, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহার নিজ সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হন নাই। তিনি কেবল গীত-রচয়িতা ছিলেন না, নিজেও সুগায়ক ছিলেন ; এবং অপর সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি সদালাপী, মিষ্টভাষী, বিনয়ী—এক কথায়, মজলিসী লোক ছিলেন। হেদুয়ার উত্তর দিকে বিডন ষ্ট্রীটে তাঁহার বাটীর বৈঠকখানায় নিত্য মজলিস বসিত। সেই সময়ে সঙ্গীত-কলার এবং রাজনীতি ও সাহিত্যের চর্চ্চা হইত। সহরের তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই এই মজলিসে যোগ দিতেন। সামাজিক ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ক্রিয়া-কাণ্ডও তিনি মহাসমারোহে সম্পাদন করিতেন। সরস্বতী পূজা ও ঝুলনোৎসব প্রভৃতি উৎসবে লাট-বেলাট প্রমুখ রাজ-কর্ম্মচারীরা এবং বহু ইংরেজ ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিতেন। কাশীপ্রসাদ দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন—প্রচ্ছদপটে তাঁহার চিত্র দেখিলেই পাঠকরা তাহা বুঝিতে পারিবেন—সেটাও একটা মস্ত আকর্ষণের বস্তু ছিল। হিন্দুর ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এইজন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এবং অন্যান্য ব্যক্তির চেষ্টায় এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলে রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী কাশীপ্রসাদ তাহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না—নিজ সহধর্ম্মিণীকে এমন সুশিক্ষিতা করিয়া-ছিলেন যে, তিনি ইংরেজ মহিলাগণের সহিত অনর্গল ইংরেজী ভাষায় আলাপ করিতে পারিতেন। তবে কাশীপ্রসাদ মেয়েদের স্কুলে পাঠাইবার প্রথার অনুমোদন করিতেন না—গৃহে তাহাদের শিক্ষালাভে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না।

কাশীপ্রসাদ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস অব দি পীস ছিলেন।

সন ১২৮০ সালের ২৭এ কার্ত্তিক (১১ই নবেম্বর, ১৮৭৬) কাশীপ্রসাদ পরলোকে গমন করেন।

সাময়িকী

মহাত্মাজীর সঙ্গে পথে প্রবাসে—

যেদিন অগণিত মানবের শুভেচ্ছার শঙ্খ-নিনাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী বোম্বের তীর ত্যাগ করিয়া শ্বেতদ্বীপের পথে যাত্রা করেন, সেদিন হইতে আসমুদ্র-হিমাচল এই ভারতভূমির কোটী কোটী সন্তানও তাঁহার সহিত পথে প্রবাসে বাহির হইয়াছে। আজ সমগ্র ভারতবাসীর উদ্বেগ আকুল চিত্ত সমুদ্র-তীরে অনির্ব্বাণ দীপ-বর্ত্তিকার মত জ্বলিতেছে—হৃত-সর্ব্বস্বা জননীর একমাত্র আশা-দীপ!

* * * *

লোহিত-সমুদ্রের শান্ত জলধারা ভেদ করিয়া "রাজ-পুতানা" চলিয়াছে। পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া প্রভাত আসিয়াছে। জাহাজের খৃষ্টান-যাত্রীগণ উপাসনা করিতে-ছেন। কটিবাস-পরিহিত এক কৃশতনু হিন্দু আসিয়া সেই উপাসনায় যোগদান করিল। এ যুগের ন্যাজারিণ আর এক যুগের ন্যাজারিণের ধ্যানে সকলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া গাহিলেন, "Lead kindly light amid the encircling gloom! Thou lead me on! I am far away from home. Thou lead me on!"

"তুমি নিয়ে চল, হে মঙ্গল-শিখা, এই চারিদিকের ঘনায়মান অন্ধকার ভেদ করে, তুমি পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল! ঘর হতে আমি আজ বহুদূরে—তুমি এসো হে আলো, পান্থ-জনের বন্ধু!"

* * * *

মিশরের পাশ দিয়া জাহাজ চলিয়াছে। স্ফিংস্ আর পিরামিড আর জগলুল পাশার মিশর! মহাত্মাজীর বাসনা ছিল এই মিশরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করিতে। কিন্তু সময়ের অভাবে তাহা আর হইল না। স্ফিংক্স্ আর পিরামিড শুধু সাক্ষী রহিল—ইতিহাসের বহু ঘটনার আজ তাহারা একমাত্র সাক্ষী যে, এই পথ দিয়া মিশরের পাশ দিয়া গিয়াছে ভারতের স্বাধীনতার বার্ত্তাবহ! জগলুলের মিশর তাঁহার নিকট আগাইয়া আসিল—বাণীরূপে। জগলুলের সুযোগ্যা বিধবা জায়া, তরুণ মিশরের জননী তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া লিপি প্রেরণ করিলেন। জাতীয় দলের সভাপতি জগলুলের পতাকাবাহী নাহাসপাশা বাণী পাঠাইলেন, আপনার যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা, পরমেশ্বর করুন, সেই অনুযায়ী আপনার সিদ্ধিলাভ হয়!

নাহাস-পাশার বাণীর মধ্য দিয়া কি নব-জাগরণ-গৌরব-দৃপ্ত মিশর কথা বলিল?

* * * *

জাহাজ সুয়েজে আসিয়া কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিল। তীরে অসংখ্য মিশরবাসীর জনতা। তাহাদের আহ্বান করিয়া মহাত্মাজী বলিলেন, মোহাম্মদ ছিলেন শান্তি-ধর্ম্মের প্রচারক। তাঁহারই অনুচর হইয়া আপনাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—জগতের ঐক্য স্থাপনা করা। আর সেই ঐক্য পরোক্ষভাবে নির্ভর করিতেছে—ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্য-সংস্থাপনের উপর! ভারত যতদিন আছে বিদেশীর বন্ধনে, ততদিন কিছুতেই সত্যকারের আন্তর্জাতিক শান্তি আসিতে পারে না।

* * * *

জাহাজে বেতারে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, সেখানকার ইংরাজবন্ধুগণ তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে একটী ভোজ-সভার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহারা অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহাকে সেই সভায় যোগদান করিতে হইবে। পরিব্রাজক কিন্তু অপরাগ। প্রত্যুত্তরে তিনি জানাইলেন, কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে, এমন কি আমার মত এক বৃদ্ধের জন্মতিথি উৎসবেও যোগদান করিবার কোনও বাসনা আমার নাই!

একজন আমেরিকান সহযাত্রী তাঁহার "অবসর-বিনোদনে"র জন্য কয়েকখানি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস তাঁহাকে উপহার দিতে যান। কিন্তু তিনি তখন আর একটী রোমাঞ্চকর গ্রন্থ পড়িতেছেন,—রাউণ্ড টেবিল বৈঠকের গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী। সুতরাং সে উপহারও তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

* * * *

এডেনে আসিয়া জাহাজ দাঁড়াইল। প্রভাত না হইতেই গান্ধী-টুপি মাথায় প্রবাসী ভারত-সন্তানগণ বন্দরে সমবেত হইয়াছে। সভার আয়োজনও হইয়াছে। মহাত্মাজীকে কিছু বলিতে হইবে। বিপুল জয়-ধ্বনির মধ্যে জাহাজ হইতে নামিয়া শুনিলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষগণ সভামণ্ডপে কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মহাত্মাজী সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা করিলেন। অনুমতি অচিরেই পাওয়া গেল। এডেন বন্দরে সেদিন প্রভাতে ক্ষণকালের জন্য ভারতের জাতীয় পতাকা আকাশে মাথা তুলিয়া উঠিল। সেই পতাকার নিম্নে দাঁড়াইয়া মহাত্মাজী বলিলেন, আপনারা জানেন এই পতাকা রক্ষা করিতে গিয়া অনেকে প্রাণ দিয়াছেন। আপনারা হয় ত পড়িয়াছেন, এই পতাকা রক্ষা করিতে গিয়া ভারতের নারী লাঠীর আঘাত সহ্য করিয়াছেন। সেইজন্য ভারতবাসীর এমন কোনও সভা আমি ভাবিতে পারি না, যেখানে এই পতাকা উড্ডীন থাকিবে না।

* * * *

ফ্রান্সের মার্শেই-এ বন্দরে জাহাজ আসিয়া লাগিল। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও ফরাসী সাংবাদিকগণ আসিয়া জাহাজ আক্রমণ করিল। নানারকমের প্রশ্ন আসিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, যদি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাহা হইলে আপনি কি এই পোষাকেই যাইবেন?

হাসিয়া গান্ধীজি উত্তর দিলেন, আপনাদের দেশে আপনারা "প্লাস ফোর" ব্যবহার করেন। আমাদের দেশের এই "মাইনাস্ ফোর"ই আমি পছন্দ করি!

তারপর আসিল কাষ্টম্‌স্ অফিসার তাহার বাঁধা প্রশ্ন লইয়া। সকল প্রশ্নের উত্তরের পর যথারীতি ইন্‌স্‌পেক্‌টর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি কিছু বক্তব্য আছে?

তেমনি হাসিয়া তিনি বলিলেন, আমি এক দরিদ্র ভিক্ষু। আমার সমস্ত পার্থিব সম্পত্তির মধ্যে আছে—ছয়টী চরকা, গোটাকয়েক বন্দীদের ব্যবহার্য্য ডিস্, ছাগলের দুধের একটা বালতি, ছয়খানি ঘরে-কাটা সুতোর এই ছোট্ট কাপড়, একটী গামছা, আর আমার আত্মসম্মান —এই সামান্য দামের এই আমার সম্পত্তি!"

নিদ্রিত প্যারীর মধ্য দিয়া যখন ট্রেণ চলিয়াছিল, বাহিরের আগত-উষার ম্লান আলোর দিকে চাহিয়া সহসা পরিব্রাজকের মনে পড়িল—চল্লিশ বৎসর আগে আর একদিন তিনি এইখানে আসিয়াছিলেন—মাত্র একজন ভারতীয় ছাত্র!

* * * *

১২ই সেপ্টেম্বর, মহাত্মা গান্ধী ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। তখন অবিরল ধারায় আকাশ বর্ষণ করিতেছিল। তবুও সেদিন ভারত হইতে আগত সেই শীর্ণ দেহ রাজনৈতিক সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য এক বিরাট জনতা সমবেত হয়। পুলিশ বহু কষ্টে তাহাদের সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। পূর্ব্বকার আয়োজন মত ইংলণ্ডের অনেক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। মিঃ হাউসম্যান সভার পক্ষ হইতে মাল্যপ্রদান উপলক্ষে বলেন, তাঁহার জীবনে ইহার অপেক্ষা গৌরবজনক ঘটনা আর কিছু ঘটে নাই!

গোলটেবিল বৈঠক ও মহাত্মা গান্ধী—

গোলটেবিল বৈঠকের যুক্ত-রাষ্ট্র-সাব-কমিটীতে মহাত্মা গান্ধী দুই দিন যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি তিনটী প্রধান বিষয় তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভঙ্গীতে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন,

(১) তিনি আসিয়াছেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে এবং কংগ্রেসের দাবী হইতেছে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।

(২) দ্বিতীয়তঃ, যে-ভাবে এই নূতন বৈঠকের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাতে এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই।

(৩) তৃতীয়তঃ, যে-পদ্ধতি অনুসারে বৈঠকের কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে ইহাকে "ডিবেটিং সোসাইটী" অর্থাৎ নিছক তর্ক-সভা ব্যতীত আর কিছু মনে হয় না। আসল কাজ কিছুই অগ্রসর হইতেছে না।

কংগ্রেসের আদর্শ ও রটীশ স্বার্থ—

মহাত্মা গান্ধী সভার প্রারম্ভেই তাঁহার মনোভাব ও উদ্দেশ্য একান্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

জানাইয়াছেন, এই সভায় আমি আসিয়াছি সহযোগিতার জন্য। যদি কখনো এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আমি বুঝি আমার দ্বারা এই সভার কোনও উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভবপর হইবে না, তখন আমি এই কনফারেন্স ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করিব না। আমি কংগ্রেসের প্রেরিত প্রতিনিধি এবং সেই হিসাবে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ দ্বারা আমার কার্য্যশক্তি সীমাবদ্ধ।

অতঃপর তিনি কংগ্রেসের অতীত ইতিহাসের ধারা ব্যাখ্যা করিয়া বোঝান যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের সকল বর্ণের এবং সকল জাতির একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের বিকাশের সঙ্গে ইহা একান্তভাবে জড়িত। তাহার পর তিনি করাচী কংগ্রেসে গৃহীত স্বাধীনতার প্রস্তাবটী পাঠ করেন। গত গোল টেবিল বৈঠকে প্রধান-মন্ত্রীর ঘোষণায় ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের যে ইঙ্গিত ছিল, তাহা কংগ্রেসের দাবীর বহু নিম্নে এবং কংগ্রেসের পক্ষ হইতে তাহা বা তদ্রূপ কোনও কিছু গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মহাত্মাজী বলেন, যে-রাষ্ট্র ক্ষমতায় বাহুত সমুদয় ক্ষমতাই দেওয়া হইবে, অথচ কার্য্যত কোনও ক্ষমতা থাকিবে না, সে ব্যবস্থায় কংগ্রেস কখনই সম্মত হইতে পারে না।

কংগ্রেসের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবীর কথা উল্লেখ করিয়া মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, শুধু জগতের সমক্ষে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য যে কংগ্রেস পূর্ণ-স্বাধীনতা চাহিতেছে তাহা নয়, ইংলণ্ডের সহিত মৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ স্বাধীন ভারত দাস-ভারত অপেক্ষা ইংলণ্ডের অধিকতর কল্যাণের হইবে। দুইটী শক্তিশালী ও স্বাধীন জাতির মৈত্রীর মধ্যে যে শক্তি ও কল্যাণের সম্ভাবনা আছে, প্রভু ও দাস সম্পর্কে আবদ্ধ দুই জাতির মধ্যে আজ কখনও কল্যাণের সে সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এমন এক দিন ছিল, যখন আমি নিজেকে বৃটিশ প্রজা বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতাম; কিন্তু আজ বহু বৎসর হইল আমি নিজেকে আর বৃটিশ প্রজা বলিয়া মনে করি না। প্রজা হওয়া অপেক্ষা আমি বিদ্রোহী বলিয়া আজ নিজে পরিচিত হইতে চাই। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি চাই এমন এক বিরাট জাতি সঙ্ঘের নাগরিক হইতে, যেখানে প্রত্যেক জাতি পরস্পর মৈত্রীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে, অথচ কেহ জোর করিয়া অপর কাহারও উপর প্রভুত্ব করিবে না। *** তরবারির সাহায্যে ভারতবর্ষকে বশীভূত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা যে ইংলণ্ডের নাই সে কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে লইয়া ইংলণ্ডের অধিকতর লাভ হইবে? একটা বিদ্রোহী পরাধীন ভারতবর্ষ, না তাহারই সুযোগ্য স্বাধীন শক্তিশালী ভারতবর্ষ, যে চিরদিন ইংলণ্ডের সুখে দুঃখে, জগতের কল্যাণে তাহার পার্শ্বে বন্ধুর মত দাঁড়াইয়া থাকিবে? *** যদি আমি নিজের দেশের স্বাধীনতা চাই অথচ দুর্ব্বল হউক, সবল হউক, অন্য সব জাতির স্বাধীনতাকে না স্বীকার করি, তাহা হইলে আমার স্বাধীনতার কোনও অধিকার থাকে না। পথে আসিতে আমি এই কথাই ভাবিয়াছি যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আমি এই কথা বুঝাইতে পারিব।"

মহাত্মাজীর বক্তৃতায় ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের একমাত্র সম্মানজনক মিলনের যে আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা বৃটিশ রাজনৈতিক নেতাগণ সরল ও সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ তাঁহাদের নীরবতা যেন আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সব-কমিটীর পরের বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী এই রহস্যময় মৌনতা ও দীর্ঘসূত্রতাকে তাঁহার স্বাভাবিক সরল বিশ্লেষণ-পদ্ধতি দ্বারা সকলের নিকট আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। যে অন্ধকার ঘরে হাতড়াইয়া কোনও জিনিষ পাওয়া যায় না—সেখানে আলো আসিলে যেমন সমস্তই চোখে ধরা পড়িয়া যায়—তেমনি এবারকার গোল-টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধীর অস্তিত্বে সমস্ত দীর্ঘসূত্রতা, বাক্যময় সমস্ত রাজনৈতিক নিরর্থকতা যেন আপনা হইতেই অশোভন বলিয়া ধরা পড়িতেছে।

—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মুদ্রা-সঙ্কট—

বহুদিন ধরিয়া বিলাতে অর্থ-সঙ্কটের যে আভাস দেখা যাইতেছিল, আজ সহসা তাহা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নূতন ন্যাশান্যাল গভর্ণমেণ্ট বিশেষ আদেশ জারী করিয়া বিলাতী মুদ্রার স্বর্ণমান স্থগিত করিয়াছেন। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের কোন অধিবাসী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যাহা আবশ্যক কিংবা ২১শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে যে সব কনট্রাক্ট করা

হইয়াছে, তাহা ছাড়া এবং সঙ্গত কারণে ঋণ বাবদ বা ব্যক্তিগত অপর কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করিতে পারিবে না, কিংবা স্বর্ণ বিদেশে স্থান্তর করিতে পারিবে না।

বিলাতের ব্যাঙ্ক, ষ্টক এক্‌স্‌চেঞ্জ প্রভৃতির কার্য্যও আপাততঃ স্থগিত আছে। বিলাতের সহিত ভারতবর্ষের অর্থনীতির দিক দিয়া অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেইজন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডকে স্বর্ণ বিক্রয় বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট আদেশ জারি করিয়াছেন যে, তাঁহারাও সাময়িকভাবে টাকার বদলে ষ্টার্লিং বা ব্রিটিশ নোট এবং স্বর্ণ বিক্রয় বন্ধ করিবেন এবং গভর্ণমেণ্টের জরুরী আদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহও আপাততঃ কয়েকদিনের জন্য কাজ কারবার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

সহসা এই আর্থিক বিপর্য্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে সর্ব্বপ্রথম ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ইংলণ্ডের মন্দা ব্যবসায়ই ইহার প্রধান কারণ। কিন্তু বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী আর্থিক দুর্গতির সময় কাহারও ব্যবসাই ভাল চলিতেছে না। গত মহাযুদ্ধের সময় সামরিক খরচ চালাইবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রচুর পরিমাণে ১ পাউণ্ডের নোট ছাপাইতে আরম্ভ করেন। নোট এত বেশী পরিমাণে ছাপান হয় যে, প্রতি পাউণ্ড নোটের সহিত স্বর্ণ পাউণ্ডের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। এই সামঞ্জস্যের জন্য ১৯২৫ সালে পার্লামেণ্টে স্বর্ণমান আইন পাশ হয়, যাহার ফলে বাজার হইতে প্রচুর পরিমাণে নোট তুলিয়া লওয়া হয় ও জিনিষের মূল্য কমিতে আরম্ভ করে। ইহা ব্যতীত ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অন্যান্য দেশে ইংলণ্ডের জিনিষের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও আমেরিকার ঋণভারের জন্য ইংলণ্ড ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। ব্যবসা না চলিলে টাকা আসে না, কাজেই স্বর্ণও ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে জমা হয় না। এদিকে ১৯২৯ সালে আমেরিকায় ব্যবসায়ী মহলে ব্যবসা প্রসারের উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় সেদেশে সুদের হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও বহুপরিমাণ স্বর্ণ ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় চলিয়া যায়। ইহার পর কিছু-দিনের জন্য ইংলণ্ড হইতে স্বর্ণ রপ্তানী কিছু কম পড়ে; কিন্তু গত জুলাই মাস হইতে বিদেশীরা তাহাদের জমার টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কসমূহ হইতে তুলিয়া লইতে থাকায় এই রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এখন এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আর যদি স্বর্ণ ইংলণ্ড হইতে রপ্তানী হইয়া যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ড ব্যবসায়ী জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে। কাজেই স্বর্ণ বিক্রয় বন্ধ করা ছাড়া উপায় নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে—হঠাৎ কেন ইংলণ্ডের মজুত স্বর্ণের পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কিছুদিন হইতে বিভিন্ন দেশের এবং বিশেষভাবে আমেরিকা ও ফ্রান্সের ইংলণ্ড সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ইংলণ্ডের ব্যবসায় দিন দিন মন্দর দিকেই যাইবে। কাজেই আর ঐ দেশকে টাকা ধার দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। এ স্থলে ইহা বলা দরকার যে, যদিও বিভিন্ন দেশে ইংলণ্ডের অনেক টাকা খাটে তথাপি ঘরের খরচ চালাইবার জন্য ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টকে প্রায়ই সাময়িক ঋণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং এই সাময়িক ঋণ দেয় আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ, যাহাদের ঘরে প্রয়োজনাতিরিক্ত স্বর্ণ আছে। এই সকল দেশ যখন দেখিতে পাইল যে, ইংলণ্ডের বাজেটে ঘাটতি ঘটিবার আশঙ্কাই বেশী, তখন তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হিসাব-রক্ষক ও ব্যাঙ্কার ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নিকট হইতে দেয় ঋণের অনুরূপ স্বর্ণ আদায় করিয়া নিজেদের দেশে পাঠাইতে লাগিল, যাহার ফলে ঐ ব্যাঙ্কের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, সিন্দুকে মাত্র ১৩ কোটী পাউণ্ডের অনুরূপ স্বর্ণ মজুত আছে, অথচ কানলিফ কমিটির প্রস্তাব অনুসারে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে অন্ততঃ ১৫ কোটী পাউণ্ডের অনুরূপ স্বর্ণ মজুত থাকা চাই। কাজেই এই আদেশ জারি করা ছাড়া ইংলণ্ডের গত্যন্তর নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই পন্থা অবলম্বন করিবার দুইটী যুক্তি আছে। প্রথম হইতেছে যে ১৯২৭ সালের কারেন্সী আইন অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতি টাকার ৮৪৭১২ গ্রেণ সোণা বা ১ শিলিং ৬ পেন্স দিতে বাধ্য। এক্ষণে ইংলণ্ডে স্বর্ণ বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাওয়ার দরুণ স্বর্ণ খুব মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। যাহার ফলে স্বর্ণমুদ্রার মূল্য বিলাতী নোটের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে, কাজেই ভবিষ্যৎ লাভের আশায় অনেকে এখান হইতে স্বর্ণ কিনিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইবার চেষ্টা করিবে। এদিকে স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত বলিয়াই টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু

ইংলণ্ডের মুদ্রার মূল্য যদি কমিতে থাকে, তাহা হইলে ভারতের মুদ্রার মূল্যও সেই হারে বৃদ্ধি পাইবে; কেননা, ভারতের অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই, কাজেই যদি বাজারে ষ্টার্লিং বিক্রয় বন্ধ না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত হারে অর্থাৎ ১ শিলিং ৬ পেন্স হারে কেহই টাকার পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের মুদ্রা লইতে স্বীকৃত হইবে না।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য নির্ভর করে—এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের উপর যাহারা বৈদেশিক মুদ্রার কারবার করে। এই সকল ব্যাঙ্ক যদি চেষ্টা করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার যে কোন হারে স্থির করিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার অর্থ সঙ্কটের সময় যদি ব্যাঙ্ক খোলা থাকে, ব্যাঙ্কসমূহ ইচ্ছা করিলে মুদ্রা বিনিময় জগতে আরও অধিক বিভ্রাট ঘটাইতে পারে। সেই জন্যই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা না জানা পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কসমূহ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া দেওয়ার আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, যদি অকস্মাৎ আমানতকারীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া টাকা তুলিয়া লইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িতে পারে।

হিল্টন-ইয়ং কারেন্সী কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে এবং ১৯২৭ সালের কারেন্সী আইন অনুসারে ভারতের মুদ্রা স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত ও সংবদ্ধ, ব্রিটিশ মুদ্রার সহিত নহে, কারণ, হিল্টন-ইয়ং কমিশন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, টাকাকে ব্রিটিশ ষ্টার্লিং মুদ্রার সহিত সংযুক্ত রাখিলে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। ১৯২৭ সালের আইন অনুসারে ভারতীয় মুদ্রার যখন স্বর্ণের সঙ্গে "পরিণয়" হইয়া গেল, তখন সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে "ষ্টার্লিংয়ের" সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা সম্ভবপর। যুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতির খামখেয়ালীর জন্যই ভারতকে বহু কোটি টাকা লোক্‌সান দিতে হইয়াছে এবং আজ ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিতেছেন, তাহা যদি অবলম্বিত না হইত, তাহা হইলে ভারতে স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ভারতে স্বর্ণমান প্রচলনের সুযোগ ঘটিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে কতদিন ভারতীয় মুদ্রাকে ব্রিটিশ ষ্টার্লিং মুদ্রার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা ভাবিবার বিষয়; কারণ, যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্বর্ণের যোগাড় না করিতে পারে, তাহা হইলে ষ্টার্লিংএর মূল্য যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না এবং সেই সময় এমন অবস্থাও ঘটিতে পারে যে, টাকার বদলে ১ শিলিং ৬ পেন্সের পরিবর্ত্তে টাকার রৌপ্য বিক্রয় করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যে স্বর্ণ পাওয়া যাইবে, তাহার সত্যকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্সের অনেক বেশী হইবে।

সন্তোষ আর তারকেশ্বর—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সমস্ত বাঙ্গলা দেশ স্তম্ভিত বেদনায় ও বিস্ময়ে শুনিল যে, হিজলী জেলে, যেখানে বিনাবিচারে রাজবন্দীদের, রাজার অতিথিদের আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, সেখানে শান্ত্রীদের গুলিতে রাজবন্দী সন্তোষকুমার মিত্র এবং তারকেশ্বর সেন নিহত হইয়াছেন এবং আরও ২০ জন রাজবন্দী আহত হইয়াছেন।

কারাগার হিন্দুর পবিত্র তীর্থ, কারণ এই কারাগারেই একদিন ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থে মৃত্যু প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনের পূত কামনা। তাই কারা-তীর্থে আজ যাঁহারা মহাপ্রয়াণ করিলেন, তাঁহাদের জন্য ক্ষোভ করিয়া কোনও লাভ নাই।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজের মত সুসভ্য খৃষ্টান শাসকের অধীন দেশে এই লোমহর্ষণ ঘটনা সত্যই এই শতাব্দীর একটা কলঙ্ক-কাহিনী। ইংলণ্ডেরই এক মমতাময়ী নারী একদিন আপনার সমগ্র জীবন দিয়া কারা-সংস্কারের যে মহা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, আজ সমগ্র সুসভ্য জগৎ তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। একদিন ছিল যখন আইনের দণ্ডে দণ্ডিত মানুষকে আর মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইত না, কিন্তু এলিজাবেথ ফ্রাই আসিয়া বর্ব্বরতার যুগের এই স্মৃতি-চিহ্নটুকুকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিবার সাধনায় লিপ্ত হন। মানুষ যখনই আইনে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে আসিল, তখনই সেই মানুষ সম্বন্ধে ষ্টেটের দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গেল। য়ুরোপে অথবা আমেরিকায় মাঝে মাঝে কারাগারে "মিউটিনি" অথবা বিদ্রোহের খবর শোনা যায়। সেই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজন না হইলে, প্রথমেই শান্ত্রী বা সৈন্যেরা গুলি ছোঁড়ে না।

হিজলীর বন্দীশালায় যাঁহাদের আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, প্রকাশ্য আদালতে তাঁহাদের কোনও বিচার হয় নাই। তাঁহারা নিরস্ত্র। তাঁহাদের এমন এক জায়গায় এবং এমন এক আইনের অধীন রাখা হইয়াছে যে, সামান্য অশিক্ষিত শান্ত্রীদের উপর তাঁহাদের জীবন মরণ নির্ভর করিতে পারে। বে-সরকারী যে-সমস্ত খবর বাহির হইয়াছে, সরকারী এশ্‌তেহার বাহির হইবার পর তাহাদিগকে কতখানি সত্য বা মিথ্যা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সরকারী এশতেহারেই যে বিবরণ আমরা পাইয়াছি, তাহাকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে বাধে। সরকারী এশ্‌তেহারে বলা হইয়াছে যে, হিজলী ক্যাম্পের প্রহরীদের কোনও দোষ নাই; রাজবন্দীরা দলবদ্ধ হইয়া চারজন শান্ত্রীকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের হাত হইতে আক্রান্ত শান্ত্রীদের বাঁচাইতে গিয়াই অন্য শান্ত্রীদের গুলী ছুঁড়িতে হয়। এই এশ্‌তেহারে বলা হইয়াছে,—"এই বিবরণকে গবর্ণমেণ্টের শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে তদন্ত করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। এ স্থলে ইহাও বলা যাইতেছে, বন্দীরা ঘটনা সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন কোন কিছু বলিতেছে না।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে তদন্ত প্রকৃত পক্ষে এক তরফা। যে শান্ত্রীরা গুলি ছুঁড়িয়াছে, তাহাদেরই সাক্ষ্যকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। দিল্লীর চুক্তির আওতায়, গোল-টেবিল-বৈঠকের অধিবেশনের সময়ের মধ্যে এই রকম ঘটনা যে কতদূর শোচনীয় তাহা বলা বাহুল্য। সমগ্র দেশ এই ব্যাপারে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত চাহে। তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গলা সরকার সুবুদ্ধিরই কাজ করিবেন। এই সঙ্গে সরকারের উচিত, হিজলী এবং বক্সার বন্দীনিবাস তুলিয়া দেওয়া।

ভারতের কণ্ঠরোধের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা

ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদস্য যখন দেশের বাহিরে রহিয়াছেন, তখন ভারত-সরকার পুনরায় প্রেস আইন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গত ২রা আশ্বিন সংবাদ-পত্র-সেবী-সঙ্ঘের অধীনে কলিকাতার সংবাদপত্রসেবীদিগের এক সভা হয়। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়;—

জনসাধারণকে এবং সংবাদপত্রসেবীদিগকে উপযুক্ত সুযোগ দান না করিয়া প্রেস বিলটী তাড়াহুড়া করিয়া পাশ করাইবার চেষ্টায় এই সভা তাহার নিন্দাবাদ করিতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব কতকগুলি পুস্তিকা ছাপাইয়া একতরফাভাবে ভারতীয় সংবাদপত্র-সমূহের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যের যে কৌশল অবলম্বন করেন এবং সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য ঐগুলি না দিয়া যেভাবে ঐগুলির সাহায্যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদের সমর্থন নিজেদের পক্ষে পাইবার জন্য চেষ্টা করেন, সভা তাহার নিন্দাবাদ করিতেছেন। সভার মত এই যে, যেসব সংবাদপত্রের লেখা ঐ সব পুস্তিকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে, অন্ততঃপক্ষে সেগুলিতে ঐগুলি প্রদান করা উচিত ছিল।

সভার মতে প্রেস বিল অনাবশ্যক এবং ঐরূপ বিল উপস্থিত করিবার কোনই কারণ ঘটে নাই। ঐ বিলের নীতি অতীব নিন্দনীয়। ইহাতে গান্ধী-আরুইন চুক্তি সোজাসুজি সুস্পষ্টভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে পুস্তিকাসমূহ বিলি করিয়াও ঐরূপ একটী অসাধারণ ব্যবস্থা আলোচনার পক্ষে কোন যৌক্তিকতাই প্রদর্শিত হয় নাই। এই বিলে প্রথম জামীন আমানত এবং পরবর্ত্তী জামীন আমানত সম্বন্ধেও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের স্থলে শাসনবিভাগীয় হুকুমকে প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। আপীলের ব্যবস্থা করাতেও এই ব্যবস্থার ভীষণতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না। বিলের বাজেয়াপ্তের অধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলি অত্যন্ত ব্যাপক, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার উহাতে সঙ্কুচিত হইলে, যে সব সংবাদ শাসনকর্ত্তাদের রুচিকর নহে, সেগুলির প্রচার করিতেও সংবাদপত্রসমূহকে অবিরত হুমকীর ভয়ে থাকিতে হইবে। কুশাসন, সরকারী কর্ম্মচারীদের অনাচার এবং পুলিশের অত্যাচার—এগুলির সমালোচনা করিবার স্বাধীনতা ঐ বিলের ব্যাপক ধারার গণ্ডীর মধ্যে যে পতিত হইবে, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

এই সভার মতে সিলেক্ট কমিটীতে বিলটি উত্থাপন করিতে দিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের অধিকাংশ সদস্য জনমতের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম ও কংগ্রেস-নীতি—

পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রামে যে ভয়াবহ অরাজকতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অনেকে আশঙ্কা করেন যে, উক্ত ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য বা দাঙ্গা বৃদ্ধি পাইবে। চট্টগ্রামের ব্যাপার সম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন তদন্ত কমিটী বসিয়াছে, একটী সরকারী, এবং আর একটী বে-সরকারী। উক্ত দুইটী কমিটীর রিপোর্ট বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত, হয় ত প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু চট্টগ্রামের এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে একটা বড় জিনিষ বিশেষ করিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, দেশের লোক, অন্ততঃ দেশের এক শ্রেণীর লোক, আজ এ কথা অন্তরের অন্তরতম স্থল দিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে কোনও তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা করিয়া হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় কাহারও কোনও লাভ নাই। বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামের উপদ্রুত হিন্দুগণ সকল রকম ক্ষতি সহ্য করিয়া ও সমস্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও যে তিতিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন, জাতির জীবনে তাহা একটা মহৎ উদাহরণস্বরূপ চিরদিন বিরাজ করিবে। এই প্রসঙ্গে যেসমস্ত মুসলমান ছাত্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দাঙ্গার সময় উত্তেজিত জনতার হাত হইতে প্রতিবেশীদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া, স্বসমাজের অপরাধের বোঝা নিজেদের উদার কর্ত্তব্যের মধ্যে বহন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

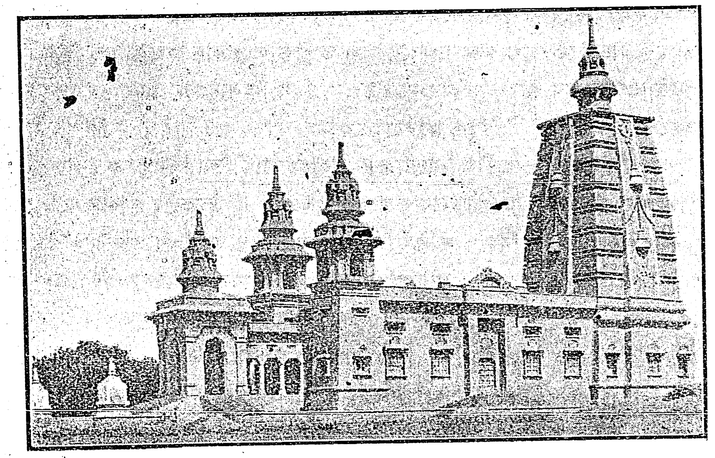

মূলগন্ধকুটি

সারনাথ বিহার—

বারাণসীর নিকটে সারনাথ বৌদ্ধদের একটি মহাতীর্থ। সেই সারনাথের পবিত্র ইসিপতন তীর্থ সম্প্রতি মহাবোধি সোসাইটির অধিকারে আসিয়াছে। তথায় 'মূলগন্ধকুটি' নামে একটি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী ১১ই নবেম্বর (১৯৩১) সেই বিহারের উদ্বোধন উৎসব হইবে, এবং তদুপলক্ষে বৌদ্ধজগতের একটি সার্ব্বভৌম মহাসম্মেলন হইবে। ২৪৭৫ বৌদ্ধাব্দে বৌদ্ধজগতের ইতিহাসে ইহা একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এই উৎসবে যোগদানার্থ আহূত হইয়াছেন। ২৫২০ বৎসর পূর্ব্বে ইসিপতনে সর্ব্ব প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং স্থানটি পবিত্র বৌদ্ধতীর্থে পরিণত হয়। আজ আবার তথায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুনর্জ্জন্ম হইবে ১১ই নবেম্বর বেলা তিন ঘটিকার সময়।

বিহারটির নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। মন্দির চূড়ার উচ্চতা ১১০ ফিট। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেওয়ালে চিত্র কার্য্য এখনও বাকী আছে বটে, কিন্তু শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ হইবে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বিহার-সংলগ্ন ভূমিতে উদ্যান রচনা করিতেছেন। জয়পুরের শিল্প-বিদ্যালয়ে বুদ্ধের প্রচারকালীন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতেছে। সারনাথের যাদুঘরে বুদ্ধের যে প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি আছে তাহারই আদর্শে বিহারের মূর্ত্তি গঠিত হইতেছে। মোটের উপর এটি একটি বিরাট অনুষ্ঠান হইবে।

——

যতীন্দ্র সংবর্দ্ধনা—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবি-শিষ্যবৃন্দের অন্যতম শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর সংবর্দ্ধনার জন্য কলিকাতার 'রসচক্রে'র সদস্যগণ কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ায় সে দিন একটী সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের কবি-প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই আয়োজন সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। কলিকাতা হইতে অনেক সাহিত্যিক ও কবি এই সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিয়া কবিবর যতীন্দ্রমোহনের কবি-প্রতিভার সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কবিকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হইয়াছিল। এই 'রসচক্রে'র প্রধান উদ্যোগী কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় এই অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া কবি ও সাহিত্যিক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন এবং যতীন্দ্রমোহনকে সম্মানিত করিয়া 'রসচক্র'ই সম্মানিত হইয়াছেন এবং প্রকৃত রসবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

——

পরলোকে কেশবচন্দ্র—

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নকালে সিমলার রাষ্ট্রীয়-পরিষদ গৃহের বারান্দায় অকস্মাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, একনিষ্ঠ স্বদেশহিতৈষী, ভারতে সংবাদ-বার্ত্তাবহের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র রায় পরলোকগত হইয়াছেন। সেদিন রাষ্ট্রীয় পরিষদে সংবাদপত্রের ক্ষমতা-সঙ্কোচের জন্য সরকার পক্ষ হইতে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিবার কথা ছিল। ঐ বিলের প্রতিবাদ করিবার জন্য কেশবচন্দ্র অসুস্থ শরীরেই পরিষদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবার একটু পূর্ব্বেই তিনি বারান্দায় আসেন এবং তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না, কেশবচন্দ্রের আত্মা দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল। তাঁহার অকালে পরলোকগমনে ভারতের শিক্ষিত সমাজ, শ্বেতকৃষ্ণ নির্ব্বিশেষে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমি ইহাতে বিশেষ শোক পাইয়াছি। কেশবচন্দ্র আমার ছাত্র ছিলেন; আমার কাছেই তাঁহার অধ্যয়নকাল শেষ হইয়াছিল; তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভ করেন নাই। আমিই তাঁহাকে বাঙ্গালা ইংরাজী রচনা শিক্ষায় প্রয়োচিত করিয়াছিলাম। তাহার পর আমারই চেষ্টায় কেশব সামান্য বেতনে কলিকাতার ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে একটী চাকুরী পান। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কি লুপ্ত থাকে। কেশব সেই সময়ই ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসে হাত পাকাইতে আরম্ভ করেন। ভাগ্য প্রসন্ন হইল; কেশব ভারতবর্ষের সাংবাদিকগণের অবিসম্বাদিত অধিনায়ক হইয়াছিলেন। আমার সেই প্রিয় ছাত্র ও শিষ্যের পরলোকগমনে আমি যে কি ব্যথা পাইয়াছি, তাহা কি বলিয়া প্রকাশ করিব। ভগবানের কাছে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ—

আমাদের পরম প্রীতিভাজন বন্ধু, বাঙ্গালা সাহিত্যের খ্যাতনামা কথা-শিল্পী, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশারদ, 'ভারতবর্ষে'র শ্রদ্ধেয় লেখক রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রি এগারটার সময় পরলোকগত হইয়াছেন। উচ্চ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য ও সঙ্গীত-সাধনায় জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু, অবসর গ্রহণের পরেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অসুস্থ শরীরেও তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চ্চায় বিরত হন নাই। তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান, স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়, অমায়িক বন্ধুর বিয়োগে আমরা বড়ই শোক-কাতর হইয়াছি। শ্রীভগবান তাঁহার পুত্রকন্যা, বিধবাপত্নী ও বহু আত্মীয় বান্ধবগণের গভীর শোকে শান্তি দান করুন; তাঁহার আত্মার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হউক।

——

সংস্কৃত কলেজে রবীন্দ্রনাথ—

বিগত ৩রা আশ্বিন রবিবার কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ সমবেত হইয়া বিশ্ব-কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে 'কবি-সার্ব্বভৌম' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণ ও দ্বিতলের কক্ষ কবি-সংবর্দ্ধনার সম্পূর্ণ উপযোগী ভাবে পুষ্পপতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবিবর মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করিলে একটী সঙ্গীত হয়। তাহার পর কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত একটী সময়োপযোগী বক্তৃতা করিয়া কবিবরকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে কলেজের একজন অধ্যাপক সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া উপাধি-দান-পত্র পাঠ করেন। কবি অতি সুললিত ভাষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রগতি সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি সংস্কৃত ভাষার উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-গণের বিশ্বকবির প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন যে সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত হইয়াছে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

——

শরৎ-জন্মোৎসব—

অপরাজেয় কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিগত ৩১শে ভাদ্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইয়া ছাপ্পান্ন বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ঐ তারিখে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ-পরিষদে'র সদস্যগণ শরৎচন্দ্রকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ফিজিক্স থিয়েটারের কক্ষ পত্রপুষ্প, ধূপদীপদামে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের নবাগত বাঙ্গালী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য সমাদরে শরৎচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের সুচিন্তিত ও সুললিত অভিভাষণ সভার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে উপস্থিত হইতে না পারিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন; সভাস্থলে তাহা পঠিত হইয়াছিল। আমরা 'বঙ্কিম-শরৎ-পরিষদে'র এই অনুষ্ঠানকে অভিনন্দিত করিতেছি। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর এবং পরিষদের অনুষ্ঠাতৃগণের প্রতিনিধি স্বরূপ অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপসংহার বক্তৃতা বিশেষহৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ভগবান শরৎচন্দ্রকে দীর্ঘজীবন দান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত গল্পের বই "রোমন্থন" মূল্য—১৲।
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত উপন্যাস "উদাসীর মাঠ"—১৲।
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভাদুড়ী-মশাই"—২৷৹।
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "পরিতাপ"—২৲।
শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক 'শ্রীগৌরাঙ্গ'—১৲।
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ-অনুবাদিত, ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত, অদ্বৈত সিদ্ধি, প্রথম ভাগ, মূল্য—৫৲।
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, উপন্যাস, "একতারা",—।৵৹।
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম-এ প্রণীত "ন্যায়দর্শনের ইতিহাস," —২৲, (বাঁধাই) ২৷৹।
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মনের মিল"—১৲।
শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই "মরণোল্লাস"—১৷৹।
শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত উপন্যাস "বিপত্তি"—২৷৹।
শ্রীযুক্ত নিধিরাজ হালদার প্রণীত উপন্যাস "স্নেহের দাবী"—১৷৹।
মহাত্মা গান্ধী লিখিত "বিধবা বিবাহ"—৵১৹।
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ব্রহ্মবিদ্যা"—১৲।
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সংখ্যাবেদান্ততীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত "শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্" (শাঙ্করভাষ্য সমেত)—১৷৹
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত "প্রেম-গীতি" (স্বরলিপি)—২৲।

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA,
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

Printer—NARENDRANATH KUNAR.
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা
গান্ধী-ভাষ্য ৷৹
দক্ষিণ আফ্রিকায়
সত্যাগ্রহ ১৲
স্বাস্থ্যরক্ষা ৷৹

গান্ধী-সাহিত্য
নর-নারী শিশু
বালক বৃদ্ধ
সকলেরই পাঠ্য

হিন্দ্ স্বরাজ ।৵৹
কার্পাস শিল্প ।৵৹
চরকা ও শিল্প ৵৹

জীবন ব্রত বা
গান্ধীবাদ ৷৹
ভারতের সাম্যবাদ
৷৹
চরখার ব্যবহার ।৹

গান্ধী-সাহিত্য
অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার
পবিত্র ভাবে
পরিপূর্ণ

যেরোডা জেলের
অভিজ্ঞতা ৷৹
খাদি ম্যানুয়াল
প্রথম খণ্ড ১৲
দ্বিতীয় খণ্ড ৷৹

বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে পত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক "ভারতবর্ষে"র উল্লেখ করিবেন।

অলৌকিক চিকিৎসা

"বিগত ছয় মাস হইতে আমি বহুমূত্র, অর্শ, ভগন্দর রোগে ভুগিতেছিলাম। শেষে আমার মূত্রাশয়ে ছয়টী ছিদ্র হইয়াছিল। প্রস্রাবের দ্বার দিয়া প্রস্রাব নির্গত না হইয়া উক্ত ছয়টী দ্বার দিয়া নির্গত হইত! সমস্ত অধঃদেশ পচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারগণ আমার রোগ অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন। শেষে নিজ জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটের রাজবৈদ্য কবিরাজ **শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এম, এ** (ফোন ৪০৩৯ বড় বাজার) মহাশয়ের অলৌকিক চিকিৎসায় ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ছিদ্রগুলি বন্ধ হইয়া প্রস্রাবের দ্বার দিয়া প্রস্রাব নির্গত হইতেছে এবং আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছি।

শ্রীবদনচন্দ্র মণ্ডল,
সাং তালতলা, ২৪ পরগণা।

পি, এম বাগচি এণ্ড

১৯ গুলুওস্তাগর লেন কলিকা

শ্বেতকুষ্ঠের অব্যর্থ মহৌষধ

এই ঔষধ মাত্র তিন দিন ব্যবহারে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য না হইলে দ্বিগুণ মূল্য ফেরৎ দিব। শত শত রোগীতে পরীক্ষায় সফল হইয়া এই অঙ্গীকার প্রদানে সমর্থ হইয়াছি। ইচ্ছা হইলে স্বীকার পত্র লিখিয়া দিই। মূল্য ভিঃ পিঃ তে ৩৷০।

বাতভৈরব—কঠিন, পুরাতন, দুঃসাধ্য বাতব্যাধিও এতদ্বারায় সম্পূর্ণ এবং শীঘ্র আরোগ্য হইবে। অধিক বাক্যাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরৎ। এক শিশি ভিঃ পিঃ তে ২৷০ (c. আঃ)

ডাঃ এন্, এল, ব্যানার্জি, এইচ, এইচ, পি
দ্বারভাঙ্গা—B. & O.

দশহাজার টাকা পুরস্কার

ওজস্—দুঃস্বপ্ন, শুক্রতারল্য, অবসন্নতা ও পুরুষত্ব-হীনতা-নাশক রসায়ন। শুক্রকে গাঢ় করিয়া ধাতু ও স্নায়ুকে সবল, সতেজ ও কর্ম্মঠ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। মূল্য ১৷০ টাকা।

পাচক—১ মাত্রায় অম্ল ও শূলের অসহ্য কষ্টের উপশম; নিয়মিত সেবনে অম্ল, অজীর্ণ, শূল, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, বায়ুবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও যকৃৎ-বিকৃতি আরোগ্য হয়। শিশি ১৲ টাকা। ঔষধদ্বয়ে বিজ্ঞাপিত গুণ নাই প্রমাণিত হইলে উক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। পত্র দিলে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

কবিরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক
(অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান)
কালনা (বেঙ্গল)

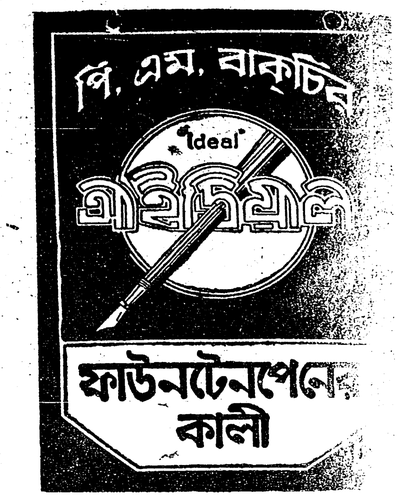

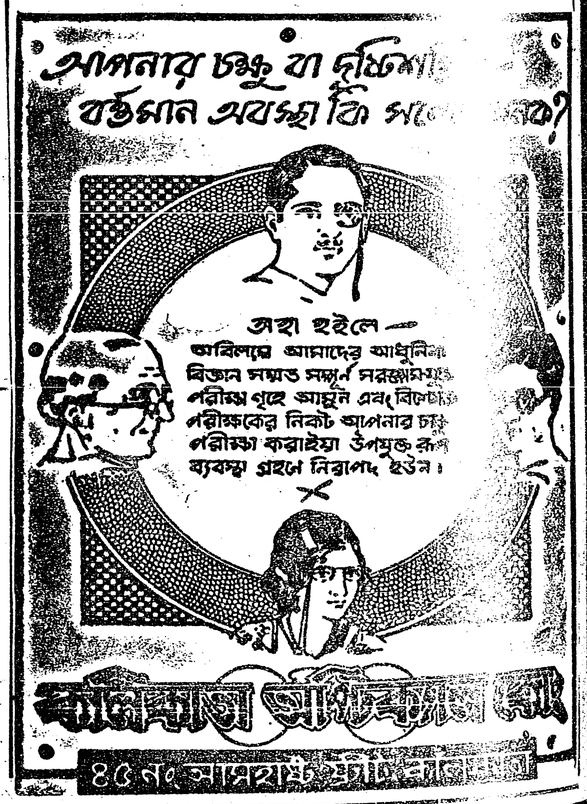

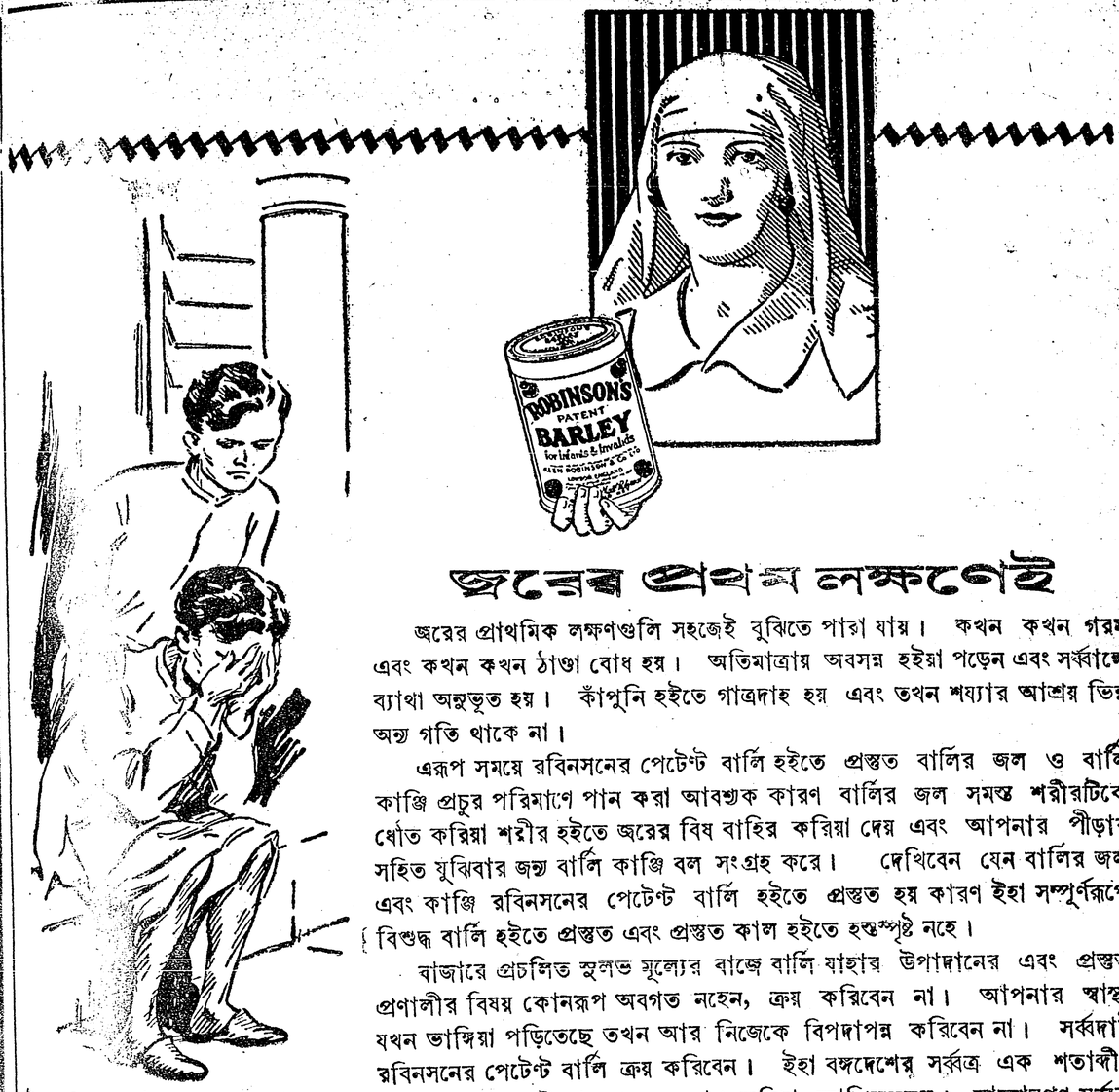

জ্বরের প্রথম লক্ষণেই

জ্বরের প্রাথমিক লক্ষণগুলি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কখন কখন গরম এবং কখন কখন ঠাণ্ডা বোধ হয়। অতিমাত্রায় অবসন্ন হইয়া পড়েন এবং সর্ব্বাঙ্গে ব্যাথা অনুভূত হয়। কাঁপুনি হইতে গাত্রদাহ হয় এবং তখন শয্যার আশ্রয় ভিন্ন অন্য গতি থাকে না।

এরূপ সময়ে রবিনসনের পেটেণ্ট বার্লি হইতে প্রস্তুত বার্লির জল ও বার্লি কাঞ্জি প্রচুর পরিমাণে পান করা আবশ্যক কারণ বার্লির জল সমস্ত শরীরটিকে ধৌত করিয়া শরীর হইতে জ্বরের বিষ বাহির করিয়া দেয় এবং আপনার পীড়ার সহিত যুঝিবার জন্য বার্লি কাঞ্জি বল সংগ্রহ করে। দেখিবেন যেন বার্লির জল এবং কাঞ্জি রবিনসনের পেটেণ্ট বার্লি হইতে প্রস্তুত হয় কারণ ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ বার্লি হইতে প্রস্তুত এবং প্রস্তুত কাল হইতে হস্তস্পৃষ্ট নহে।

বাজারে প্রচলিত সুলভ মূল্যের বাজে বার্লি যাহার উপাদানের এবং প্রস্তুত প্রণালীর বিষয় কোনরূপ অবগত নহেন, ক্রয় করিবেন না। আপনার স্বাস্থ্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তখন আর নিজেকে বিপদাপন্ন করিবেন না। সর্ব্বদাই রবিনসনের পেটেণ্ট বার্লি ক্রয় করিবেন। ইহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এক শতাব্দীর উপর বিক্রীত হইতেছে এবং ইহা আপনার পিতা ও পিতামহগণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ডাক্তারগণ সর্ব্বত্র রবিনসনের পেটেণ্ট বার্লি ব্যবহার করিতে আদেশ দেন কারণ ইহা সর্ব্বসময়েই গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং সর্ব্বদা রবিনসনের পেটেণ্ট বার্লিই চাহিবেন এবং ইহার পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষ লইবেন না।

ROBINSON'S
'patent' BARLEY

(কেবলমাত্র গুঁড়া আকারে)
সমস্ত ডাক্তারখানায়, দোকানে ও বাজারে পাওয়া যায়।

বঙ্গসাহিত্যের অপূর্ব্ব উন্নতি

রায় সাহেব জগদানন্দ রায়ের
অসংখ্য চিত্রে নক্ষত্র জগতের অপূর্ব্ব পরিচয়
নক্ষত্র-চেনা ২॥০

শ্রীশান্তা দেবীর
ষোলটি কুহকময় গল্পের ডালি
বধূ-বরণ ১॥০

৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
চমকপ্রদ উপন্যাস
অনুক্রম ১।০

৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর
রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনা
রবীন্দ্রনাথ ॥০

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের
রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত
পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—৫৲

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের
মেঘদূত ২৲
প্রবাসী বলেন—"মেঘদূতের এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শোভন সংস্করণ এর আগে কেউ প্রকাশ করেছেন ব'লে জানা নেই। সবার সেরা মূলানুগ অনুবাদ।"

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের
তিনখানি বীররসপূর্ণ উপন্যাস
ব্রজনাথের বিবাহ ১॥০
আরাতামা ২৲
জয়ন্তী ২৲
সরস মধুর গল্প
রথযাত্রা ১॥০

শ্রীযুক্ত তারামোহন বেদান্তশাস্ত্রীর
যোগবাশিষ্ঠের বসিষ্ঠদেবের অপূর্ব্ব জীবনী
বশিষ্ঠ-চরিত ১৲

শিশু-সাহিত্যের নূতন পুস্তক
শ্রীকৃষ্ণনাথ গোস্বামী
বালক মহাপুরুষ ॥০
শ্রীরামেন্দু [illegible]
ফুলের ডালি ॥০
শ্রীবিভূতিভূষণ [illegible]গুপ্ত
কাঠবেড়ালী [illegible]াই ৸০
শ্রীপ্যারীমোহন [illegible]গুপ্ত
হালুম বুড়ো ॥০
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন
সোনার তা[illegible] ১৲
শ্রীরবীন্দ্রনা[illegible]
আলোর পা[illegible]ড় ১৲
কালু সর্দ্দার ॥০

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস—২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলি[illegible]তা

খাদ্যতত্ত্ব

ঢাকা গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক—
—শ্রীবিধুভূষণ পাল প্রণীত—

সাময়িক পত্রাদিতে বিশেষরূপে প্রশংসিত আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত বহু তথ্যে পরিপূর্ণ, চিত্রসম্বলিত অভিনব গ্রন্থের সাহায্যে ভগ্নস্বাস্থ্য বাঙ্গালীর খাদ্যনির্ব্বাচন সমস্যার সমাধান হইবে। মল্য—এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—১। শ্রীজ্ঞানরঞ্জন পাল। ১১ আনন্দ রায় ষ্ট্রীট, ঢাকা। ২। বুক কোম্পানি লিমিটেড, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। ৩। প্রবাসী বুক ষ্টল, ১৪২ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। ৪। আশুতোষ লাইব্রেরী ঢাকা।

যে যে জিনিষ

বহু লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে

তন্মধ্যে কয়টীর নাম ১। **চন্দ্রপ্রভা বটীকা** ঃ—স্ত্রী ব্যাধিতে সুফলপ্রদ। প্রতি কৌটায় ১৬ বটীকা থাকে। ২। **কাসান্তক বটীকা** ঃ—সর্ব্ববিধ কাসী নিবারণ করে। প্রতি কৌটায় ৫০ বটীকা থাকে। প্রত্যেক ঔষধের মূল্য ১৲ টাকা। অন্যান্য বিবরণ ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্তিস্থান—**আর্তঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়**
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জে, এম, রায় এণ্ড [illegible]

ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স
৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, [illegible]কাতা

আমাদের সমস্ত অলঙ্কারই গিনি সোনায় প্রস্তুত। তাগা বালা, [illegible] মফচেন, ভাটিয়া চূড়ী, আংটী ইত্যাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থা[illegible] পত্র লিখিলেই ক্যাটালগ পাঠান হয়, মফস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহি[illegible] সরবরাহ করি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড্

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

নূতন উপন্যাস ঃ—

শ্রীসৌর[illegible]মোহন মুখোপাধ্যায়ের
নারী ২৲
শ্রী[illegible]রেশচন্দ্র সেনগুপ্তের
ব্রত[illegible] ২।০

নূতন উপন্যাস ঃ—

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
পথের স্মৃতি ২।০
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের
অম্ল মধুর ১॥০

নূতন গল্প ঃ—

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের
বন্ধু ২৲
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
গিরিকা ১॥০

শ্রীম[illegible] শৈলবালা ঘোষ জায়ার
জন্ম [illegible]পরাধী
১॥০ স্থলে ১৲

শ্রীশরৎ ঘোষ প্রণীত
আধুনিক সমস্যামূলক অতুলনীয় নাটক
'অভিজাত" ১।০
সগৌরবে মিনার্ভায় অভিনীত হইতেছে

শ্রীবিধুভূষণ দে প্রণীত
শিল্পী ॥০
সূচী শিল্পের উৎকৃষ্ট পুস্তক, ইহাতে ফ্রক পেনি, ব্লাউজ ইত্যাদির সুন্দর ডিজাইন আছে

কো[illegible]ফ্ ওয়ার্ডস্এর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার—
শ্রী[illegible]হারীলাল গন প্রণীত
জমি[illegible]রী দর্পণ ৩৸০
সে[illegible]মেণ্ট আইন সম্বলিত

৺ মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীর
বেদ পরিচয় ২॥০
বেদ কি জানিতে হইলে এই গ্রন্থ পড়িতে হইবে

৺দীনবন্ধু মিত্রের
নীলদর্পণ ১॥০ স্থলে ॥০
সধবার একাদশী
১০ স্থলে ।৵০

শ্রী[illegible]মচন্দ্র কানুনগোর
বাংলা[illegible] বিপ্লব প্রচেষ্টা ২॥০
মাসিক [illegible]মতীতে প্রকাশিত সত্য ও চমকপ্রদ ঘটনা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ প্রণীত
নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর ১।০

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস এম-এপ্রণীত
বাংলার বীর
১ম ভাগ—১৲
ঐ ২য় ভাগ ১৲

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষের
রোবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম

—মূল্য ৩॥০ টাকা—

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদিগের অঙ্কিত, পাতায় পাতায় একবর্ণ ও বহু বর্ণ চিত্র শোভিত, প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য সুচিত্রিত ও মনোরম বাঁধা।

—পারুল—

"ছেলেবেলার সখী যে তুই
চাঁপা ফুলের বোন্
একটী কথা শোন্ গো আমার
একটী কথা শোন্

অন্যান্য সাবান
বীথি, কস্তুরী
চন্দন, অতসী
টার্কিশ বাথ

কলিকাতা টয়লেট প্রডাক্টস—১৩।২ পাইকপাড়া রোড, কলিকাতা।

প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী প্রতিষ্ঠা

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোং'র

এণ্টিপিরিয়ডিক মিকশ্চার।

প্রায় একশতাব্দীকাল হইয়া ভারতে সর্ব্বত্রই ঘর ও দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত ও ব্যবহৃত।

বড় বোতল—১৷৷০ টাকা, ছোট বোতল ১৲ টাকা।

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী

৩৬৯ নং অপার চিৎপুর রোড (যোড়াসাঁকো)
ও ৮।১ এস্প্লানেড রোড ইষ্ট (ধর্ম্মতলা) কলিকাতা।

"অশ্বারিষ্ট"

আদি ডাক্তারের ... অশ্বগন্ধারিষ্ট নাম রেজিষ্টার্ড

—পুষ্টিকর, বলকারক, স্মৃতিশক্তি ও শুক্রবর্দ্ধক—

২৫৬ মাত্রা বোতল ৷৷০ টাকা, ৬৪ মাত্রা শিশি ১৲ টাকা।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফ্যার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্

ফ্যাক্টরী—৯ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, আফিস—২২ ঈশ্বর মিল লেন কলিকাতা।

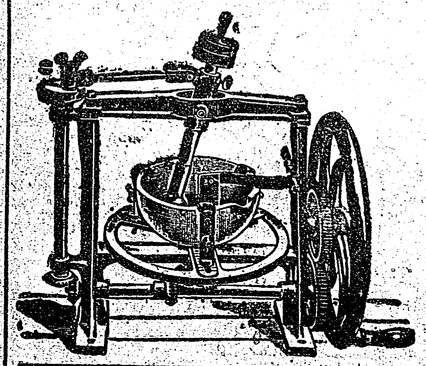

ঔষধ প্রস্তুতের মেসিন ও সরঞ্জাম

দেশী, বিদেশী যাবতীয় ঔষধ প্রস্তুতের যন্ত্রাদি আমরা সুলভে সরবরাহ করিয়া থাকি। বড়ি ও ট্যাবলেট প্রস্তুতের যন্ত্র, শুষ্ক এবং সরস দ্রব্য চূর্ণ করিবার উপযুক্ত যন্ত্র, পেশাই এবং মিশ্রিত করিবার যন্ত্র, দানা বাঁধিবার এবং ছাঁকিবার যন্ত্র, সর্ব্ববিধ টিংচার প্রেস, চোলাই করিবার এবং চিনির আবরণ দিবার যন্ত্র সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে মজুত রাখি এবং অর্ডার পাইলে বিলাত হইতে আমদানি করিয়া থাকি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মেসিনারী কোং—১৪, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
পোষ্ট বক্স—২১৮১ কলিকাতা টেলিগ্রাম—আনকাট।

কেন ? ? ? না, না!

জ্বর জ্বালায় ওষুধ খেতে হলেই
সবাই বলে—
না, না!
কিন্তু ব্যথা, বেদনা,
মাথা-ধরার বেলা
সবাই চেয়ে খায়—
নানালা

খেতে ভাল আর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব রকমের ব্যথা সারে

মূল্য—২৫ বটীকা ৫০ আনা মাত্র

ভৈষজ্য ও রসায়ণ শাস্ত্রের মণি-কাঞ্চন যোগ

স্বর্ণ ও রসায়ণ ঘটিত

হেমাটো-সার্শাপ্যারিলা

বাত, রক্তদুষ্টি, চর্ম্মরোগ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের

— উৎকৃষ্ট ঔষধ —

মূল্য—প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা

ডাঃ বসুর ল্যাবরেটারী লিমিটেড,
কলিকাতা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

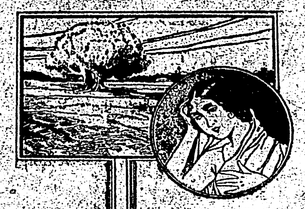

ঊষসীর মাঠ

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কয়েকটি গল্প-সমষ্টি

সুদৃশ্য রঙিন প্রচ্ছদপটে বাঁধাই

দাম—এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

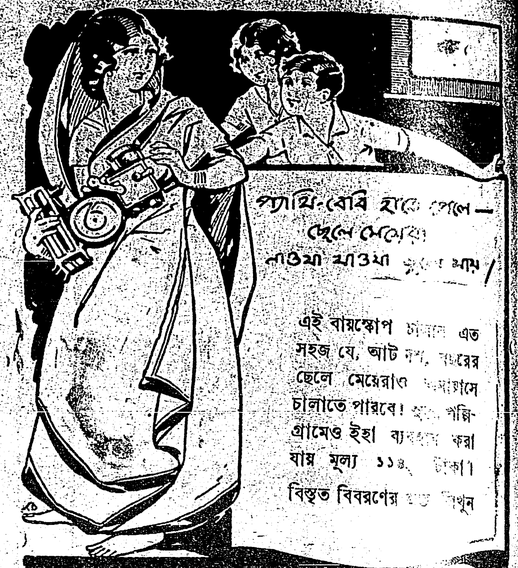

এম, এল, সাহা লিঃ

৫/১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা—৭ ... ষ্ট্রীট

বড়দিনের জন্য ভাল লেখকের নূতন উপন্যাস!

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পৌষ পার্ব্বণ ২৲

মন্মথ রায়ের নূতন উপন্যাস

সমাজ বীর ১৸৹

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহলক্ষ্মী ১৸৹

মায়ের প্রাণ ১।৹

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সংসারপথের যাত্রী ২॥৹

শ্রীবনলতা দেবী প্রণীত

ব্রাহ্ম পরিবার ২॥৹

রত্ন-মন্দির (২য় সং) ১॥৹

দর্প-চূর্ণ ১॥৹

লক্ষ্মীশ্রী (৩য় সং) ২৲

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

দোটানা ২॥৹ মুক্তিস্নান ৩৲

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নিশির ডাক উপন্যাস ২৲

বিনোদ হালদার ঐ ২৲

নবাব ঐ ২॥৹

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্মমধু (উপন্যাস) ২৲

বন্ধুর দান ঐ ২৲

শ্রীনারায়নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বন্ধুর বিয়ে ১॥৹

শ্রীশ্রীপতিমোহন ঘোষ

অভিসার ১।৹

শ্রীনলিনাক্ষ হোড়

কমলার দান ১।৹

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু

হিমানী (উপন্যাস) ১।৹

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

মণীষা ২৲

অভিনেত্রীর একরাত্রি ২৲

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

রসকলি ২৲

সুচরিতা ১॥৹

ভোরের পূরবী ১।৹

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ২॥৹

লণ্ডন-কাহিনী ২৲

নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

কর্ম্মভোগ ২৲

ভবঘুরে ১।৹

মানরক্ষা ২৲

অপরাধী ১॥৹

ডিক্রীজারি ১॥৹

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বঙ্গনারী বস্ত্রালয়

বিশ্বনাথ লেন,—বেনারসসিটী

অর্থ সঙ্কটে, অভাবনীয় দামের অল্পতায়, শুভবিবাহে, আমাদের বস্ত্রাদি লোভনীয়

। গৃহলক্ষ্মী সাড়ী—মজবুত রেশমী জমীর আসল বেনারসী সাঁচ্চা জরীর ১″ চৌড়া পাড় ও ৪ ইঞ্চি চৌড়া আঁচলা ১৪৲, ১॥৹″ ...সী নক্সার পাড় ও ৬″ চৌড়া সুশ্রী আঁচলা ১০ ও ১১ হাতি যথাক্রমে ১নং ২৩৲ ও ২৫৲, ২নং ১৮৲ ও ২০৲ ঐ জরীর উপর ১″ মাপের ...রীর শতাধিক ফুলদার জমী, ১০ ও ১১ হাতি ১নং ২৮৲ ও ৩২৲, ২নং ২২৲ ও ২৫৲, সাধারণ ১০ হাত ১৮৲, ব্লাউস্ পিস্ সাড়ীর সিকি ...কোনও রং প্রাপ্তব্য, (উচ্চাঙ্গের সাড়ীর বিবরণ পত্রে জ্ঞাতব্য)।

। বরের জোড়—সাদা বা হাল্কা রংএর সূক্ষ্ম ও সুশ্রী জরী পাড় বেনারসী ধুতি ও চাদর, স্পেশাল ৩০৲, ১নং ২৩৲, ২নং ১৮৲, ...১৫৲।

। কাশ্মিরী জর্জ্জেট সাড়ী—কাশ্মিরী শিল্কের জমী, ছুঁচে তোলা সাঁচ্চা জরীর ও তন্মধ্যে ফ্যান্সী মীনা করা পাড়, আঁচলা ও ...সৌন্দর্য্যে দামী বেনারসীও ইহার সমকক্ষ নয় ১০ হাত—১৩৲, ১১ হাত ১৪৲, ৯ হাত—৯৲, ব্লাউস্ পিস্ ৩৲।

। শুভ্রা সাড়ী—উজ্জ্বল সিল্কের হাল্কা রংএর জমীর পাকা রংএর পার্শী প্যাটার্ণের ছাপা পাড় ও আঁচলাদার, স্পেশাল ১০।১১।৯।৮ ...যথাক্রমে ৫৲।৫॥৹।৩॥৹।৩৲ ও ২॥৹ সাধারণ ॥৹ আনা কম।

। সাধনা সাড়ী—সাদা বা হাল্কা রংএর গরদের জমীর উপর কাশ্মিরী নিপুণ কারিগরের হাতে তোলা মনমুগ্ধকর সুশ্রী কারুকার্য্যের ...আঁচলাদার ১১ হাতি সাড়ী ও পিস্,—১নং ৩০৲, ২নং ২৫৲, সাধারণ ১৮৲।

...তিরিক্ত (১) পূজার্চ্চনায় লাল পাড়, তসর রং অর্ঘ সাড়ী—১০ ও ১১ হাত ৪৲।৪॥৹, ঐ ধুতি ৩॥৹, (২) দুধ গরদের লাল বা কাল ...তী সাড়ী—১০ হাত ১নং ১৩৲, ১১ হাত ১৫৲ সাধারণ ২৲ কম (৩) দামের আন্দাজ মত সর্ব্ববিধ শীতবস্ত্র—যথা আসল কাশ্মিরী ...শাল, তুষ, মলিদা, অমৃতসরি দোরোখা শাল ১৮৲ হইতে, এক রোখা ১০৲ হইতে কানপুরী লুই, র‍্যাপার, ধোসা ইত্যাদি প্রাপ্তব্য।

নিজ ব্যয়ে মাল পাঠাই, অপছন্দে বদলাই, বিনামূল্যে ক্যাটালগ প্রাপ্তব্য

দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় এণ্ড ব্রাদার

...কারী যাহা ধাবনের বা ইন্‌জেক্সনের যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়ার আদৌ ...নাই। গণোরিয়া, মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, স্মৃতিশক্তি-হীনতা ...নী ও শুক্রতারল্য প্রভৃতি শুক্র পীড়া; স্ত্রীলোকের অনিয়মিত ঋতু, ...ধক, সূতিকা ও শ্বেত বা রক্ত প্রদরাদির জন্য—

...শক্তিপতি

...রাবর্জ্জিত বায়োকেমিক ঔষধ। বহুদিন সারা জগতে চলিতেছে। ...র ৭ ঘণ্টায় জ্বালা-যন্ত্রণা দূর, ৬ দিনে নূতন ও ১৩ দিনে পুরাতন ...ল হইবেই হইবে। অন্যথায় মূল্য ফেরৎ দিবই দিব। পথ্যের বিচার ...পত্রাদি গোপনে রাখা হয়। মূল্য ৬ দিনের সডাক ২৲, ১৩ দিনের ...৲ টাকা। স্বয়ং আসুন বা রোগ-বৃত্তান্ত লিখুন। ...না—ডাঃ দুর্গাদাস হাজরা চৌধুরী, ১নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিঃ, ...না—৮নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাবতীয় মেহ, প্রমেহ, গনোরিয়া ও শুক্র ক্ষীণতার স্বপ্নদোষের মহৌষধ—

গনোফ্যান

রেজেষ্টারী কৃত

মূল্য প্রতি শিশি ১॥৹ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র পত্র লিখিলে "ভ্রান্ত পথিক" নামক পুস্তিকা পাঠান হয়। ইলি ব্রাদার্স এণ্ড কোং, বাহরা—ঢাকা।

এইচ্ বসুর সুগন্ধি দ্রব্য তৈলাদি প্রসাদন সামগ্রী সম্বন্ধে
প্রসিদ্ধ ভারতীয় জননায়কগণের অভিমত ঃ—

"আমার এক আত্মীয়ের বহুকাল হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যেই তাঁর মাথায় নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে..."
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"মিঃ এইচ্. বসুর প্রস্তুত সুগন্ধি দ্রব্যজাত ভারতে প্রস্তুত সুগন্ধ দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ সুগন্ধির সমকক্ষ..."
—মতিলাল নেহেরু

"আমি ব্যবহার করিয়াছি মিঃ এইচ্ বসুর 'কুন্তলীন' ও 'দেলখোস' বাস্তবিকই ভাল। ইয়োরোপে প্রস্তুত সুগন্ধি অপেক্ষা কোনও অংশে এগুলি নিকৃষ্ট নহে।"
—লালা লাজপত রায়

"আমি এইচ্ বসুর এসেন্স ব্যবহার করিয়াছি। জিনিষগুলি খুব ভাল। দেশে প্রস্তুত জিনিস ব্যবহার করিয়া দেশীয় শিল্পের সহায়তা করা উচিত..."
—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইচ বসুর কয়েকটী বিখ্যাত সুগন্ধি ঃ

দেলখোস, অপরাজিতা, বেলা, যুঁই, ইরাণী, বকুল, রোজ, রজনীগন্ধা
চন্দন, মিশোরা, হোয়াইট রোজ, ললিতা, শেফালিকা, গন্ধরাজ
—পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ ও মূল্যতালিকা পাঠাই—

৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জুয়েলার স্বর্ণালঙ্কার

রূপার বাসন এবং অতি আধুনিক মীনা করা জড়োয় গহনা

বোম্বায়ের জহুরী

কে, মণিলাল এণ্ড কোং

১৭৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ডাকমাশুলের জন্য দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া সম্পূর্ণ মূল্য তালিকা গ্রহণ করুন

বিনামূল্যে ঃঃ

"স্বর্ণ-কবচ" বিতরণ

ত্রিপুরারাজ্যের জনৈক যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী কর্তৃক প্রদত্ত। ইহা ধারণে মানবের যাবতীয় ব্যাধি, রোগ শোক দূর হইয়া শান্তি দান করে ও মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করে। ইহার সঙ্গে আমাদের "মহাবীর্য্য বর্দ্ধক রসায়ন বটীকা" ১ কৌটা প্রত্যেক গ্রাহককে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। রোগের বা কার্য্যের বিবরণ সহ পত্র লিখিলে এই স্বর্ণ কবচ যথা নিয়মে মন্ত্রপুতঃ ঔষধ পূরণ করিয়া শোধনক্রমে পাঠান হয়।

ব্রহ্মচারী ভৌমিক; রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম। পোঃ সিধাই (ত্রিপুরা ষ্টেট)

Beware of Worthless Imitations

ENDI CHADDARS

Our Special Manufactures and famous for last 11 years. Similar but superior to Ass. Endi. Money refunded if unaproved. Packing Rs. 6/4 per pair ($6 \times 1\frac{1}{2}$ yds). Packing Postage Free. Manufactured only by......

BASANTA MAL BHARA MAL
Pro.:—ENDI CHADDAR STORES
Chourabazar. LUDHIANA (Upper India)

সৌন্দর্য্য ও সাবান

সুন্দর মুখের লাবণ্য রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে, মুখ ও ত্বক কোমল, শুভ্র ও মসৃন করিতে আপনাদিগকে আমাদের

'কোকোলীন' সাবান

ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। বিশুদ্ধ, অত্যুৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত। সমান ও কাছাকাছি মূল্যের বিদেশী সাবান অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

হোয়াইট রোজ (বাক্সে ৩টী) ১৲, চন্দন (বাক্সে ৩টী) ৸৵০, বকুল (বাক্সে ৩টী) ৸৵০
ল্যাভেণ্ডার (বাক্সে ৩টী) ৸৵০, খস্ (বাক্সে ৩টী) ৸৵০, যুঁই (বাক্সে ৩টী) ৸৵০
মাস্ক (বাক্সে ৩টী) ৸৵০, রজনীগন্ধা (বাক্সে ৩টী) ৸৵০, গ্লিসারিণ (বাক্সে ৩টী) ৷৵০

এইচ্ বসু, পারফিউমার—

৫২, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(স্থাপিত—১৮৮৮)

...করা ১০০ জনই উপকৃত হইবেন—কেহই ব্যর্থ মনোরথ হইবেন না—শুধু কথায় নহে—কার্য্যে দেখুন—

...১ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে—গর্ভ নিয়মিত করিবার

ইচ্ছামতি পিল

"Wife's friend"—The safe and sure way to Birth Control—গর্ভ ইচ্ছাধীন করিতে এরূপ নিশ্চিত ঔষধ আর নাই। ইহা ঋতুর সময়ে একদিন মাত্র খাইতে ...। যে ঋতুতে খাইবেন সে মাসে গর্ভ কিছুতেই হইবে না—ইহা আমরা জোর গলায় ঢাক বাজাইয়া স্পর্দ্ধার সহিত ...ষণা করিতেছি। ইহা প্রতি মাসে ঋতুকালীন খাইলে কোন ক্রমেই গর্ভ হইবে না। আবার শরীর বুঝিয়া ঔষধ বন্ধ ...লেই পূর্ব্ববৎ সন্তানাদি হইতে থাকিবে। ইহাতে কোনরূপ স্বাস্থ্যহানি হয় না। লক্ষ লক্ষ স্থানে পরীক্ষিত অব্যর্থ ...প্রদ দেবতুর্ল্লভ মহৌষধ। এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা—ছয় মাসের ১৸০ সাতসিকা।

টাইট্ ব্রেষ্ট

যুবতীর অহঙ্কার—অনমিত স্তনভার। দৃঢ় ও উন্নত বক্ষই রমণীর সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্য যাঁহাদের নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা ঋতুকালীন এই ঔষধ সাত দিন মাত্র ব্যবহার করিলে শিথিল ও পতিত বক্ষোজ ...সদৃশ উন্নত স্থূল ও সুশ্রী হইয়া চির-শোভা পাইবে ইহা স্থির নিশ্চয় তাঁহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা মালিশ ...তে হয় না। কেবলমাত্র অঙ্গুলি দ্বারা অল্প পরিমাণে পাতলা করিয়া মাখাইয়া দিতে হয়। ইহাতে কাপড় জামা ...সেমিজে দাগ লাগে না—ঔষধ লাগাইবা মাত্রই শুকাইয়া যায়। ইহা আমাদের বহু পরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র উচ্চরবে ...ংসিত। রমণী-বক্ষ চির-উন্নত রাখিবার মহা তেজস্কর অব্যর্থ ফলপ্রদ মহাসুগন্ধযুক্ত মহৌষধ। মাসে সাত দিনের ...ক ব্যবহার করিতে হয় না। মূল্য শিশি আড়াই টাকা। সন্তানের স্তন পান নিষিদ্ধ নহে।

রিসার্চ্চ হারবল হোম (ডি)—১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টেলিফোন—৮৫৩ বড় বাজার   টেলিগ্রাম—মেক্যানিষ্টস্

রায় বাহাদুর—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত কৃত

অজপা সাধন

প্রভুপাদ আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দেব প্রদত্ত, ভক্তসাধনগণের অমূল্যরত্ন, সাধন-তত্ত্ব। মূল্য ১৲।

সুখমনী

শিখ গ্রন্থ সাহেবের অন্তর্গত, সরল প্রার্থনাপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থ—মনকে সরস ও মিষ্টতাপূর্ণ করে। মূল্য ১৲।

জপজী

গুরু নানকের সরল ধর্ম্মবাণী এবং তাঁহার জীবন ও ধর্ম্ম, এবং শ্রীচৈতন্ত ও মার্টিন লুথার প্রভৃতির এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর ধর্ম্ম-ইতিহাস এই গ্রন্থত্রয় ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, Forword প্রভৃতিতে বিশেষভাবে প্রশংশিত ১৲। গুরুদাস চট্টোঃ এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিঃ

ডাঃ শ্রীউমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্থ রোগ আরোগ্য হইয়াছে। মূর্চ্ছা, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রো আশু ফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনামূ পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲ টাকা।

এস, সি, রায় এণ্ড কোং

১৬৭।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীধাম নবদ্বীপ—জ্যোতিষ কুটীর

ঋষি প্রণীত শাস্ত্র কখনই মিথ্যা নহে—কিন্তু গণনা ও বিচারের ভ্রান্তি বশতঃ সাধারণতঃ কোষ্ঠীর ফল মিলে না তজ্জন্য অনেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি আস্থা হারাইতেছেন। স্থলভে যদি আপনার ভাগ্য উন্নতি, পুত্র কন্যার বিবাহ, আরোগ্য প্রভৃতি জানিতে চাহেন—অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় একবার পরীক্ষা (trial) করিলে সামান্য ব্যয়ে আশাতীত ফল লাভ করিতে পারিবেন—হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া গণনা করা হয়। গ্রহ শান্তির জন্য আশ্চর্য্য ফলপ্রদ কবচাদি ব্যবস্থা করা হয় ও সর্ব্বসিদ্ধি কবচ সর্ব্ব বিষয়ের জন্য মাত্র ১০৲ টাকা দক্ষিণায় বিতরণ করা হয়। জ্যোতিষের প্রায় সমস্ত কার্য্যই তারতম্যানুসারে ২৲, ৫৲ ও ১০৲ টাকায় করা হয়, ষ্ট্যাম্পসহ বা রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিতে হয়। ডাক্তার—শ্রীবিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায় জ্যাতির্ব্বিনোদ, নবদ্বীপ

অর্শরোগে

আশু ফলপ্রদ অব্যর্থ মহৌষধ

"হেডেন্‌সা"

উপরোক্তরূপ টিউবে পৃথিবীর ৯৮টী দেশের সর্ব্বত্র সমস্ত ঔষধালয়ে পাওয়া যায়

রুমাল থেকে লেপের ওয়ার

একমাত্র ফিনিক্স কলে অগ্রপশ্চাৎ উভয় দিকেই সেলাই করা চলে।

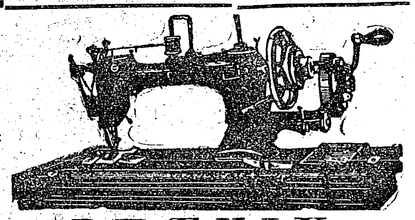

PHŒNIX

পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটালগ প্রেরিত হয়।

পর্য্যন্ত সবই ঘরেই তৈরী ক'রে নিতে পারেন যদি ঘরে এ সেলাইয়ের কল রাখেন। একাজ যেমন সোজা তেমনি জনক। আজকাল সকলেরই আয় কমে গেছে। গৃহি এ সময় যতটা সম্ভব ব্যয় সংক্ষেপের পথে বিপন্ন স্বামী সাহায্য করিলে গৃহের আনন্দও শান্তিবর্দ্ধন করিবে। জা

ফিনিক্স ও ন্যমান

সেলাইয়ের কল উক্ত কাজে অত্যন্ত সুবিধাজনক। ইহার কম, ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী এবং অত্যন্ত সরল ও সহজ।

এজেণ্টস্‌ ঃ—

দত্ত চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঘোষ ব্রাদার্স

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স একমাত্র আদত গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা।

"জুয়েলারি ম্যানসন"

১১৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমাদের প্রস্তুত ব্যবহৃত অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে সম-ওজনের আদত থান গিনি অথবা পুরা গিনি সোনার মূল্য নগদ টাকা পাইবেন। পান মরা বাদ নাই

ইহাই কি আমাদের সততার অগ্নিপরীক্ষা নহে?

৵০ দুই আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

ঘোষ ব্রাদার্সের অলঙ্কার-না আদত গিনি? না নগদ টাকা?

স্বুর ব্রাদার্স এণ্ড কোং

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স—২০৩।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রোপ্রাইটর—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র স্বুর

১নং **লাইনমোর রুলি—**

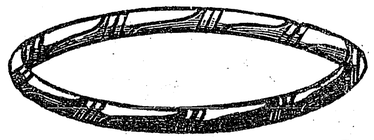

হস্তিদন্তের ফ্রেমে গিনি সোনার তার জড়ান, দেখিতে ফ্যান্সি অথচ মজবুত মূল্য—প্রমাণ প্রতি জোড়া ১০৷৹

২নং **সোনার মুখ বালা**

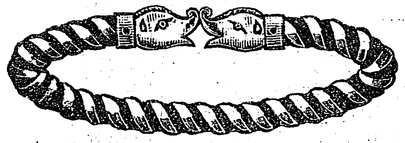

হস্তিদন্তের বালার খাঁচে খাঁচে সোনা জাড়ান ও সোনার হাঙ্গর মুখ দেওয়া। মূল্য—প্রমাণ ২৪৲ সরু ২২৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের দোকানে যাবতীয় জড়োয়া গহনা ও মিনার আংটী চুড়ি, ব্রুচ, ইয়ারিং ইত্যাদি এবং যাবতীয় সোনার গহনা প্রস্তুত হয় ও বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকে। মফস্বলের অর্ডার যত্নের সহিত ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়। ৵০ ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে সুবৃহৎ ক্যাটলগ পাঠাই।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের	ঢাকা—(কারখানা ও হেড আফিস), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহু-বাজার ষ্ট্রীট, ১০৯এ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, শ্যামবাজার গোলবাড়ী, কলিকাতা। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মেদিনীপুর, বহরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মান্দ্রাজ, দিল্লী রেঙ্গুন প্রভৃতি।	মকরধ্বজ ৪৲ তোলা

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় (১৩০৮ সনে স্থাপিত)

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের। সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধ বাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। সর্ব্ববিধ প্রমেহ ও বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—(চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত।) ২০৲ তোলা। সকল প্রকার ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ **ভোলানন্দ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন,—"এছাকাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কোলিমে কো'ই নেই কিয়া, **আপতো রাজ চক্রবর্ত্তী হ্যায়।**"

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকরণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)।" বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **রোণাল্ডসে** বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি **বিস্ময়াবিষ্ট** (astonished) হইয়াছি।" বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর **সার হেনরী হুইলার** বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।

দেশবন্ধু **সি, আর দাশ**—"শক্তি ঔষধালয়ের কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি—

(ষড়্গুণবলিজারিত)

মকরধ্বজ—৮৲ তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৩৲ সের। সর্ব্বজন প্রশংসিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশতৈল।

দশনসংস্কার চূর্ণ ।০ কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ।

বৃহৎ খদির বটিকা—।০ কৌটা। (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বুলবিলাস।)

দাদমার—।০ কৌটা। দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ

উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়।

নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন

চিঠি, পত্র, অর্ডার, টাকাকড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটারের নামোল্লেখ করিবেন। ক্যাটলগ ও শক্তি-পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

প্রোপ্রাইটার—(রিসিভার) শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী বি, এ ঢাকা।

ভাইফোঁটা

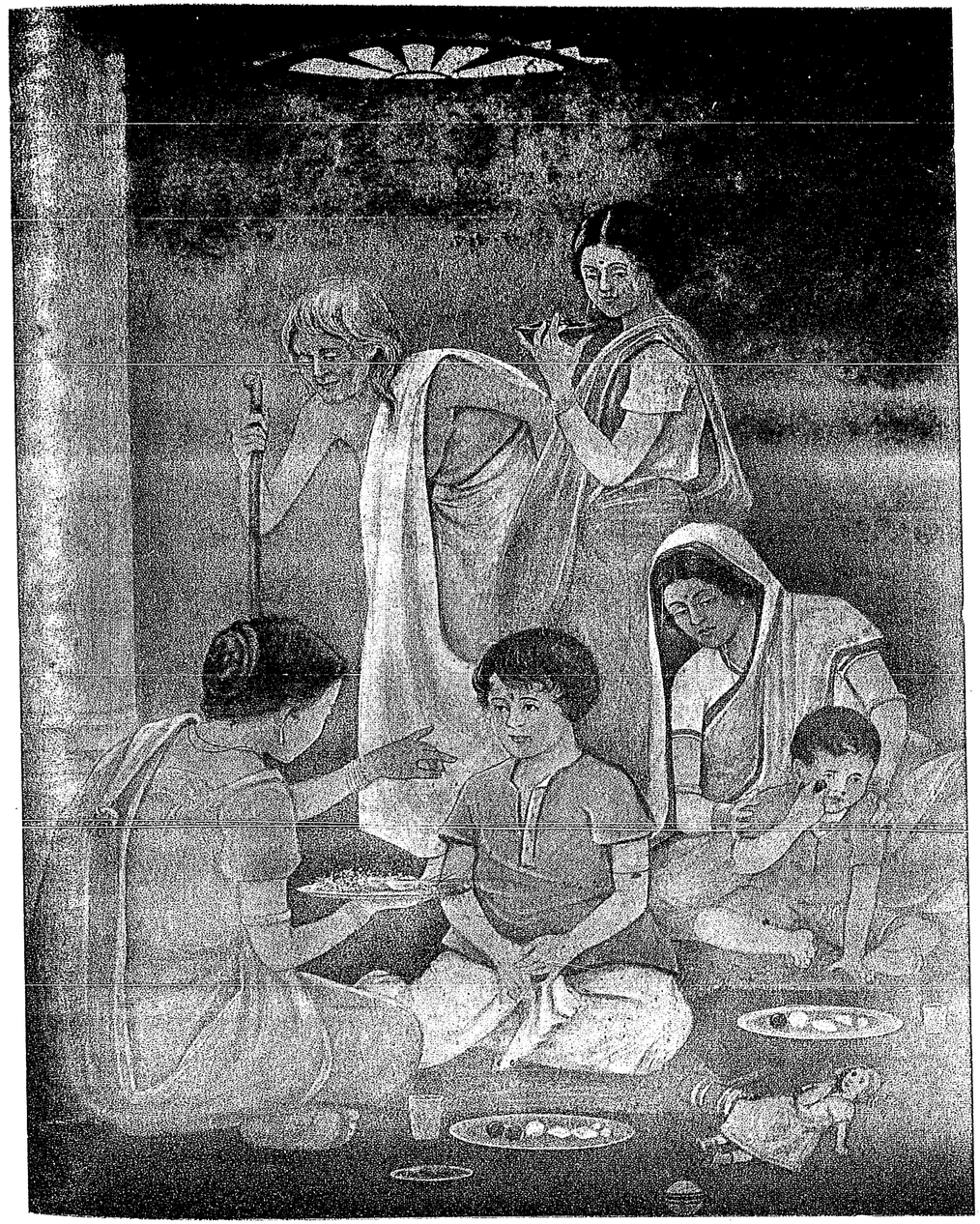

শিল্পী—শ্রীযুক্তা মতী দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

শরীর স্নিগ্ধ ও মনকে প্রফুল্ল রাখিতে

NASCO

—ন্যাস্কো—

সাবান ব্যবহার করুন

লিলি অফ্ দি ভ্যালী
রূপের যাদুকরী

ব্ল্যাকপ্রিন্স
সাবানের রাজা

এসর্টেড্ বাথ
গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য

বোকে
বর্ণ ও গন্ধের একত্র সমাবেশ

অগুরু
মহিলাদের চিরপ্রিয়

ফ্লোরা
সৌরভের আধার

মাস্ক
অতুলনীয়

পার্ল
গায়ে মাখিতে ও কাপড় কাচিতে

ন্যাশনাল সোপ এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস্—মেসার্স জে, সি, দত্ত এণ্ড কোং

১০৮এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Eureka.

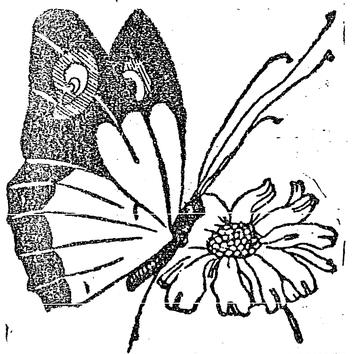

অঙ্গরাগ

আপনার প্রিয় সাবান

ও প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ,—রূপ ও লাবণ্যবর্দ্ধনে অনুপম। বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত, মনোরম সুরভিযুক্ত ও সুদৃশ্য আধারে রক্ষিত।

প্রিয়জনে উপহার দেওয়ার যোগ্য।

প্রস্তুতকারক :—

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা

Eureka.

"ফেনকা" শেভিং ষ্টিক্

ক্ষৌর কর্ম্মে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দানে অতুলনীয়। ফেনকার পর্য্যাপ্ত সুরভিত ফেনপুঞ্জ ক্ষৌর কর্ম্মকে সহজ ও আরামদায়ক এবং মুখমণ্ডলকে স্নিগ্ধ লাবণ্যযুক্ত করে। তিন রকমের তিনটী সুদৃশ্য আধারে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড ::: কলিকাতা